মে ২০২৬
অন্বেষা
যুগলবন্দী

মে ২০২৬

অন্বেষা

যুগলবন্দী

অন্বেষা

অন্বেষা ঃ ‘যুগলবন্দী’

সম্পাদক ঃ শ্রীপর্ণা মিত্র

যুগ্ম সম্পাদক ঃ অরূপ মন্ডল

প্রকাশক ঃ

এষণা

শেরউড এস্টেট,

১৬৯, এন.এস. বোস রোড, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা - ৭০০১০৩

দূরাভাষ ঃ ৯৪৩৩৩৩৯০৭৯, ৯৮৭৪৫৭৬৫১৬

email : anweshapotrika@gmail.com

প্রকাশ ঃ মে, ২০২৬

Volume - 8, Issue - 4

প্রাপ্তিস্থানঃ

পাতিরাম বুক স্টল, ধ্যান বিন্দু

৫৫, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ ঃ

ডেসিগ্রাফ,

ই/৪৩, কেয়াতলা রোড, কলকাতা - ২৯

ফোন ঃ ৮০১৭৩৮৪৬৫২

This periodical is circulated without any commercial gain.

মূল্য - ২০০ টাকা

একটা সলিটারি তালগাছ!

দিগন্ত বিস্তৃত খোয়াইয়ের মাঝে একলা দাঁড়িয়ে থাকা একটি তালগাছের মধ্যেই তাঁকে খুঁজে নিতে বলেছিলেন প্রিয় ছাত্র সত্যজিৎকে - 'খোয়াই আর তাতে একটা সলিটারি তালগাছ। ব্যস। বলত পার, ওটাই আমি।' জীবনের একাকিত্বই ছিল বিনোদবিহারীর creative recluse। শিল্পীর নিজের কথায়, 'আমি নির্লজ্জের মতো সারাটা জীবন কাগজের ওপর রং লেপ্টেই কাটালাম। কোনো সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে আমি নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারিনি'। এই ছিল বিনোদবিহারীর জগৎ। ঠিক এইভাবে একদিন পথশ্রান্ত মহর্ষি রাঢ় বাংলার এক বিশাল উন্মুক্ত প্রান্ত মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা একাকী একটি সপ্তপর্ণী বৃক্ষের পাদদেশে উপাসনায় বসেছিলেন, সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে একাত্ম হতে। মহর্ষি সেদিন শান্তিনিকেতনের নির্জন প্রাঙ্গ ণে যে আত্মোপলব্ধির বীজ বপন করেছিলেন, সেই বীজ একদিন মহীরুহ হয়ে পূর্ণতা লাভ করেছিল বিনোদবিহারীর অন্তস্তলে ঠিক যেমনভাবে একদিন কৈশোরে অগ্রজ বিজনবিহারীই শিখিয়েছিলেন, 'সৃষ্টির উৎস মানুষের অন্তরের বস্তু' অর্থাৎ শিল্পীর অন্তরাত্মার অন্বেষণ - সেই খোয়াইয়ের মাঝে সলিটারি তালগাছটার মতো। মাত্র তেরো বছরের প্রায়-অন্ধ একজন কিশোরকে কী করে ছবি আঁকা শেখাবেন, সে কথা চিন্তা করে হতাশ হয়েছিলেন স্বয়ং 'মাস্টারমশাই' নন্দলাল। তবু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে, এক প্রকার বাধ্য হয়েই বিনোদকে তাঁর সহপাঠীদের পাশে এককোণে কাগজ, রং, তুলি, জল ও মাদুর দিয়ে যা 'ইচ্ছে তা আঁকার' অনুকম্পাটুকু দেখিয়েছিলেন মাস্টারমশাই।

গুরু নন্দলালের কাছে একলব্য হলেও, বিনোদবিহারীর কাছে প্রিয় ছাত্র সত্যজিৎ ছিলেন তাঁর অর্জুন। নিজের হাতে যত্ন করে জাপান থেকে শিখে আসা ক্যালিগ্রাফি শিখিয়েছিলেন সত্যজিৎকে। তাইতো সত্যজিৎকে নিজের মুখে বলতে শুনি - 'আমাকে ক্যালিগ্রাফি শিখিয়েছেন বিনোদদা। এই ক্যালিগ্রাফি শেখার ফলে পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় এসে আমি হাতে কলমে তা প্রয়োগ করি। আমি মনে করি শান্তিনিকেতনে এই ক্যালিগ্রাফি না শিখলে আমি নতুন রীতির নকশা ও হরফশিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারতাম না'। গুরু শিষ্যের ছিল এক চিরন্তন শাশ্বত পারস্পরিক শ্রদ্ধা। দুজনেই দুজনকে অকপটে চিনেছিলেন। বিনোদবিহারী আক্ষেপ করে বলেছিলেন,

'সত্যজিৎকে বুঝতে বাঙালির আরও দু' এক দশক সময় লাগবে। বিদেশী বড় তকমা না পেলে আবার বাঙালি বাঙালির গুণপনা বুঝতে পারে না। গুরুদেবের বেলায় দেখেছি। মানিকের বেলায়ও দেখবে। তোমরা মিলিয়ে নিও, মানিক যে কত বড়ো শিল্পী তা এ দেশের ভদ্দরলোকেরা না বুঝলেও দুনিয়ার গুণগ্রাহীরা বুঝবে। ওর মাথায় পরিয়ে দেবে শিল্প-সাম্রাজ্যের রাজমুকুট।'

সত্তর সালে আবার দেখা গুরুশিষ্যের। সত্যজিৎ এলেন তাঁর প্রিয় বিনোদদার বাড়িতে, তাঁকে নিয়ে একটা তথ্যচিত্র করতে। এতো শুধু আসা নয়, এ'যেন গুরু সমীপে কৃতী শিষ্য। গুরুশিষ্যের মহামিলন। দৃষ্টিহীন গুরু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন প্রিয় শিষ্যকে। অফুরন্ত তাঁদের কথা, সে কথা যেন আর ফুরোতে চায় না। সৃষ্টিজীবনের শিখরে থেকে মাত্র তিপ্পান্ন বছর বয়সে দু'চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে জীবনে কখনও হতাশ হননি বিনোদবিহারী। কেবল একবারই আক্ষেপের সুর শোনা গেছিলো তাঁর গলায়, 'চোখ যাওয়ার পর রঙের জন্য কদিন উচাটন হতো মন, বাকি সবকিছুই দেখতাম। হাত বুলিয়ে সব দেখি। কিন্তু একটা জিনিস খুব মিস করি। ছায়া তো আর হাত বুলিয়ে বোঝা যায় না। কী জানো - সত্যজিতের ছবি'!

আসলে সৃষ্টির উৎস মানবহৃদয়ের শুধু অন্তরেই নিহিত। এবারের সংখ্যা করতে গিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম জন্মান্ধ বেশ কিছু ছাত্রদের সঙ্গে, যাদের অন্তরে রংয়ের কোনও সংজ্ঞা হয়না। রং কেমন দেখতে, সেই অভিজ্ঞতা তাদের নেই। বিজ্ঞানীরা মনে করেন দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের মাত্র ১৫ শতাংশ প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অন্ধ, সুখের বিষয় অধিকাংশ অন্ধ মানুষেরই অন্তত আলোর অনুভূতি আছে। তবুও দৃষ্টিহীন শিল্পীদের সৃজনশীল সংগ্রামের কোনও অন্ত নেই। তাদের সংখ্যা বিরল হলেও শিল্পজগতে তারা অনুপস্থিত নয়। মার্কিন দেশের ইম্প্রেশনিস্ট এবং ম্যুরাল শিল্পী জন ব্র্যামব্লিট (John Bramblitt), তুরস্কের চিত্র শিল্পী এশরেফ আরমাগন (Esref Armagan), ব্রিটিশ abstract চিত্রশিল্পী কিথ চার্লস স্যামন (Keith Charles Salmon), মার্কিন ভাস্কর মাইকেল নারানজো (Michael Naranjo), ষোল শতকের ইতালিয় অন্ধ ভাস্কর জিওভানি গোন্নেলি (Glovanni Gonnelli) অথবা বর্তমান ভারতের তরুণী শিল্পী ঐশ্বরিয়া - এরাও সকলেই তাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অসাধারণ শিল্প রচনা করেছেন অথবা এখনও করে চলেছেন, কিন্তু তবুও তারা প্রদীপের নিচে অন্ধকারেই পড়ে আছেন। তাদের হাত ধরে আলোয় ফিরিয়ে আনার কোনও সত্যজিৎও নেই আর মাথার ওপর রবীন্দ্রনাথও নেই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।

শ্রীপর্ণা

ঃঃ যুগলবন্দী ঃঃ

মে, ২০২৬,

ঃ সম্পাদকীয় ঃ

একটা সলিটারি তালগাছ

ঃ বিশেষ রচনা ঃ

শান্তিনিকেতন এবং কামপো আরাই-এর সমগ্র এশীয়বাদ	ডঃ ক্রিস্টোফার হার্ডিং	১
একাকী একটি বৃক্ষ ও আত্মার অস্তিত্ব	অধ্যাপক ঋতেন্দ্র রায়	১২
সিনেমার পোস্টারকে প্রথম শিল্পের মর্যাদা দিয়েছেন সত্যজিৎ	ডঃ রাধিকা রাঘব	১৫
নন্দলালের তুলিতে নারী ও গ্রামীণ জীবনের ইতিকথা	ইউংমিং ওয়ং	২৭

ঃ বিশেষ সাক্ষাৎকার ঃ

নিঃসঙ্গতা শুরু থেকেই বিনোদবিহারীর জীবনে এক গভীর ছায়া ফেলেছিল	অধ্যাপক রমণ শিবকুমার	৩০
একমাত্র শিল্পীরই একাকিত্বের অধিকার রয়েছে	সুশোভন অধিকারী	৪৮

সত্যজিৎ রায়ের বেশ কিছু কাজে বিনোদবিহারীর প্রভাব আছে, সেই কারণটা অবশ্য খুবই টেকনিক্যাল	দেবাশীষ দেব	৭৪

ঃ দৃষ্টিহীনের অন্তর্দর্শন ঃ

জন্মান্ধের কাছে 'inner eye' বলে কিছু থাকে না...	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯১
অন্তর্দৃষ্টি	লিসা ফিচিপালডি	৯৯

ঃ ওপার বাংলার লেখা ঃ

শান্তিনিকেতন থেকে হাজারীবাগ- একটি পরিক্রমা	অধ্যাপক বিশ্বজিৎ গোস্বামী	১০৮
বেঙ্গল আর্ট মুভমেন্টে শান্তিনিকেতনের অবদান ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের শিল্পভাবনা	অধ্যাপক সুশান্ত কুমার অধিকারী	১১৭
শান্তিনিকেতনের শিল্পচর্চায় জনজীবন ও প্রকৃতি	অধ্যাপক সুমন ওয়াহিদ	১২৫

ঃ প্রবন্ধ ঃ

পোশাক পরিকল্পনায় সত্যজিৎ এবং খেরোর খাতা	সুদীপ্ত মিত্র	১৩৪
সঙ্গ ও অনুষঙ্গ ঃ বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর	কেতকী চৌধুরী	১৫২
পাগলা দাশু, অপু, শঙ্কু, জটায়ু, ফেলুদা... এবং সত্যজিৎ	মহাশ্বেতা মণ্ডল	১৬১
বিশ্বযোগে বিশ্বভারতী	শ্রীপর্ণা মিত্র	১৭৩
চিত্রকরের সাহিত্যে নতুন রস-সৌন্দর্য	রমা বসু	১৮০

ঃ রম্যরচনা ঃ

একটি কাল্পনিক চিত্রনাট্য	তরুণ চক্রবর্তী	১৮৪

ঃ গ্রন্থ সমালোচনা ঃ

কলাভবনের দুই নক্ষত্র	গ্রন্থকীট	১৮৯

ঃ চিঠিপত্র ঃ

সম্পাদক সমীপেষু		১৯১

সম্পাদক : শ্রীপর্ণা মিত্র

যুগ্ম সম্পাদক : অরূপ মন্ডল

অন্বেষা।

শান্তিনিকেতন এবং কামপো আরাই-এর সমগ্র এশীয়বাদ

ডঃ ক্রিস্টোফার হার্ডিং

শিল্পী শিমোমুরার আঁকা প্রার্থনারত 'শুনতোকুমারু' নামে এক অন্ধ ব্যক্তি (১৯১৫)

[ভারতীয় আধুনিক শিল্পের পথিকৃৎ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৮ সালে, প্রায় এক বছর সময়কালে জাপানে শিল্পকলার শিক্ষা নিতে গিয়েছিলেন। ভারতে আগত জাপানি শিল্পীদের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শিল্প অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে বিনোদবিহারীর এই জাপান যাত্রা। এই সফরেই বিনোদবিহারী রবীন্দ্র স্নেহধন্য জাপানি শিল্পী আরাই কামপোর সান্নিধ্যে আসেন এবং তার কাজে বিশেষ প্রভাবিত হন। বিনোদবিহারী যখন শান্তিনিকেতনে পড়তে এসেছেন, তখন সদ্য কামপো আরাই শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেছেন। কিন্তু বিনোদবিহারীর আত্মকথা পড়লে বোঝা যায় জাপানে থাকাকালীন ওনার শিল্প শিক্ষায় সব থেকে বেশি সাহায্য করেছেন কামপো আরাই। ফলে বিনোদবিহারীর কাজে জাপানি শিল্পের প্রভাব সব থেকে বেশি।

বিনোদবিহারীর সৌভাগ্য, দিনের পর দিন উনি কামপো আরাইএর বাসস্থানে গিয়ে শিল্পীকে তার কাজ করতে দেখেছেন এবং তার কাছে হাতে কলমে শিক্ষা নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, টোকিও থাকাকালীন একবার বিনোদবিহারীর চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল এবং স্বয়ং আরাই নিজের হাতে সেই প্রদর্শনীর জন্য ছবি বাছাই করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন কামপো আরাই ভারতে এসে ক্যালিগ্রাফি নিয়ে শিক্ষা প্রদান করুক। বিনোদবিহারীর সৌভাগ্য স্বয়ং কামপো আরাই-এর কাছ থেকে সেই শিক্ষাই তিনি পেয়েছিলেন। মজার ব্যাপার, বিনোদবিহারীর সঙ্গে আরাই-এর পরিচয় হয়েছিল ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর মাধ্যমে। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তখন টোকিওতে বসবাস করতেন। এই কথা শিল্পী নিজে তাঁর আত্মজীবনীতে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করেছেন।

কামপো আরাই-এর ভারত প্রীতি সম্বন্ধে জানতে আমরা দ্বারস্থ হয়েছিলাম এই প্রবন্ধের লেখক ডঃ ক্রিস্টোফার হার্ডিংএর কাছে। ডঃ ক্রিস্টোফার হার্ডিং একজন সাংস্কৃতিক ইতিহাসবিদ, যিনি আধুনিক ভারত ও জাপানের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ডঃ হার্ডিং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের Asia Historyর একজন প্রবীণ প্রভাষক এবং এই বিষয়ে একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর The Japanese: A History in Twenty Lives গ্রন্থটি ২০২০ সালের দ্য টাইমস এর সেরা ইতিহাস বইয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ওনার অন্যান্য গ্রন্থের অন্যতম হচ্ছে Religious Transformation in South Asia: The Meanings of Conversion in Colonial Punjab; Religion and Psychotherapy in Modern Japan এবং Historical Reflections on Madness; The light of Asia: A History of Western Fascination with the East; The Japanese: A History in Twenty Lives. এছাড়া The Arts of Japan ডিজিটাল পত্রিকায় এই বিষয়ে ওনার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ডঃ ক্রিস্টোফার হার্ডিং-এর অনুমতি নিয়ে ওনার লেখাটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হলো]

১৯১৬-১৯১৭ সালের শীতকালে দীর্ঘ তিন মাস ধরে কয়েকজনের জাপানি শিল্পীদের একটি দল ভারতের তৎকালীন রাজ্য হায়দ্রাবাদের একটি গুহাসর্বস্ব পাহাড়ি এলাকার অভ্যন্তরে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। গুহার চারিদিকে বাদুড়, বুনো শুয়োর, বাঁদর এবং চিতাবাঘ বেষ্টিত হিংস্র শ্বাপদ বিদ্যমান। তাদেরই সঙ্গে ভাগ করে গুহার ভেতরে দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছে সুদূর জাপান থেকে আগত দুঃসাহসিক এই শিল্পীবৃন্দ। বন্যপ্রাণীর বিপদ তো ছিলই; তার ওপর যুক্ত হয়েছে স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকারে বাদুড়ের বিষ্ঠার অসহ্য দুর্গন্ধ। এই বিপদসংকুল অনিশ্চয়তার মধ্যে গুহার মধ্যে এক

নাগাড়ে কাজ করে চলেছে জাপানি তরুণের দল। বিপদের অন্ত নেই, তবুও তাদের কাছে সব কিছুই যেন পরম সৌভাগ্যের ফল। দীর্ঘ শতাব্দী পরে ভারত ও জাপানের সম্পর্কের সেই ঐতিহাসিক বৃত্তটা যেন এতদিনে পূর্ণতা লাভ করেছে।

গুহাগুলো আজ জগৎ বিখ্যাত প্রাচীন বৌদ্ধ চিত্রকর্মের নিদর্শন - অজন্তা গুহা। জাপানি শিল্পীরা এখানে এসেছিলেন সেই আশ্চর্য গুহাচিত্রের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করতে। সমগ্র এশিয়া জুড়ে সাংস্কৃতিক সংযোগের সমর্থনে জাপানিরাই এক বিশেষ আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন একদিন। পরবর্তী তিন দশক ধরে, 'প্যান-এশিয়ানিজম' (Pan-Asianism) নামে পরিচিত সেই আন্দোলন জাপান এবং এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের এক বিশাল অংশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক অনিশ্চিত পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন ভারতে এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জাপানি বৌদ্ধ শিল্পী কামপো আরাই (১৮৭৮-১৯৪৫)। কামপো ছিলেন এই আন্দোলনের ভবিষ্যতের মূর্ত প্রতীক, যে ভবিষ্যৎ কখনোই পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়নি। জীবনের প্রারম্ভেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেমে পড়েছিলেন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে বৌদ্ধ শিল্পকলাই হলো বিশ্বের সকল শিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ।

শিল্পী কামপো আরাই-এর এই আঁকাটি বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বের কারিওবিঙ্গাকে চিত্রিত করেছে বলে মনে করা হয়

ভারতীয় ভাবধারা জাপানের মাটিতে পৌঁছে ছিল ষষ্ঠ শতাব্দীতেই। চীন ও কোরিয়ার পথ ধরে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখার পরিব্রাজকদের মাধ্যমেই এই ভাবধারার আগমন ঘটেছিল জাপানে। এরপর ৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে জাপানের মাটিতে প্রথম যে ভারতীয় পদচিহ্ন এঁকেছিলেন - যাঁর কথা ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার নাম বোধিসেন। তিনি ছিলেন একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং ভিক্ষু। জাপানে অবস্থানকালে বোধিসেন সাক্ষাৎ করেছিলেন গিওকি (Gyōki) নামক এক প্রখ্যাত জাপানি ভিক্ষু ও জনহিতৈষী ব্যক্তির সঙ্গে। জনশ্রুতি- এই দুই ব্যক্তি একে অপরকে চিনতে পেরেছিলেন। গত জন্মে যখন তারা 'গৃধ্রশৃঙ্গ' বা Vertual Peak পর্বতে উপস্থিত ছিলেন,

ঠিক সেই সময়ে, ভগবান বুদ্ধ সেখানে 'সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র' প্রচার করছিলেন। হয়তো তাদের নিয়তিতে লেখা ছিল যে একদিন তাদের আবার সাক্ষাৎ হবে। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ভারতের সঙ্গে জাপানের যোগাযোগ ছিল সীমিত। পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে জাপান ছিল জর্জরিত, তখন পর্তুগিজ বণিক ও ধর্মপ্রচারকরা সেখানে এসে পৌঁছতে শুরু করেন। ততদিনে পর্তুগালের এশীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ভারতের বিভিন্ন অংশ, যার মধ্যে গোয়া ছিল অন্যতম। এমনকি চীনের কিছু অংশে পর্তুগিজদের সীমিত উপস্থিতি ছিল। তাদের এই যোগাযোগ-ব্যবস্থা ভারত ও জাপানকে পুনরায় সংযুক্ত করতে সহায়তা করেছিল, যদিও শুরুর দিকে এর ফলাফল খুব একটা সুখকর ছিল না। ১৮৮৫ সালের মার্চ মাসে জাপানি সংবাদপত্র 'জিজি শিনপো'তে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়তে সেই যুগের অগ্রগণ্য চিন্তাবিদ ফুকুজাওয়া ইউকিচি (Fukuzawa Yukichi) তাঁর দেশবাসীকে 'এশিয়াকে বিদায়' জানানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে সারা বিশ্বে 'সভ্যতার' এক নতুন স্পন্দন প্রবাহিত হচ্ছে যার সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্যের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তাই জাপানকে অবশ্যই এশিয়ার বিশাল সাংস্কৃতিক বলয়ের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে বরং পরিবর্তে পাশ্চাত্যের সঙ্গেই নিজেদের ভাগ্যকে যুক্ত করতে হবে।

পাশ্চাত্যের প্রতি জাপানিদের সরল বিশ্বাস ও অনুরাগ অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৮০-র দশকের মধ্যেই জাপানের ঐতিহ্যবাদী ও নব্য-রক্ষণশীলরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করেন। সম্রাটের গৃহশিক্ষক মোতোদা এইফু (Motoda Eifu) ঘোষণা করেন যে, পাশ্চাত্যের যেসব মূল্যবোধ তিনি শনাক্ত করতে পেরেছেন, তা হলো কেবল 'তথ্য সংগ্রহ' এবং 'কৌশল'। পাশ্চাত্যের আধুনিকতা যেন প্রকৃতির ওপর সফল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ওপরই প্রতিষ্ঠিত আর তা করতে গিয়ে প্রকৃত মূল্যবোধ কিংবা জীবনের গভীরতম স্তরের সঙ্গে সংযোগ, উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। যে সব ইউরোপীয়ান এই মতামতের সাথে একমত পোষণ করতেন, তাঁদের অনেকের কাছেই ভারত হয়ে উঠেছিল এক আধ্যাত্মিক নবজাগরণের উৎস, যা তাঁরা পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ভাষাবিদ, চিত্রশিল্পী এবং কবি, সকলেই এই উপমহাদেশের প্রাচীন ও অকৃত্রিম ভূপ্রকৃতি এবং এখানকার মানুষের অনন্য প্রতিভাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে মূল্যায়ন করতে শুরু করেন। উইলিয়াম জোন্স প্রমাণ করেছিলেন যে, সংস্কৃত, লাতিন এবং গ্রীক-এই তিনটি ভাষারই উৎস এক এবং এদের পূর্বপুরুষ অভিন্ন। ১৭৮৭ সালে উইলিয়াম হজেস বেনারসের সেই মায়াবী 'ঘাট'-এর চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। আর স্যামুয়েল টেলর কিছু

সময়ের জন্য হিন্দু দর্শনের প্রতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

জাপানি শিল্পকলা জগতে প্যান-এশীয় মতবাদের অন্যতম প্রভাবশালী প্রবক্তা ছিলেন ভারতবন্ধু ওকাকুরা কাকুজো। চীনা ধ্রুপদী সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য এবং চীনা কবিতা ও চিত্রকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হিসেবে ওকাকুরা 'Tokyo School of Fine Arts' এবং 'Imperial Museum'এর চারুকলা বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ 'The Ideals of the East with Special Reference to the Art of Japan' যা মূলত ইংরেজি ভাষায় এবং পশ্চিমি পাঠকদের উদ্দেশ্যে রচিত, তাতে তিনি শিল্পকলা প্রসঙ্গে প্যান-এশীয়বাদের অন্যতম জোরালো একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন-

''এশিয়া এক ও অখণ্ড। হিমালয় পর্বতমালা কেবল দুটি বিশাল সভ্যতাকে বিভক্তই করে না, বরং তাদের স্বকীয়তাকে আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে; একটি হলো চীনা সভ্যতা, যার মূলমন্ত্র কনফুসীয় (Confucius) সাম্যবাদ; এবং অপরটি হলো ভারতীয় সভ্যতা, যার ভিত্তি বৈদিক স্বাতন্ত্র্যবাদ। তুষারাচ্ছন্ন পর্বতপ্রাচীরও এক মুহূর্তের জন্য এই প্রবাহকে ব্যাহত করতে পারে না। এই প্রত্যয় এশিয়ার প্রতিটি জাতিরই এক অভিন্ন উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকারই তাদের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সৃষ্টিতে সক্ষম করে তুলেছে এবং ভূমধ্যসাগর ও বাল্টিক অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠী থেকে তাদের স্বতন্ত্র করে তুলেছে...''

১৯০১-০২ সালে ভারত সফরের সময় ওকাকুরা তাঁর গ্রন্থটি রচনার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। এই সফরেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। স্বামীজি এবং ওকাকুরা ট্রেনে ও ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ভারতের প্রধান বৌদ্ধ তীর্থস্থান বোধগয়া ও সারনাথ ভ্রমণ করেন। এই স্থান দুটি যথাক্রমে বুদ্ধের বোধিলাভ এবং বোধিলাভের পর তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদানের স্থান হিসেবে বিশেষ ভাবে প্রথিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই এই স্থানদুটো প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছিল এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। একই সঙ্গে, এই দুটি স্থানই ভারতের স্বর্ণযুগের নিদর্শন বহন করে। তবে কিছু সংশয়বাদী জাপানি ভাষ্যকারদের কাছে বর্তমান যুগে ভারতের পরাধীনতাকে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারা মনে করেন ভারত ঔপনিবেশিক শাসনকে নিজে থেকে গ্রহণ করেছিল বলেই আজ ভারত পরাধীন। পাশাপাশি জাপান সেই পরিণতি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এই ধারণার অন্যতম প্রবক্তা স্বয়ং ওকাকুরা।

এই সংশয়বাদী জাপানি প্রবক্তাদের মধ্যেই বেশ কিছু জাপানি শিল্পী, যাঁরা ভারত

ও জাপানের মধ্যে নতুন করে মৈত্রী বন্ধন গড়ে তুলতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। ওকাকুরাই এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেটা স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শেই হোক কিংবা রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শেই হোক। জাপানে তাঁর নিজস্ব শিল্প-আন্দোলন এবং বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁর মধ্যে ওকাকুরা এক গভীর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। এই নবজাগরণে ঠাকুর পরিবারের অবদান ছিল অপরিসীম। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন যে, ওকাকুরার সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই তাঁর কাছে 'Asiatic mind' বা অবিচ্ছিন্ন এশীয়বাদী মননের ধারণাটি প্রথম অর্থবহ হয়ে উঠেছিল। ওকাকুরার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এরপর এসেছিলেন তাঁর শিষ্যরা যাঁরা জাপানের 'নিহোঙ্গা' বা Nihonga শিল্পশৈলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এটি ছিল জাপানি চিত্রকলার একটি অভিনব ও প্রগতিশীল শিল্প আন্দোলন, যা মূলত ঐতিহ্যবাহী জাপানি শিল্প প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এবং পশ্চিমি চিত্রশৈলীর একটি বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

এরপর এবং Nihonga শিল্প আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ওকাকুরার দুই ছাত্র ইয়োকোয়ামা তাইকান (Yokoyama Taikan) এবং হিশিদা শুনসোর (Hishida Shunso) ভারতে এসেছিলেন ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে যুক্ত হতে। এই জাপানি শিল্পীদ্বয় পরিচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। তাইকান উদ্ভাবিত 'মোরোতাই' (Morotai) চিত্রশৈলী অবনীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই শব্দটির অর্থ হলো 'কুয়াশাচ্ছন্ন' বা 'ধোঁয়াশাচ্ছন্ন'; এর দৃশ্যগত প্রভাব ছিল অনেকটা 'ইম্প্রেশনিজম'এর অনুরূপ। তাইকান এক সময় নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন যে কিভাবে বাতাসকে চিত্রিত করা যায়? এই 'মোরোতাই' শৈলী ছিল সেই প্রশ্নেরই এক শৈল্পিক উত্তর। এদিকে, ইয়োকোয়ামা এবং হিশিদা ভারতীয় দেব-দেবীর রূপতত্ত্ব বা 'iconography' নিয়েও গভীরভাবে চর্চা করেছিলেন। ইয়োকোয়ামার সেই গবেষণারই অন্যতম ফসল ১৯০৩ সালে চিত্রিত তাঁর বিখ্যাত 'ইন্দো শুগোজিন' (Indo shygojin) বা ভারতীয় রক্ষাদেবী বা Indian Guardian Goddessএর ছবিটি। হিন্দু দেবী 'কালী'র রূপে অনুপ্রাণিত এই ছবিটি তিনি ভারতেই আঁকা শেষ করেছিলেন, অথবা ভারত থেকে জাপানে ফিরে যাওয়ার পরপরই আঁকাটা সম্পন্ন করেছিলেন।

জাপানে ফিরে ওকাকুরা তাঁর পত্রিকা 'কোক্কা'র (Kokka যার অর্থ 'জাতীয় গৌরব') মাধ্যমে সমসাময়িক বাঙালি চিত্রশিল্পের প্রতি জাপানিদের আগ্রহ জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। ওকাকুরা কিন্তু এই বিষয়ে জাপানি সমালোচকদের মন জয় করতে

পারেন নি। ১৯০৯ সালে জাপানি প্রত্নতাত্ত্বিক হামাদা সেইরিও (Hamada Seiryo) লিখেছিলেন যে, আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় তিনি ভারতের 'জাতীয় দুর্দশার মধ্যে বিভেদ ও বশ্যতার' লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন। এর কয়েক বছর পর, ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাপান সফরের সময় তাঁর সম্মানে ভারতীয় চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯১৩ সালে এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী হিসেবে জাপানিদের কাছে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা তখন তুঙ্গে। এই প্রদর্শনী দেখে একজন সমালোচক ভারতীয় চিত্রকলাকে 'দুর্বলচিত্তের আবেগ' বলে এক কথায় খারিজ করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে জাপানি দার্শনিক ইনোউয়ে তেতসুজিরো (Inoue Tetsujiro) রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। সেই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাপানি আয়োজকদের সতর্ক করে বলেছিলেন যেন তাঁরা কোনও ধরনের জাতীয় উগ্রবাদের ফাঁদে পা না দেন। জাতীয় উগ্রতাবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার রবীন্দ্রনাথ, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে জাতীয় উগ্রতাবাদকে দায়ী করেছিলেন। তখন সারা বিশ্ব জুড়ে বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে দ্বিতীয় বছরে পা রেখেছে। প্রথমে ইনোউয়ে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলোকে 'একটি বিধ্বস্ত দেশের গান' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এর বছর দুয়েক পরে প্রভাবশালী শিল্প সমালোচক তাকি সেইইচি (Taki Seiichi) ১৯১৬ সালে ভারত থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আনা একটি চিত্রকলাকে 'আবেগপ্রবণ', 'ক্ষয়িষ্ণু' এবং সম্ভবত ইনোউয়ের মন্তব্যের সূত্র ধরে 'একটি বিধ্বস্ত দেশের শিল্প' বলে অভিহিত করেছিলেন।

সর্ব-এশীয়বাদ বা Pan-Asianism এবং ভারত-জাপান সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে জাপানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সফরটি কামপো আরাই (Kampo Arai) নামের এক তরুণ শিল্পীর জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৮৭৮ সালে জাপানের তোচিগি (Tochigi) অঞ্চলে উজিইয়ে (Ujiie) শহরে জন্ম আরাই-এর। ছবি আঁকায় আগ্রহী কামপো আরাই চিত্রকলা নিয়ে পড়াশুনা করার উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ সালে সপরিবারে টোকিওতে পাড়ি দেন। সেখানে তিনি 'উকিয়ো' (ukiyoe) ঘরানার অন্যতম প্রবাদপ্রতিম শিল্পী মিজুনো তোশিকাটার (Mizuno Toshikata) সান্নিধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর ১৯০২ সালে তিনি ওকাকুরা 'কোক্কা' (Kokka) প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন, যেখানে তিনি প্রাচীন শিল্পকর্ম ও বৌদ্ধ চিত্রকলার প্রতিলিপি তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিলেন। টানা দশ বছর ধরে এই কাজ করতে গিয়ে আরাই-এর মনে একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে ওঠে যে, বৌদ্ধ চিত্রকলাই হচ্ছে শিল্পের সর্বোচ্চ রূপ।

আরাই শিল্পীজীবনের শুরুর দিকে নিজের মৌলিক শিল্পকর্ম চর্চা করার জন্য তুলনামূলকভাবে খুবই কম সময় পেতেন। তবে হারা তোমিতারো (Hara Tomitaro) নামে একজন শিল্পরসিক রেশম ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় তার সময়কালের কয়েকজন বিখ্যাত 'নিহোঙ্গা' (Nihonga) শিল্পীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান আরাই। তাদের মধ্যে ছিলেন ইয়োকোয়ামা তাইকান এবং শিমোমুরা কানজানের মতো বরেণ্য শিল্পীরা। এই শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন ভারত প্রেমী। এছাড়া মেইজি যুগের অনুগামী তাচিবানা জুইচো র (Tachibana Zuicho) দেওয়া একটি বক্তৃতা শুনে ভারতের প্রেমে পড়ে যান আরাই। এমনকি তাচিবানা জুইচোর বক্তৃতার ভিত্তিতে আরাই একটি স্কেচও এঁকে ফেলেন। স্বচক্ষে ভারতবর্ষকে একবার দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন আরাই। শেষমেশে, রবীন্দ্রনাথই তাকে সেই সুযোগটি করে দিয়েছিলেন।

জাপানে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ জাপানি শিল্পী শিমোমুরার আঁকা 'ইয়োরোবোশি' (১৯১৫) শিরোনামে ছটি প্যানেল যুক্ত একটি ছবির সংস্পর্শে আসেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে দূর দিগন্তে সূর্যকে সাক্ষী রেখে একটি জাপানি ফুল গাছের অজস্র ফুলের নিচে প্রার্থনারত 'শুনতোকুমারু' নামে এক অন্ধ ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে উপনিষদের একটি বাণীর কথা। বাণীটি বলছে, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' অর্থাৎ 'আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে চলো'। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, এই ছবি তাঁর কাছে এমন এক 'অপূর্ব উপলব্ধির বিষয়, যা কথায় বর্ণনা করা যায় না।'

রবীন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন যে, এই ছবির অনুলিপি তৈরি করে ভারতে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব কি না। তাঁর জাপানি আয়োজকরা এতে সম্মত হন এবং ছবিটির অনুলিপি তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় কামপো আরাইকে। আরাই সানকেই-এন (Sankei-en) প্রাঙ্গণের ভেতরে অবস্থিত একটি মণ্ডপে গিয়ে ওঠেন এবং 'ইয়োরোবোশি'-র অনুলিপি তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন আরাই-এর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন এবং তার শৈল্পিক দক্ষতা, শিল্পনৈপুণ্য ও চারিত্রিক মাধুর্য দেখে তিনি আরও বেশি মুগ্ধ হয়ে ওঠেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ আরাইকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানান। রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরোধ আরাই যেন তার আঁকা অনুলিপিটি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এবং ভারতে একজন জাপানি শিল্পের শিক্ষক হিসেবে, বিশেষ করে জাপানি ক্যালিগ্রাফি বা হস্তলিপি শিল্প এবং large-scale paintingএর শিক্ষক হিসেবে কিছুদিন থেকে যান। এর কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বাংলার শিল্পকলা মুঘল

মিনিয়েচারের গণ্ডির মধ্যে এখনও আবদ্ধ হয়ে আছে এবং আরাই-এর আগমনে কিছুটা হলেও জাপানি শিল্পের ছোঁয়ায় বাংলার সৃজনশীলতায় নবজীবন সঞ্চার করবে।

১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে হাতে আঁকা সেই ছবিটি নিয়ে টোকিও থেকে রওনা হয়ে ১৭ই ডিসেম্বর কলকাতায় এসে পৌঁছোন। ইংরেজি বা বাংলা ভাষার ওপর দখল না থাকা সত্ত্বেও কোনোভাবে সেই বাধা অতিক্রম করে তিনি কলকাতায় শিক্ষকতা শুরু করেন। আরাইয়ের ভাষায় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় ছিল পৃথিবীর বুকে একটি 'অরণ্য বিদ্যালয়' যা প্রকৃতির মাঝে বৃক্ষ ছায়াতলে পরিচালিত হতো। আরাই সকালবেলা শিক্ষকতা করতেন এবং বিকেলবেলা নিজের ছবি আঁকা ও স্কেচ করার কাজে মগ্ন থাকতেন। তাঁর কাজের মূল বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য ও বৌদ্ধ উপাখ্যান, যার পাশাপাশি তিনি ভারতীয় শৈলীতে জাপানি দেবদেবী ও বুদ্ধের স্কেচ আঁকতেন। আরাই তাঁর ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে গরুর গাড়িতে চড়ে বাংলার গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াতেন, কৃষকদের সঙ্গে মিশতেন এবং প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। পাশাপাশি তিনি শিল্পী নন্দলাল বসুর সঙ্গেও গভীর হৃদ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। শুধু কলকাতা বা শান্তিনিকেতনেই নয়, আরাই ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থস্থান থেকে শুরু করে সুদূর শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই ভ্রমণ তার নিজের বৌদ্ধ ধর্মনিষ্ঠাকে আরও গভীর ও সুদৃঢ় করে তুলেছিল। একবার তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণে আরাইকে বেশ কিছু কঠিন মুহূর্তেরও মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ভ্রমণের পথ ছিল অতি দুর্গম। যাত্রা পথে ভারতীয় গাইডের প্রচণ্ড অভাব বোধ করেছিলেন তিনি। সেই মুহূর্তে জাপানে ফেলে আসা তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের কথা বার বার মনে পড়ে যেত, মন হয়ে উঠত ভারাক্রান্ত। কখনও তাঁকে আহার-নিদ্রা ছাড়াই দিন কাটাতে হয়েছে। তবে সব শেষে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কষ্ট না করলে ভারতে তার জীবন সার্থক হতো না।

এমনকি কলকাতাতেও অনেক বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী ছিলেন কামপো আরাই। একবার এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল, আরাই কলকাতার একটি প্রেতচক্রে (seance) যোগ দিয়েছিলেন; সেখানে আরাইয়েরই এক পূর্বপুরুষের আত্মা আবির্ভূত হয়ে তাকে ইংরেজি ভাষায় অভিবাদন জানিয়েছিলেন। আরাইয়ের চোখে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন প্রকৃত ঋষি। একবার লক্ষ করলেন রবীন্দ্রনাথ তার আঁকা 'ইয়োরোবোশি' (Yoroboshi)র সেই প্রতিলিপির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকে পাঠ করছিলেন, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। এই দৃশ্য সেদিন আরাইকে অভিভূত

করেছিল।

ভারতে আরাইয়ের অবস্থানের শেষ পর্বটি অতিবাহিত হয়েছিল অজন্তা গুহাচিত্রের প্রতিলিপির কাজে নিমগ্ন হয়ে। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি অজন্তায় যান এবং ১৯১৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। এই কাজের অর্থায়ন করেছিল ওকাকুরার পত্রিকা ' কোক্কা' (*Kokka*)। আর এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন সাওয়ামুরা সেনতারো (Sawamura Sentaro) নামের এক বিশিষ্ট শিল্প-ইতিহাসবিদ। মূল চিত্রাঙ্কনের কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন আরাই, সঙ্গে ছিলেন আরও তিনজন চিত্রশিল্পী - আসাই কানপা (Asai Kanpa), কিরিতানি সেনরিন (Kiritani Senrin) এবং নউসু কোসেৎসু (Nousu Kosetsu)। হায়দ্রাবাদের নিজাম এই উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়েছিল এবং সর্বতোভাবে জাপানি শিল্পীদের সহায়তা করেছিল।

কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ তো ছিলই, তার সঙ্গে কাজের জন্য ব্যবহার করা হতো অতি সাধারণ কিছু নড়বড়ে মাচা। শিল্পীদের নড়বড়ে মাচার ওপর শুয়ে প্রদীপের আলোয় ছাদের চিত্রকর্মগুলো হুবহু আঁকতে হতো, আর আঁকার সময় নিজের হাতের রং ক্রমাগত চুঁইয়ে তাঁর মুখের ওপর পড়ত। তাছাড়া গুহার ভেতরে শ্বাপদসংকুল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তো আছেই। এই প্রকল্পের পরবর্তী বিবরণগুলো থেকে জানা যায় যে, আরাই ও তাঁর সঙ্গীরা টানা প্রায় তিন মাস ধরে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজটা সম্পন্ন করেছেন, এর মাঝে তারা বিরতি নিয়েছিলেন মাত্র দু তিন দিন। গুহার মূল চিত্রকলার স্রষ্টা সেই প্রাচীন শিল্পীদের প্রতি তাদের ঋণের তুলনায় এই কঠোর পরিশ্রমটুকু ছিল ন্যূনতম প্রতিদান মাত্র।

বোম্বাইয়ের 'জাপানিজ ক্লাব' - এ অজন্তার চিত্রকর্মের প্রতিলিপিগুলোর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করার পর, ১৯১৮ সালের মে মাসে কামপো আরাই নিজের দেশে পাড়ি দেন। ভারত থেকে পূর্বে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা হস্তাক্ষরে একখানি কবিতা উপহার দিয়েছিলেন।

জাপানে ফিরে আসার পর, ১৯২৩ সালে আরাই এক মর্মান্তিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। অজন্তার ১ নম্বর গুহা থেকে তিনি যে দুটি প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন 'ডিসেন্ট অফ ডিমনস' (Descent of Demons) এবং 'বোধিসত্ত্ব', সে দুটি চিত্রই নষ্ট হয়ে যায়। এক ভয়াবহ ভূকম্পন এবং অগ্নিকাণ্ডে ওই ছবিগুলো সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। তবে ভারত ভ্রমণের তার মধুর স্মৃতি এবং ভারতীয় চিত্রকলার প্রভাব তার নিজের ছবি আঁকার মাধ্যমেই অমর হয়ে রইল। তিনি হিন্দু দেব-দেবীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বুদ্ধের চিত্র

আঁকা শুরু করলেন, যা ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় শৈলীতে অলংকৃত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি শিল্পীদের ওপর তাদের কাজে দেশাত্মবোধক বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। সেই চাপ উপেক্ষা করে আরাই কিন্তু তার চিত্রকর্মে ভারতীয় প্রভাব অটুট রেখেছিলেন। আরাইয়ের আঁকা 'কোনোহানা সাকুয়া-হিমে' (১৯৩৮) (Konohana Sakuya-hime) বা পুষ্পদেবী ভারত-জাপান মিশ্র শৈলীর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। 'মারিশিতেন' (১৯৪১) (Marishiten) ছবিটি সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এক ভারতীয় দেবীর আদলে রচিত; এতে একটি বিশাল 'প্রভামণ্ডল' বা halo আছে, যা আরাইয়ের বহু ছবিতেই ভারতীয় শিল্পশৈলীর প্রভাবের একটি অন্যতম প্রধান থিম হিসেবে দর্শক-মনে জায়গা করে নিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরগুলোতে কামপো আরাই জাপানের ঐতিহাসিক নারা শহরে হোরিউ-জি (Horeyuiji) মন্দিরের 'গোল্ডেন হল'এর দেওয়াল চিত্রগুলোর প্রতিলিপি তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওনার সঙ্গে কাজ করেছিলেন এক দল জাপানি শিল্পী। এই দেওয়াল চিত্রগুলো প্রায় ১,২০০ বছর ধরে সংরক্ষিত এবং এগুলো জাপানের অবশিষ্ট প্রাচীনতম দেওয়াল চিত্রগুলোর অন্যতম। তিনি যখন ১০ নম্বর দেওয়াল চিত্রটির প্রতিলিপি তৈরির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছিলেন ঠিক তখনই আকস্মিক মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়। সময়টা ছিল ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাস। জাপানের ইতিহাসে সেটি ছিল এক অত্যন্ত সংকটময় রাজনৈতিক অধ্যায়। সেই সময় জাপানের প্রতিটি মানুষের জীবনে দেশের জন্য যুদ্ধে অংশ নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও কাজে নিযুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় তখন জাপানের দরজায় এসে উপস্থিত। জাপানিরা মনে করেন বহু দশক আগে 'Pan Asia'র আদর্শের বিকৃতির ফলে আজ এত দুর্ভোগ। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপানিদের যে সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন, তা কেউ কর্ণপাত করেননি। তাঁর পরম বন্ধু ওকাকুরা কাকুজোর এশীয় ঐক্যের স্বপ্নও তখন ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কামপো আরাইএর মতো শিল্পীদের জীবনে ও কাজের মধ্যে সেই আদি অনন্ত 'Pan Asia ভ্রাতৃত্ববোধ' ও চেতনা আরও একবারের জন্য বিকশিত হয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকে কামপো আরাইএর নিজের শহর উজিইয়ে-তে প্রতিষ্ঠিত হলো Kanpo-Tagore Peace Parkএর। সেখানে জাপানিরা আজও সেই ঐতিহাসিক সম্পর্ককে স্মরণ করেন। তারই পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে Tagore International Universityও।

একাকী একটি বৃক্ষ ও আত্মার অস্তিত্ব

অধ্যাপক ঋতেন্দ্র রায়

বিনোদবিহারীর ছবি

[*সমসাময়িক চিত্রশিল্পীদের অন্যতম অধ্যাপক ঋতেন্দ্র রায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন। বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিস্যুয়াল আর্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। কলকাতা এবং দিল্লিতে ওনার বেশ কিছু প্রদর্শনী হয়ে গেছে। তাঁর শিল্পকর্ম বর্তমানে বিভিন্ন সংগ্রহশালায় স্থান করে নিয়েছে এবং শিল্পরসিক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে গভীর আগ্রহ সঞ্চার করেছে।*]

ব্যক্তির বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনে প্রকৃতি চিরকালই এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আশ্রয়স্থল হিসেবেও প্রকৃতি সর্বদাই

মানুষের কাছে বরণীয়। প্রকৃতির মাঝে 'স্থানে'র যথার্থ উপলব্ধি এবং অনুভূতি মনের গঠনকে গোড়া থেকে নির্মাণ করে। শান্তিনিকেতনের উৎপত্তির মূলে এমনই এক চিন্তাধারার অবদান ছিল। ১৮৬৩ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের কুলপতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) বাংলার বীরভূম জেলার বোলপুর অঞ্চলে একখণ্ড জমি কিনেছিলেন। রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করে অবশেষে কোনও এক সময় তিনি এক বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই বিশাল প্রান্তরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি একাকী ছাতিম গাছ বা সপ্তপর্ণী বৃক্ষ সেদিন তাঁর দৃষ্টি ও কল্পনাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

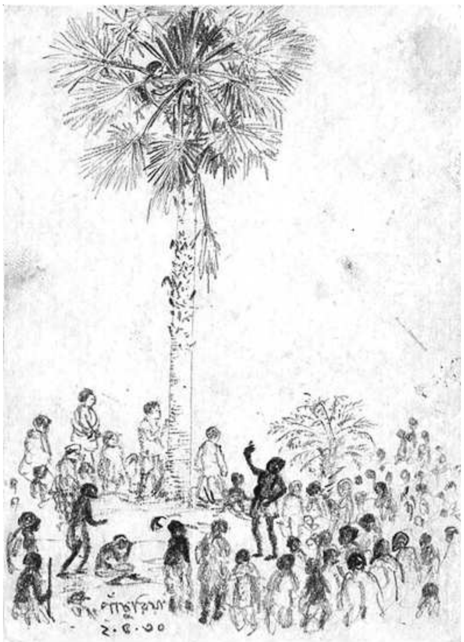

বিনোদবিহারীর ছবি

সেই বিশাল প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা ছাতিম গাছটিকে ঘিরে এক অসীম ও অপরিমেয় অনুভূতির সন্ধান পেয়েছিলেন মহর্ষি। সেদিন একান্ত নিজস্ব জগতে আত্মমগ্ন হয়ে গভীর চিন্তায় মজে ছিলেন তিনি। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে সে দিন ছাতিম গাছের পাদদেশে ধ্যানমগ্ন হয়ে পরম স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছিল। ''তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি''। এই অদ্বিতীয় সত্তার স্বরূপকে উপলব্ধি করে নীরবে যে নির্মল আনন্দ মহর্ষি অনুভব করেছিলেন, সেই আনন্দই মহর্ষিকে জাগতিক বিষয়বাসনাপূর্ণ জীবন থেকে সরে এসে এক ত্যাগের জীবন গ্রহণের পথ দেখিয়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন পবিত্র স্থানে বসেই তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার ধারাকে আরও সুদূরপ্রসারী ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম্ভব। সেই পবিত্র স্থানে নির্মিত আশ্রমটির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে মহর্ষি নিজেই এর নামকরণ করেছিলেন 'শান্তিনিকেতন' - The Abode of Peace।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় পরবর্তী আশ্রমবাসীরা বাস্তবে এই রূপকল্পের রূপায়ণকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং আরও অনেক পথ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রেম ও মনের বিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলার এই পথটি কলাভবনের শিল্পীদের সৃষ্টিকর্মে একদিন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। কলাভবনের 'মাস্টারমশাই' নন্দলাল বসুর অন্যতম প্রিয় শিষ্য বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এই বিশেষ উপলব্ধির এক স্বতন্ত্র দাবিদার হিসেবে একদিন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে বীরভূমের রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতির সেই গ্রামীণ ও অনাড়ম্বর রূপটি তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠন এবং একজন শিল্পী হিসেবে তাঁর ভূমিকা নির্ধারণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জন্মগত দৃষ্টিস্বল্পতা এবং শারীরিক দুর্বলতার কারণে, সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা ও সংযোগ স্থাপনে বিনোদবিহারীর কিছুটা হলেও সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতাই একদিন বিনোদবিহারীর মধ্যে প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগের জন্ম দিয়েছিল। তিনি প্রকৃতির বস্তুসত্তা এবং নিজের অস্তিত্বের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ককে খুঁজে পেয়েছিলেন। একজন শিল্পী হিসেবে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল অত্যন্ত গভীর।

সত্তর দশকের শুরুতে *Inner Eye* ছবির নির্মাণের সময় তাঁরই কৃতি ছাত্র, বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতায় এমনই এক গভীর সংযোগ এবং সম্পৃক্ততার বিশ্বস্ত প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। 'খোয়াই আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সলিটারি তালগাছ - ব্যস, এটুকুই। আমার সত্তা, আমার জীবনের স্পিরিট তুমি যদি কোথাও খুঁজে পেতে চাও, ওতেই পাবে। বলতে পারো - ওটাই আমি'।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি বিনোদবিহারীর গভীর সংবেদনশীলতা এবং সেখানে তাঁর 'আত্মা'র উপস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ - এর সব কিছুর মধ্যেই ছিল তাঁর জীবনের অস্তিত্ব। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর চেতনার এক বিশেষ আলোকধারায় স্নাত আর সেই আলোকধারায় তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন প্রকৃতির ঐশ্বরিক রূপকে, তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে। এর জন্য প্রয়োজন হলো এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, যেখানে প্রকৃতির বাস্তব রূপ শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করবে, যা জীবনের শাশ্বত নিশ্চয়তাকে বহন করে আনবে। এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তাঁর বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

সিনেমার পোস্টারকে প্রথম শিল্পের মর্যাদা দিয়েছেন সত্যজিৎ

রাধিকা রাঘব

[ডঃ রাধিকা রাঘব - Visual studies-এর ওপর Phd এবং শিল্প ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণার মূল বিষয় South Asian visual culture and consumer culture-এর পাশাপাশি সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র বিষয় নিয়েও গবেষণা করছেন। তিনি বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Social Sciences-এর ফ্যাকাল্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। *অন্বেষা*র উদ্দেশ্যে প্রেরিত মূল রচনা ইংরেজি থেকে তার লিখিত সম্মতিক্রমে সম্পাদকের কলমে বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো।]

চলচ্চিত্র জগতে পুরনো দিনের হাতে আঁকা সিনেমার পোস্টারের মধ্যে যে একটা সামাজিক ঐতিহ্য ছিল, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তখনকার দিনে সিনেমার বিজ্ঞাপনের জন্য হাতে আঁকা বাণিজ্যিক পোস্টারগুলোর নিঃসন্দেহে একটা স্বতন্ত্র শিল্পমূল্য ছিল। আজকের দিনে নতুন করে পোস্টার শিল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে সেই সত্যটাই বার বার করে উঠে আসছে। একই সঙ্গে বহু উপেক্ষিত সেই সব শিল্প-ঐতিহ্য, শিল্প মহলে আজ নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। শুধুমাত্র সংরক্ষণাগারের দলিল হিসেবেই নয় বা চলচ্চিত্র বিষয়ে গবেষণার উপকরণ হিসেবে নয়, আজকের দিনে এই বিরল শিল্পসৃষ্টি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূচক হিসেবেও স্বীকৃতি পাচ্ছে।

আগেকার দিনের সিনেমার পোস্টারে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রগুলোর যদি আমরা শ্রেণীবিভাগ করি, তবে প্রথমেই আলোচনায় আসবে মূলধারার ‘বাণিজ্যিক ছবি’ - যার পোশাকি নাম ‘বলিউড সিনেমা’। বাদবাকি ছবিগুলোকে ‘সমান্তরাল চলচ্চিত্র’ নামে আখ্যা দেওয়া হয়। এই ছবিগুলো সাধারণত হয় বিষয়-কেন্দ্রিক এবং ঘোর বাস্তববাদী। মূলধারার ছবির পোস্টার মানেই দৃশ্যত চূড়ান্ত নাটকীয়তার প্রদর্শন, ঝলমলে পোশাক পরিহিত তারকাদের আধিপত্য এবং দর্শক-বিনোদনের প্রায় সব রকম উপকরণের সমন্বয়। পাশাপাশি সমান্তরাল সিনেমার পোস্টারগুলোতে গল্পের সারমর্ম এবং তার বাস্তব

বিষয়বস্তুকেই বেশি করে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়।

রাজেশ দেবরাজ *The Art of Bollywood* গ্রন্থে বিশদে বর্ণনা করেছেন কীভাবে বাণিজ্যিক আর্ট স্টুডিওগুলো একসময় বম্বে মুলুকে চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য পোস্টারের কাজ করতো। ওখানকার পোস্টার শিল্পীরা নিজেদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী তৈরী করে একজন মাস্টার আর্টিস্টের তত্ত্বাবধানে সম্মিলিতভাবে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বাণিজ্যিক ছবির পোস্টার তৈরির কাজ করতো। বিশাল আকৃতির ক্যানভাস, সঙ্গে উজ্জ্বল বহুবর্ণের প্রলেপ, সেই সঙ্গে নায়ক নায়িকাদের অত্যন্ত সাহসী শারীরিক ভাষা সম্মিলিত প্রকান্ড বড় অবয়ব - মোটামুটি এই ছিল তখনকার দিনের মূলধারার বাণিজ্যিক সিনেমার পোস্টারের বিষয়। বিপরীতে, সমান্তরাল সিনেমার পোস্টারগুলোর সূক্ষ্ম শিল্পশৈলীকে নিপুণভাবে ব্যবহার করে সিনেমার বিভিন্ন দৃশ্যকে অপ্রচলিত কম্পোজিশন বা ছবির প্রণয়নের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হতো। অসাধারণ অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মের মাধ্যমে এক সূক্ষ্ম রঙের সমন্বয়ে নিপুণভাবে সিনেমার মূল বিষয়টি পোস্টারে ফুটিয়ে তোলা হতো। আঁকাগুলোর মধ্যে উদ্ভাবনী নৈপুণ্য ছিল দেখার মতো।

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম ১৯২১ সালে, কলকাতায়। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই কলকাতা বুদ্ধিজীবী এবং আধুনিক রুচি সম্পন্ন মানুষের কেন্দ্রস্থল হিসেবে সুপরিচিত। কলকাতার সেই প্রগতিশীল সামাজিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে সত্যজিতের বড় হয়ে ওঠা। ভারতীয় সনাতনপন্থী সমাজকে বর্জন করে কলকাতার আধুনিক উদারপন্থী সমাজকে অবলম্বন করেই সত্যজিতের নিজস্ব জগতের উৎপত্তি। বাংলার সমান্তরাল সিনেমার পথিকৃৎ সত্যজিৎ রায় গোড়া থেকেই অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে নিজের পরিচালিত ছবির সমস্ত পোস্টার নিজেই করতেন আর সেই পোস্টারগুলোর জনপ্রিয়তা তাঁরই নির্মিত চলচ্চিত্রের থেকে কোনও অংশে কম হত না। চলচ্চিত্র জগতে তাঁর প্রতিটি শিল্প রচনা বিশুদ্ধ শৈল্পিক স্বতন্ত্রতার সাক্ষ্যভারই বহন করে। শৈলীগতভাবে তাঁর পোস্টারগুলোতে বেঙ্গল স্কুল অফ্ আর্ট-এর শৈল্পিক অনুশীলনের ছাপ স্পষ্ট।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নন্দলাল বসু এবং চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মতো দূরদর্শী শিল্পীদের কাজে সত্যজিৎ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে, মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে নন্দলাল গুজরাটের হরিপুরায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য পোস্টার তৈরি করেছিলেন। এই পোস্টারগুলোতে নন্দলাল আদিবাসী শিকারী, সংগীতশিল্পী, ষাঁড়ের পালক, কাঠমিস্ত্রি, তন্তুবায়, ধান মাড়াইরত মহিলা এবং অন্যান্য আদিবাসী শ্রমিকদের দৈনন্দিন কাজে নিযুক্ত দৃশ্যগুলোকে নিপুণ হাতে তুলে ধরেছিলেন।

উজ্জ্বল মেটে রঙের প্যালেট এবং বলিষ্ঠ রেখার প্রাণবন্ত ব্যবহারে এই পোস্টারগুলো প্রচলিত শিল্পশৈলী থেকে বেরিয়ে এসে যেন আধুনিক গ্রাফিক্সের চরিত্র রচনা করেছে। ঐতিহ্যবাহী অথচ আধুনিক হরিপুরা পোস্টারের মধ্য দিয়ে নন্দলাল সমকালীন জাতির মানসিক ঐক্যকে যেমন চিত্রিত করেছেন, ঠিক তেমন ভাবেই গ্রামীণ ভারতীয় চেতনাকেও জাগ্রত করেছেন।

চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিনোকাট এবং কালি ও কলমের স্কেচের মাধ্যমে তাঁর সংস্কারবাদী চিন্তা ভাবনা দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। মূলত তাঁর কাজের বিষয় ছিল দরিদ্র মানুষের দুর্দশার এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনের কঠোর সংগ্রামের কথা। ১৯৪৩ সালের বাংলার মন্বন্তরের চিত্রিত প্রতিবেদন Hungry Bengal তাকে তাঁর সময়কালের একজন সক্রিয় এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। চিত্তপ্রসাদের কাজের মূল লক্ষ্য ছিল দেশবাসীর মধ্যে এক সমষ্টিগত সামাজিক চেতনাকে গড়ে তোলা। তাঁর শিল্পে ছিল এক কঠোর ব্যঙ্গাত্মক ঝলক এবং অস্পষ্ট, অন্ধকার হাস্যরসের সঙ্গে এক বিদ্রোহী ধারার মিশ্রণ। চলচ্চিত্র নির্মাতা বিমল রায় ১৯৫৩ সালে দো বিঘা জমিন ছবিটি তৈরির সময় চিত্তপ্রসাদকে অনুরোধ করেছিলেন তার ছবির জন্য একটি বিজ্ঞাপনী পোস্টার তৈরি করে দিতে। বিমলবাবুর কথা রেখেছিলেন চিত্তপ্রসাদ। কৃষকদের উপর শিল্পায়নের নিষ্ঠুর প্রভাবকে তুলে ধরার জন্য লিনোকাটের কৌশলকে ব্যবহার করে একটি চমৎকার বিজ্ঞাপনী পোস্টার তৈরি করেছিলেন। নন্দলাল এবং চিত্তপ্রসাদের পোস্টারগুলো জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য নান্দনিকভাবে কল্পনা করা হলেও সত্যজিৎ রায়ের পোস্টারগুলোর চিত্রশৈলী ছিল কিছুটা ভিন্ন। সত্যজিৎ তাঁর পোস্টারে স্বাভাবিক পরিস্থিতির এক আশ্চর্য-সুন্দর মহত্ত্বকে উদার ভাবে উদ্‌যাপন করেছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সুচিন্তিত ভাবনা,

স্নিগ্ধতা এবং একই সঙ্গে তাঁর কাজের সূক্ষ্মতা।

জাতীয় সীমানা পেরিয়ে ঐতিহ্য এবং শিল্পের ধারা সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের বিস্তৃত ধারণা নিঃসন্দেহে তাঁকে একজন সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য খাঁটি ভারতীয় শিল্পী হতে সাহায্য করেছিল। জ্যাঁ রেনোয়া, ফ্রাঙ্ক ক্যাপ্রা, উইলিয়াম ওয়াইলার এবং বিলি ওয়াইল্ডারের সিনেমার প্রতি তাঁর প্রাথমিক অনুরাগ তাঁকে চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্পের সূক্ষ্ম দিকগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করেছিল। ধ্রুপদী সাহিত্য এবং সংগীতের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবং নিবিড় সম্পৃক্ততা যে তাঁর কাজে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বহু প্রসঙ্গে সত্যজিৎ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে তাঁর অন্তরের শৈল্পিক শৈলীকে নির্মাণ করতে যে সকল পরিবেশের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে, তার মধ্যে তাঁর শান্তিনিকেতনের দিনগুলো অন্যতম। কলাভবনের শিক্ষা তাঁর শিল্প জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সত্যজিৎ ১৯৪০ সালে শান্তিনিকেতনে চারুকলার ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। সেই সময় শান্তিনিকেতনে কলাভবনের খ্যাতি ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য, মৌলিকত্ব এবং সৃজনশীলতার প্রসারের জন্য সারা দেশ জুড়ে বিস্তৃত। কলাভবনের শিল্পীরা প্রচলিত মূলধারার শিল্পের মাধ্যমগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবগত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সচেতনভাবে বাণিজ্যিক শিল্পশৈলী এবং তার থিমগুলোকে কার্যত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরিবর্তে, তারা তাদের সাংস্কৃতিক নির্ভরযোগ্যতা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের কাজের সীমানাকে আরও প্রসারিত করার চেষ্টা করে গেছেন।

Satyajit Ray -- An Intimate Master গ্রন্থে দিনকর কৌশিক রচিত *Those Kala Bhavan Days* প্রবন্ধের একটি অংশ দুই বন্ধুর শিল্পাদর্শের একটি বিশেষ দিক নির্ণয় করে। পাঠকদের জন্য অংশটি তুলে ধরলাম--

'হোস্টেলের বারান্দাটা ছিল বস্তুত আমাদের বৈঠকখানা ঘর। আমরা সবাই সেখানে জড়ো হয়ে বর্তমান বিশ্ব শিল্পকলা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতাম (...)। অন্তহীন চলতো সেই আলোচনা; পল ক্লি, ব্রাঙ্কুসি, ক্যান্ডিনস্কি, জ্যঁ মিরো, পিকাসো, সালভাদোর ডালি এবং সেজানের মতো শিল্পীরা ছিলেন আমাদের আদর্শ পুরুষ। সেই তালিকায় অন্যান্য ভারতীয় শিল্পীদের বড় একটা নাম না থাকলেও যাঁদের নাম আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতাম তাঁরা হলেন বিনোদবিহারী, নন্দলাল, রামকিঙ্কর, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং যামিনী রায়। বোম্বের কোনও শিল্পী এই 'অভিজাত তালিকায়' আমাদের অনুগ্রহ পেতেন না। আমাদের মতে বোম্বাই শিল্পীরা অনুকরণবাদী এবং নিজেদের পরিবর্তে

গ্রাহকদের খুশি করার জন্য যেন তারা ছবি আঁকতেন।' (অনুবাদ)

শান্তিনিকেতনে সত্যজিৎ রায়ের শিক্ষক নন্দলাল বসু এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান শিল্পী। শিল্পের প্রতি ছিল তাঁদের সর্বভারতীয় এক উদার দৃষ্টিভঙ্গি। ছাত্র অবস্থা থেকে তাঁদের তত্ত্বাবধানে ধ্রুপদী এবং লোকশিল্পে শিক্ষা লাভের ফলে সত্যজিৎ ভারতীয় শিল্পকে এক ব্যতিক্রমী শিল্প হিসেবে দেখতে শিখেছেন এবং ভারতীয় শিল্পের মূল্যবোধগুলোকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। শান্তিনিকেতনে ভারতীয় শিল্প ও নান্দনিকতার উপর এক মজবুত ভিত্তি তৈরী করে সত্যজিৎ কলকাতায় ফিরে এসে প্রকাশনা সংস্থাগুলোতে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কাজ শুরু করেন।

অলংকরণে তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনী শিল্পশৈলী খুব তাড়াতাড়ি সত্যজিৎকে কলকাতার গ্রাফিক ডিজাইনার মহলে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। সত্যজিৎ গল্প ও উপন্যাসের অলংকরণ, বিভিন্ন পত্র পত্রিকার প্রচ্ছদ, টাইপফেস এবং প্রচারপত্রের নকশার কাজ নিপুণভাবে করা শুরু করেছিলেন। সত্যজিৎ প্রচলিত গ্রাফিক ডিজাইনে শুধু পরিবর্তনই আনেননি, তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে গ্রাফিক শিল্পকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে শুরু করলেন যা আগে কখনও কেউ ভেবেও দেখেনি। ওঁর কাজের সর্বোত্তম উদাহরণ হল শিশুদের ম্যাগাজিন সন্দেশ-এর পুনরুজ্জীবন। পরিতোষ সেন লিখেছিলেন, 'প্রিন্টিং ডিজাইনে সত্যজিৎ রায় একটি ছোটখাটো বিপ্লব এনেছিলেন'। তবে, চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে এক নতুন পেশায় এসেও সত্যজিৎ গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনের কিন্তু সমাপ্তি ঘটান নি। তিনি বরাবরই নিজের তৈরী চলচ্চিত্রের প্রচার সামগ্রী, ফিল্ম-স্লাইড, পোস্টার, পুস্তিকা, রেকর্ড কভার ডিজাইনের কাজ সমান ভাবে চালিয়ে যান।

পোস্টার ডিজাইনার হিসেবে সত্যজিৎ কাঠ-খোদাই, লিনোকাট, স্ক্র্যাপার বোর্ড এবং কলম ও কালির স্কেচের মতো বিভিন্ন ধরনের স্টাইল এবং মাধ্যমকে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। কখনও কখনও তিনি তাঁর বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে লাইন ড্রয়িং এবং জল রঙের মাধ্যমকে বেছে নিয়েছিলেন, যার মধ্যে wash techniqueও বাদ পড়ে নি। তাঁর পোস্টার ডিজাইনে আধুনিক বিজ্ঞাপনের ছোঁয়া সুস্পষ্ট। এমন অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শক আগে কখনও উপলব্ধি করার অবকাশ পায় নি। সিনেমার পোস্টার পরিকল্পনায় নান্দনিকতার সঙ্গে বাণিজ্যিক সংশ্লেষণ বার বার ফুটে উঠেছে। এই লেখার পরবর্তী বিভাগে তাঁর সৃষ্ট কিছু চলচ্চিত্রের পোস্টার নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

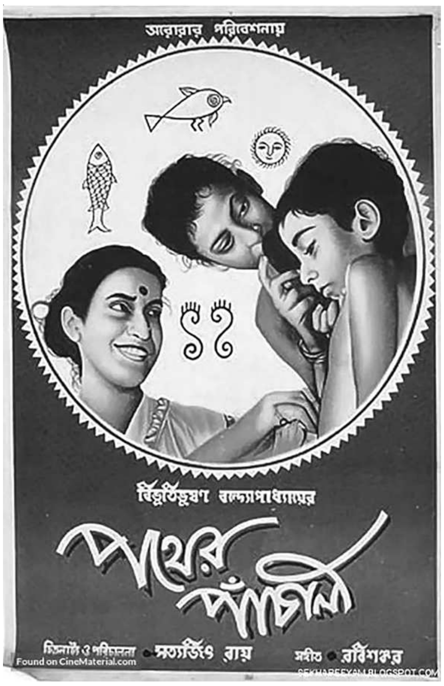

পথের পাঁচালী, ১৯৫৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস *পথের পাঁচালী*র সংক্ষিপ্ত *সংস্করণ আম আঁটির ভেঁপু*র অলংকরণ করার সময় সত্যজিৎ রায়ের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণের ভাবনা মাথায় আসে। বাংলার এক নামগোত্রহীন গ্রামীণ জনপদের গল্প নিয়ে *পথের পাঁচালী* ছবিটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ছবির চিত্রগ্রহণের আগে একটি ছোট নোটবইয়ে কমিক স্ট্রিপের আদলে চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট তৈরি করে নিয়েছিলেন সত্যজিৎ। এইভাবে তিনি চরিত্রগুলোকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে সাজিয়েছিলেন এবং ক্যামেরার ফ্রেমের খসড়া পর্যন্ত তৈরী করে ফেলেছিলেন। এমনকি প্রতিটি দৃশ্যের সামগ্রিক চেহারাটা কেমন হবে তাও ছবি এঁকে এঁকে তৈরি করে রেখেছিলেন। সত্যজিৎ তাঁর ছবির চরিত্রগুলোর পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সেটের বিশদ বিবরণও আগে থাকতেই খসড়া বানিয়ে রেখেছিলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে ছবি নির্মাণের আগেই সত্যজিৎ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে গোটা সিনেমার প্রতিটি দৃশ্যকে মনে মনে ভেঙে ভেঙে নির্মাণ করে রেখেছিলেন। সুতরাং সত্যজিৎ যে তাঁর প্রথম ছবির পোস্টার ডিজাইন এবং বিজ্ঞাপন সামগ্রী নিজের হাতেই তৈরি করবেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, বরং তাঁর কাছে সেটাই ছিল প্রত্যাশিত।

*পথের পাঁচালী*র পোস্টারে সত্যজিৎ সিনেমার একটি বিশেষ দৃশ্যকে ব্যবহার করেছেন যেখানে বালক অপু তার মমতাময়ী মা এবং দিদি দুর্গার সঙ্গে একই ফ্রেমে বন্দি হয়ে আছে। মা সন্তানকে পোশাক পরানোর সময় সন্তানের প্রতি স্নেহ মাখা হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন এবং দিদি দুর্গা যত্ন করে মোটা চিরুনি দিয়ে ভাইয়ের চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। ছবিটি গভীর পারিবারিক উষ্ণতাকেই প্রকাশ করছে। তিনটি চরিত্রকেই আল্পনার

মতো একটি বৃত্তাকার ফ্রেমে বন্দি করা হয়েছে। দৃশ্যের এই অসাধারণ composition দর্শকদের কাছে এক ঝলক সরল গ্রাম্য অথচ নিষ্পাপ পারিবারিক জীবনের অনুভূতি এনে দেয়। ছবিটির পটভূমিতে একটি বৈচিত্রহীন একরঙা base ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার ওপর কতগুলো সাধারণ গ্রামীণ নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পোস্টারটি প্রথম থেকেই দর্শকের মনে সহানুভূতির সঙ্গে এক প্রান্তিক গ্রামীণ সরল পরিবারের চালচিত্রকে তুলে ধরেছে।

দেবী, ১৯৬০

দেবী ছবিটিতে সত্যজিৎ মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের চরম পরিণতিকে দর্শকের সামনে উপস্থিত করেছেন। ছবিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে একজন তরুণী ধীরে ধীরে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী দেবীর অবতার হিসেবে নিজেকে রূপান্তরিত করছে। কুসংস্কারের পরিণতি এক দুঃখজনক মৃত্যু। সিনেমার পোস্টারটাও বেশ অভিনব এবং এক চূড়ান্ত পরিণতির ভয়াবহ প্রভাবকে তুলে ধরেছে। জমিদার পরিবারের পুত্রবধূ দয়াময়ী ছবির কেন্দ্রীয় মুখ। পোস্টারে দয়াময়ীর মুখমণ্ডলী দুটি রঙে বিভক্ত, এক দিক হালকা এবং অন্যদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, যা দেবীর মনের

শান্ত এবং ক্রোধী উভয় দিককে ইঙ্গিত করে। আবার দয়াময়ীর মুখের অর্ধেক অংশ সমাজে প্রচলিত গোঁড়া সংস্কারের অস্বচ্ছ দিকটাকে তুলে ধরেছে। পোস্টারে সত্যজিৎ দেবী কালীর আদলে দয়াময়ীর মুখাবয়বকে রচনা করেছেন। দেবী রূপী দয়াময়ী বাদামের মতো টানা টানা চোখ নিয়ে সরাসরি দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছে, মুখমণ্ডলে সাহসী ভ্রু যুগল ধনুকের মতো বক্র এবং কপালে একটি মস্ত বড় লাল সিঁদুরের টিপ আঁকা। টাইটেলের টাইপোগ্রাফিতেও যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে। এখানে ছবির টাইটেল দেবীর মন্দিরের কাঠামোর আদলে আঁকা।

চারুলতা, ১৯৬৪

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নষ্টনীড় থেকে গৃহীত *চারুলতা* ছবিটিতে সত্যজিৎ চারুলতা নামে একজন গৃহিণীকে কেন্দ্র করে একটি আখ্যান উপস্থাপন করেছেন। মূল রচনায় রবীন্দ্রনাথ অবশ্য চারুলতাকে একজন 'যুবতী নারী' হিসেবে চিত্রিত করেছেন। অন্যদিকে *চারুলতা* ছবিটিতে সত্যজিৎ নাম ভূমিকায় একজন পরিণত নারীর আদল ফুটিয়ে তুলেছেন, যিনি নিজের দেবরের প্রতি তার সুপ্ত অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন। সিনেমার কাহিনী চারুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু নির্মিত হয়েছে। ছবির পোস্টারে সত্যজিৎ দ্রুত ক্যালিগ্রাফিক ব্রাশ স্ট্রোকের সাহায্যে একাকিত্বের বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়া চারুলতার চরিত্রটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এখানে ছবির পোস্টারে অন্য কোনও চরিত্রকে আনা হয়নি। অপরদিকে পোস্টারে নায়িকার গভীর মানবিকতাকেও তুলে ধরেছেন শিল্পী। তার আকুল চোখ, সুদৃঢ় দৃষ্টি এবং উঁচু নাসিকা বুঝিয়ে দেয় যে চারুলতা লজ্জাশীলা বা রক্ষণশীলা নন, বরং মনে মনে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। সম্ভবত, সত্যজিৎ সচেতনভাবে চারুলতার চরিত্র রূপায়ণে একটি কাব্যিক রূপরেখা বেছে নিয়েছিলেন, যাতে তৎকালীন বাংলা চলচ্চিত্রে মাধবী মুখার্জীর মতো একজন প্রতিষ্ঠিত তারকার গ্ল্যামারকে সযত্নে এড়ানো যায়। অপর দিকে সিনেমায় চারুলতার সৌন্দর্যকে অত্যন্ত সংযতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

শতরঞ্জ কে খিলাড়ি, ১৯৭৭

মুন্সি প্রেমচাঁদের লেখা ছোটগল্প *'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'* অবলম্বনে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় রাজন্যবর্গকে দখল করার এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের কাহিনী। সিনেমার পর্দায় দুটি সমান্তরাল

গল্পের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, একটি আওয়াধ রাজ্যকে দখল করার উদ্দেশ্যে কোম্পানির ষড়যন্ত্র এবং অপরটি লখনৌ নিবাসী দুই ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি - মীর এবং মির্জা এবং তাদের দাবা খেলার প্রতি অদম্য আসক্তিকে কেন্দ্র করে। মীর এবং মির্জা শতরঞ্জ খেলায় এতটাই মগ্ন যে পটভূমিতে রাজ্য দখলের জন্য ব্রিটিশ সৈন্যদের আগ্রাসী ভূমিকা সম্পর্কে তাদের কোনও হুঁশ নেই। শতরঞ্জে আসক্তির ফলে পরিবার এবং রাজ্যের প্রতি তাদের কোনও কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে না। ছবির প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে দুই সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির দায়িত্ব এড়ানোর অজুহাতকে বার বার স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। ছবির সংলাপে তাদের সহজ স্বীকারোক্তি, 'আমরা আমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে যখন মানিয়ে নিতে পারি না, তখন কীভাবে আমরা কোম্পানির সেনাবাহিনীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবো!' (অনুবাদ) এই হতাশা থেকেই বার বার তাদের নিষ্ক্রিয়তা প্রকাশ পাচ্ছে। এই অসম্পৃক্ততাই চলচ্চিত্রের প্রধান বিষয়বস্তু। এই ছবি দেখলে বোঝা যায় ব্রিটিশ সরকারের অপশাসনের কাছে কী ভাবে পর্যুদস্ত ভারতীয় সমাজ ধীরে ধীরে পতনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

শতরঞ্জ কে খিলাড়ি ছবির পোস্টার ডিজাইন করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় শিল্পের প্রাথমিক বৈশিষ্টগুলোকে এক ফ্রেমে ধরে রেখে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটি চিত্রকল্পনা উপস্থাপন করেছেন। শতরঞ্জ খেলার আকারে দুটি অক্ষর ''S'' (শতরঞ্জ বা দাবার আদ্যক্ষর) এবং ''K'' (খিলাড়ি বা খেলোয়াড়ের আদ্যক্ষর)কে লম্বালম্বি, অর্থাৎ vertically দাঁড় করিয়ে ফিলার হিসেবে ফ্রেমের খালি জমিকে ব্যবহার করেছেন। উপরের অক্ষরের অর্থাৎ ''S''এর চওড়া baseএর ওপর একটি কোম্পানির পতাকা এঁকেছেন যা ভারতীয় রাজ্যগুলোর ওপর ব্রিটিশ প্রশাসকের বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করছে। অন্য অক্ষরের গোড়ায়, অর্থাৎ ''K'' এর দুটো পায়ের নিচে একটিতে মীর এবং অন্যটিতে

মির্জাকে উপযুক্ত ভাবে উপস্থিত করেছেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মীর এবং মীর্জা একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। দুই ধনী ব্যক্তি দাবার বোর্ডের উপর চোখ রেখে চিন্তাশীল মনে চাল দেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। মীরকে দেখা যাচ্ছে একটি ঘুটিকে আঙুলের চাপে তুলে নিয়ে একটা চাল দিতে প্রস্তুত হচ্ছে। মির্জা হুক্কার পাইপ মুখে নিয়ে ধূমপান করতে করতে খেলায় মনোনিবেশ করছে। পোস্টারে মূলত দুটো রং ব্যবহার করেছেন সত্যজিৎ। এই concept যেন নন্দলালের সাদা-কালো লিনোকাট পদ্ধতির আদলে আঁকা। সত্যজিৎ রায় সাদা কালোর বদলে হলুদ আর কালো রং ব্যবহার করে পোস্টার ডিজাইনে এক অভিনবত্ব এনেছেন। কালো রঙে বিশেষ এক ধরনের টাইপের অক্ষরগুলো যেন একটা কর্তৃত্বের ভাব ফুটিয়ে তুলছে। অপরদিকে ছবির হলুদ পটভূমি দর্শকের এবং ধনী ব্যক্তিদ্বয়ের আবেগকে যেন আরও বেশি করে উস্কে দিয়েছে, এটাই সত্যজিতের বৈচিত্র।

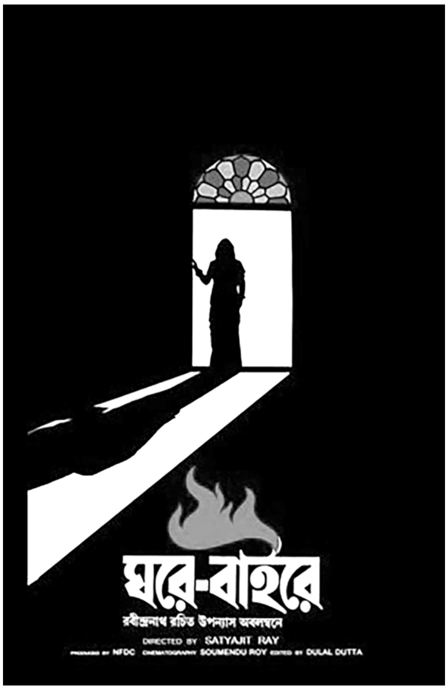

ঘরে-বাইরে, ১৯৮৪

ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজে দীর্ঘদিন ধরে নারীর সম্মুখে সারা বিশ্বের জানালা দরজাগুলোকে আষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধ করে রাখা ছিল। মেয়েদের গতিবিধি, সামাজিকীকরণ এবং সামাজিক বিকাশকে নানা ভাবে, নানা অজুহাতে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জোরে সীমিত করে রাখা হয়েছিল। অবশেষে বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রভাবে সেই সঙ্গে আধুনিকতাবাদী তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে সামাজিক স্বাধীনতাকে প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকার হিসাবে মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছিল। প্রতিটি আধুনিক পুরুষ সচেতনভাবে সেই যুগবাহী সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেছিলেন। অপর দিকে একজন পুরুষ তার বিবাহিত স্ত্রীর সম্মুখে

বিশ্বের প্রতিটি জানালা দরজাকে উন্মুক্ত করার সংকল্প নিয়েছিলেন। কেউ নারী শিক্ষাকে সমর্থন করে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, কেউবা একজন বিধবার জীবনে সামাজিক সর্যাদা দিতে তার পাণিপ্রার্থী হয়েছেন। সত্যজিৎ রায়ের ছবি *ঘরে বাইরে* ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সমাজের পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক নারীর উত্থানের কাহিনীর সুস্পষ্ট প্রতিফলন। ছবিতে সত্যজিৎ এমনই একজন দম্পতির প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন যেখানে স্বামী স্ত্রী যৌথ ভাবে বাইরের পৃথিবীকে অন্বেষণ করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস অবলম্বনে একজন মহিলা ও একজন পুরুষের মধ্যে সামাজিক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন সত্যজিৎ রায়।

ঘরে বাইরে সিনেমার পোস্টার পরিকল্পনায় সাবেকি এবং নতুন চিন্তাভাবনার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ফুটে উঠছে। ছবিতে কালো রং এক নির্জন অন্তর্জগৎকে ইঙ্গিত করছে এবং সাদা রঙ ব্যবহার করা হয়েছে বাইরের উন্মুক্ত জগতের প্রতীক হিসেবে। ছবির নায়িকা বিমলা সেই সাদা কালোর বিভাজনের সীমারেখার ওপর যেন দাঁড়িয়ে আছেন। এই সীমারেখাই হচ্ছে লক্ষ্মণরেখা, অর্থাৎ বাড়ির প্রধান দরজা, যা অতিক্রম করা একজন সাবেকি হিন্দু মহিলার জন্য ছিল নিষিদ্ধ। *ঘরেবাইরে* ছবির শিরোনামের ওপর অত্যন্ত প্রতীকী ভাবে এক ফালি অগ্নিশিখাকে দেখানো হয়েছে। এই আগুনের লেলিহান শিখা বাড়ির প্রধান দ্বার অতিক্রম করার সামাজিক বিপদের সংকেতকে ইঙ্গিত করছে। পুরো দৃশ্যটাই একটা কঠিন বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একজন সম্ভ্রান্ত নারীর অন্তর ও বাহিরের জগতের সামাজিক সীমাবদ্ধতাকে কঠিন সমালোচনার মুখে ফেলে দিয়েছে।

অতএব, সত্যজিতের পোস্টার শিল্প কেবল মাত্র তাঁর চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনই নয়, পোস্টারের মাধ্যমে সত্যজিৎ তাঁর ছবির কাহিনীর সঠিক অভিব্যক্তি এবং সময়ের সঠিক সংকেতগুলোকে বার বার তুলে ধরেছেন। পোস্টারের মাধ্যমে সূক্ষ্ম ভাবে দর্শকদের কাছে তাঁর ছবির সারাংশকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। সত্যজিতের ছবির উচ্চমানের পোস্টার-পরিকল্পনা শুধু শিল্পের মর্যাদাই পায় নি, তাঁর চলচ্চিত্রকে যথেষ্ট প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছে। দৃষ্টিনন্দন পোস্টারের মাধ্যমে পরিচালক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে দর্শকদের অন্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। ছবির পোস্টার ডিজাইনে তিনি যতই বাস্তববাদী অথবা abstract style ব্যবহার করুন না কেন, তিনি তাঁর বাণিজ্যিক শিল্পভাবনাকে উপেক্ষা করেন নি, বরং নিঃসন্দেহে তাতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিলেন। পোস্টারের বিষয় ছাড়াও তাঁর টাইপোগ্রাফি পোস্টারগুলোতে অত্যন্ত

অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করেছে, যা প্রতিটি ছবির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করা যায়। আমার মনে হয় সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার টাইটেলে ব্যবহৃত অক্ষরগুলোর মধ্যে কোথাও যেন তাঁর একটা নিজস্ব স্টাইল ফুটে উঠেছে, এমনকি অক্ষর গঠনে সত্যজিৎ তাঁর নিজস্ব কিছু anatomyকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর সেই নিজস্ব নীতিমালাকে অনুসরণ করলে টাইপোগ্রাফিকে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবেও শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। স্বল্প পরিধির মধ্যে সেই আলোচনা করা সম্ভব নয়, ভবিষ্যতে কখনও সুযোগ পেলে সত্যজিতের সিনেমার অক্ষরশিল্প নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর সৃজনশীল রচনার মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় যে সত্যকে বার বার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তা হলো বাণিজ্যিক শিল্পকে উপেক্ষা না করেও পাশাপাশি কার্যক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে সফলভাবে পূরণ করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র--

১. রাজেশ দেবরাজ, *The Art of Bollywood,* টাইমলেস বুকস, ২০১০।

২. *Haripura Posters by Nandalal Bose : The Context and the Content* ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে, *Art News and Views* থেকে সংগৃহীত।

৩. Chittaprosad - *A Retrospective 1915-1978*, প্রদর্শনীসমূহ, দিল্লি আর্ট গ্যালারি, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে থেকে সংগৃহীত।

৪. দিনকর কৌশিক, *Those Kala Bhavan Days* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল শান্তি দাস সম্পাদিত *Satyajit Ray - An Intimate Master* গ্রন্থে: অ্যালাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৯৮।

৫. অ্যান্ড্রু রবিনসন, *Design for living*, প্রবন্ধ *Sight and Sound* খন্ডে গ্রন্থিত, ২০১৩।

নন্দলালের তুলিতে নারী ও গ্রামীণ জীবনের ইতিকথা

ইউংমিং ওয়ং

[লেখক ইউংমিং ওয়ং শিল্পকলা বিষয়ক গবেষক, প্রবন্ধকার এবং ব্লগ লেখক। *AstaGuru* নামক একটি ডিজিটাল ওয়ালের স্রষ্টা। অন্বেষা পত্রিকার জন্য প্রেরিত মূল লেখাটি ইংরেজি থেকে লেখকের এবং *AstaGuru*র অনুমতি নিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে। পিতৃসূত্রে লেখক চীনা বংশোদ্ভূত]

নন্দলাল বসুর শিল্পকর্মে নারী চরিত্রের উপস্থিতি এক অন্য মাত্রা সংযোজন করেছে। অসামান্য লাবণ্য ও মর্যাদার সঙ্গে বার বার বহুরূপে চিত্রিত হয়েছেন নারী। নন্দলালের তুলিতে নারী শক্তি সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাঁর অন্যতম এক মর্মস্পর্শী শিল্পকর্ম 'মা' শীর্ষক ছবিটিতে একজন জননীকে তাঁর ঘুমন্ত সন্তানকে কোলে ধরে থাকতে দেখা যাচ্ছে, যা থেকে অপার কোমলতা ও ভালোবাসাই বিচ্ছুরিত হয়। ছবিটির অত্যন্ত ভাবগর্ভ রেখা এবং নিপুণ ছায়া-বিন্যাস মা ও সন্তানের মধ্যে এক গভীর মানসিক বন্ধন ফুটিয়ে তুলেছে; আর এর নেপথ্যে থাকা পর্ণরাজির বিন্যাস তাঁদের পারস্পরিক নৈকট্য ও উষ্ণতার অনুভূতিকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে।

তবে নন্দলালের শিল্পকর্মে নারীর উপস্থাপন কেবল মাতৃত্বের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং গ্রামের অপরিহার্য কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বারবার চিত্রিত করেছেন তিনি। গ্রামীণ জীবনকে সমৃদ্ধ করতে তাদের অবিচ্ছেদ্য ভূমিকার ওপর বার বার সোচ্চার হয়েছেন। তাঁর চিত্রকর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি শুধু নারীদের শারীরিক পরিশ্রমের কাহিনীই তুলে ধরেন নি, বরং গ্রামীণ জীবনের সামাজিক গঠনে তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এ ছাড়া 'কিশোর এবং মহিষ' অথবা 'টিকিট ইন্সপেক্টর'-এর মতো শিল্পকর্মগুলো গ্রামীণ জীবনের এক বিস্তৃত আখ্যানকে তুলে ধরেছে যা এক গ্রাম্য জীবনের পারস্পরিক সুসম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। এই চিত্রকর্মগুলোর সারল্য ও সাবলীলতা এক ধরনের গতি ও প্রাণশক্তির অনুভূতিকে সঞ্চার করে যা গ্রামীণ সমাজের গতিপ্রকৃতি

ও আমাদের উপলব্ধিকে নতুন করে চিনতে সাহায্য করে। এই শিল্পকর্মগুলোতে ব্যক্তি ও তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মাঝে এক মধুর সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, আর এর মাধ্যমেই গ্রামীণ জীবন এবং সেই জীবনে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী নারীদের প্রতি নন্দলালের শ্রদ্ধার্ঘ্য আরও জোরালো হয়ে ওঠে।

নন্দলালের শৈল্পিক দৃষ্টি নিছক অনুকরণের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, একটি সম্প্রদায়ের অন্তরসত্তাকে নিবিড় ভাবে ধারণ করে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বিশাল পটভূমিতে গ্রাম্য নারীর কাহিনিগুলোকে নিপুণভাবে তুলে ধরে। তাঁর প্রাণবন্ত চিত্রায়ণের মধ্যে দিয়ে নারীদের অভিজ্ঞতা, তাদের সংগ্রাম এবং শক্তিকে যেন যথাযথ মর্যাদা দিয়ে চিরস্মরণীয় করে তোলে।

নারী ও গ্রামীণ চালচিত্র নন্দলাল বসুর শিল্পযাত্রায় দুটি কেন্দ্রীয় বিষয়, যা গ্রামীণ ভারতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ এবং তাঁর গ্রামীণ সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিকে প্রসার করার অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে। নারী গ্রামীণ জীবনের স্বাভাবিক ছন্দেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং নন্দলালের কাজে ঘুরে ঘুরে সেই নারী শক্তি এবং নারীর মর্যাদাকেই উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। যে রূপেই নারী চিত্রিত হোন না কেন, সে কৃষক, তাঁতি কিংবা গৃহস্থালি পরিচর্যাকারীই হোন, নন্দলালের আঁকায় নারী সর্বদা শক্তি, সহনশীলতা এবং একই সঙ্গে লাবণ্যেরই দ্যুতি ছড়ায়। নারীর প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর নিবিড় মনোযোগ, গ্রামীণ জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নারীর ভূমিকা এবং সামগ্রিক সমাজ-কাঠামোতে নারীর অবদানের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ বার বার নন্দলালের ছবিতে উঠে এসেছে। নারীকে তিনি যে সরল অথচ গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে চিত্রিত করেছেন, সেটা গ্রামীণ সমাজে নারীর গুরুত্বের প্রতি নন্দলাল বসুর অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধেরই উজ্জ্বল নিদর্শন।

গ্রাম্য কুটির ও জীবনযাত্রার যে চিত্রায়ন নন্দলাল তাঁর কাজে তুলে ধরেছেন, তা গ্রামীণ ভারতের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধকে আরও জোরালো করে। নন্দলাল বার বার বলতেন তাঁর ছবিতে বর্ণিত গ্রাম্য কুটিরগুলো নিছক বাসস্থান নয়, এই কাঠামোগুলো গ্রাম্য সারল্য, আত্মনির্ভরশীলতা এবং মাটির সঙ্গে এক আধ্যাত্মিক বন্ধনের প্রতীক। দেশজ মাটির রঙের ব্যবহার, সাবলীল রেখা এবং শৈল্পিক রূপবিন্যাসের মাধ্যমে নন্দলাল গ্রামীণ ভূদৃশ্যকে কেন্দ্র করে এক আকর্ষক চিত্র সংকলনের উদ্ভব ঘটিয়েছেন, যেখানে বিরাজ করছে এক অপূর্ব সামঞ্জস্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এই

কুটিরগুলোকে প্রায়শই এক বৃহত্তর ও পরস্পর-সংযুক্ত পরিবারের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। সেটি এমনই এক জগৎ, যেখানে প্রকৃতি, মানুষ এবং স্থাপত্য একে অপরের সঙ্গে এক অপরূপ ভারসাম্য বজায় রেখেছে। গ্রাম্য জীবনের সারল্য ও গভীর সাংস্কৃতিক বন্ধনের ওপর নন্দলালের এই বিশেষ গুরুত্ব যেন দ্রুত ঘটে চলা নগরায়ন ও পশ্চিমি সংস্কৃতির প্রভাবের বিরুদ্ধে তাঁর সচেতন ও সুচিন্তিত প্রতিবাদ।

এই চিত্রকর্মগুলোর মধ্যে দিয়ে নন্দলাল বসু গ্রাম বাংলার সাংস্কৃতিক গরিমা ও ঐক্যের এক বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। সেই নারী ও গ্রামীণ জীবনকে বরাবর তিনি ভারতের ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গণ্য করতেন এবং তাঁর ছবির মাধ্যমে সেই গরিমাকে তিনি উদ্‌যাপন করেছিলেন। নারী ও গ্রামীণ জীবনের তাঁর চিত্রণ শুধুমাত্র শৈল্পিক বিকাশই ছিল না, বরং এটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক অভিব্যক্তিও। সাধারণ গ্রামীণ মানুষ এবং তাদের প্রথাগত জীবনযাত্রার মর্যাদাকে তুলে ধরে নন্দলাল সমগ্র জাতিকে তাদের মূল উৎসর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি এমন এক ভারতের স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলেন, যা হবে আত্মনির্ভরশীল এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এমন এক ক্রান্তিকাল, যখন দেশের সকল মানুষের কাম্য একটাই আর সেটা হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা; সময় এসেছে নিজেদের জাতীয় সত্তাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার। ঠিক সেই মুহূর্তেই নন্দলাল তাঁর শিল্পের মাধ্যমে এই মূল্যবোধকে জাগ্রত করার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

"বিনোদবিহারীর শিল্প ভাবনার মধ্যে কোথাও যেন expressionismএর একটা ছোঁয়া আছে..."

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের শিল্প চিন্তা নিয়ে গঠনমূলক বিশ্লেষণ করেছেন

অধ্যাপক রমণ শিব কুমার

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছবি

যাত্রা
paper cut ১৯৫৯
ছবি সৌজন্যে: আর শিব কুমার

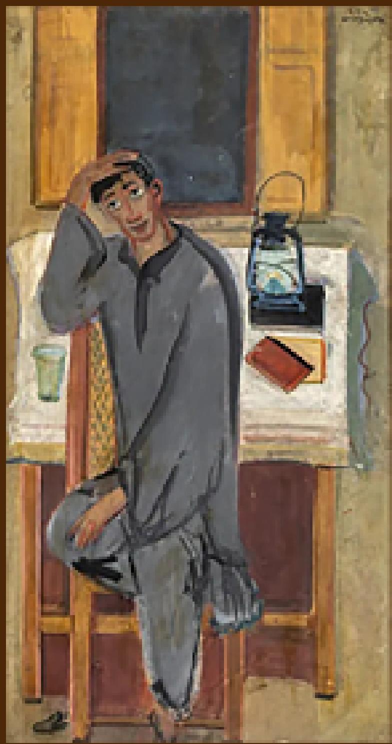

দর্পণ হাতে মানুষ — আত্মপ্রতিকৃতি
১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে আঁকা।

রাস্তাঘাটে একটি গাছের নিচে কয়েকটি অবয়ব — ১৯৪৩ - জল রং

প্রস্ফুটিত ভাঁট্রিল, ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি
কাগজ ও কালি

সৌজন্যে Mrinalini Mukherjee Foundation

নিঃসঙ্গতা শুরু থেকেই বিনোদবিহারীর জীবনে এক গভীর ছায়া ফেলেছিল

[*অধ্যাপক রমণ শিব কুমার একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বর্ষীয়ান ভারতীয় শিল্প ইতিহাসবিদ, শিল্প সমালোচক এবং art curator। তাঁর প্রধান গবেষণার বিষয় আদি ভারতীয় আধুনিকতাবাদ এবং শান্তিনিকেতনের শিল্প ঘরানা। বহু গবেষণামূলক গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক শিব কুমার শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী এবং কলাভবনের অধ্যাপক ছিলেন। ২০১০ সালে কেরালার ললিত কলা আকাদেমি তাঁকে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার জন্য কেশরী পুরস্কারে ভূষিত করেছে। ২০১৩ সালে রামকিঙ্কর বেজ গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মনোজমোহন স্মারক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০১৩ সালে শিল্পক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সম্মাননা ফলক পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ওপর গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালে Tagore Research Institute কর্তৃক 'রবীন্দ্র-তত্ত্বাচার্য' উপাধি পেয়েছেন। অধ্যাপক শিব কুমার Santiniketan: The Making of a Contextual Modernism, Benodebehari: A Centenary Retrospective এবং The Last Harvest: Paintings of Rabindranath Tagore-এর মতো জনপ্রিয় প্রদর্শনী পরিচালনার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, কে.জি. সুব্রামনিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় শিল্পীদের প্রদর্শনীর পরিচালনা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সিঙ্গাপুর আর্ট মিউজিয়ামের জন্য Tryst with Destiny শিরোনামে একটি প্রদর্শনীর পরিচালক ছিলেন।*]

অন্বেষা ঃ আর্নেস্ট হ্যাভেল, ভগিনী নিবেদিতা, স্যার জন উডরফ এবং অন্যান্য ভারত-অনুরাগীদের আদর্শে প্রভাবিত হয়ে এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের স্রোতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অবনীন্দ্রনাথের অন্তরে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে সোচ্চার হন। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন শিক্ষকের প্রধান

কর্তব্য তাঁর ছাত্রদের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ সুনিশ্চিত করা এবং স্বাধীন ভাবে তাদের সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া। অবনীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসের প্রভাব পড়েছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র নন্দলাল বসুর কর্মজীবনে। সম্ভবত সেই কারণেই নন্দলাল বসু, যিনি ছিলেন তথাকথিত 'বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট' এবং revivalismএর অন্যতম প্রধান প্রবক্তা, শান্তিনিকেতনে এসে বীরভূমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজস্ব শিল্পশৈলী ছাড়াও সমসাময়িক ভারতীয় শৈলীর প্রচার ও প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে, নন্দলালের ছাত্র বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্কর কলাভবনে modernism বা আধুনিক শিল্পশৈলীর এক নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন। সেই কথা মাথায় রেখে আপনি কি শান্তিনিকেতনকে শুধুমাত্র একটা শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখার পরিবর্তে neo modernism শিল্প আন্দোলনের উপকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করতে চাইছেন?

রমণ ঃ হ্যাঁ, শান্তিনিকেতন ছিল ভারতীয় শিল্পকলার এক নতুন আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু-আর দশটা সাধারণ আর্ট কলেজের মতো নয়। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যে 'বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট' শিল্প আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, শান্তিনিকেতন আর্ট কলেজের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিসমাপ্তি হয়। আপনি ঠিকই বলেছেন, একজন শিক্ষক হিসেবে নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের সেই বিশ্বাসের প্রতি অত্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন। শিল্পীর ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন নন্দলাল আর এরই ফলে কলাভবনের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিল্পচর্চায় বিচিত্র শিল্পশৈলীর বিকাশ ঘটেছিল। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে নন্দলালের শিক্ষা প্রণালীর বিপুল পরিবর্তন ঘটেছিল। সমাজ গঠনে শিল্পের ভূমিকা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি নন্দলালের শিক্ষাকার্যক্রমের গতিপথকে এক নতুন দিকে চালনা করে যা কিনা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পশিক্ষণ পদ্ধতি থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র।

ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের সাংস্কৃতিক অতীত সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েও এবং সেই অতীত নিয়ে গর্ববোধ করলেও, এমনকি ভারতীয় হিসেবে সেটাই যে অনিবার্য তা স্বীকার করে নিয়েও; রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ইতিহাসের সরণি বেয়ে অতীতের আবেগে চালিত হওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কবি

চেয়েছিলেন, ভারতীয় শিল্পীরা প্রকৃতির সৌন্দর্যে সাড়া দিয়ে এক মনোরম সামাজিক পরিবেশের মধ্যে তাদের জীবন অতিবাহিত করুক। অর্থাৎ, শুধু অতীতের গৌরব নয়, বর্তমানের প্রয়োজনের ডাকেই যেন তারা সাড়া দেয়। সুন্দর প্রকৃতি ও সুস্থ সমাজের অভিজ্ঞতা প্রতিটি সৃজনশীল মানুষের জন্যই হিতকর। গ্রামীণ বাংলার ভূপ্রকৃতি ও সেখানকার কৃষকদের জীবনযাত্রার সংস্পর্শে আসার পর কবি হিসেবে এটাই ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস।

তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের জাপান সফর তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল যে, শিল্পকে শুধুমাত্র স্টুডিও বা প্রদর্শনী কক্ষের গণ্ডিতেই আবদ্ধ রাখা যায় না; বরং শিল্প দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং একজন মানুষের সংবেদনশীলতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত এবং রূপায়িত করতে পারে। তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পীরাও যেন সেই পথই অনুসরণ করে, রবীন্দ্রনাথের 'কলাভবন'-এর প্রতিষ্ঠা ছিল সেই প্রচেষ্টারই একটা অংশ। তিনি চেয়েছিলেন এখানকার শিল্পীরা প্রকৃতির উপাসনা করুক, বৃহৎ পরিসরে কাজ করুক, শিল্পকর্মকে সর্বসাধারণের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলুক, শিল্পীর শিল্পকে জনসাধারণের কাছে মেলে ধরুক, দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর নকশা প্রণয়ন করুক এবং সামগ্রিক জনজীবনে, সামাজিক উৎসবে, অনুষ্ঠানে ও নাট্যকলায় সক্রিয় অবদান রাখুক। অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে থাকা এক গুচ্ছ শিল্পীদের মধ্যে নন্দলালই একমাত্র কবির এই ভাবধারায় সাড়া দিয়েছিলেন; আর ঠিক এই কারণেই শান্তিনিকেতনের এই শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য নন্দলালকেই বেছে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নন্দলালই কবির ভাবধারাকে নিষ্ঠাভরে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে যে শিল্প-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সেই আন্দোলন মূলত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টারই এক সার্থক রূপান্তর হিসেবে গণ্য করা উচিত।

অন্বেষা ঃ শান্তিনিকেতন শিল্প আন্দোলনই কি আপনাকে 'Contextual Modernism' বা 'প্রাসঙ্গিক আধুনিকতাবাদ' conceptএর রূপায়ণে উদ্বুদ্ধ করেছিল ? Contextual Modernism মতবাদের জনক আপনি, এই উপলব্ধির মাধ্যমে আপনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন ?

রমণ ঃ সাম্প্রতিক কালে আধুনিক শিল্পকলা নিয়ে যারা চর্চা করেন তাদের মধ্যে অধিকাংশ লেখক ও গবেষক - যাদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয়, বিশ্বাস করেন যে আধুনিকতাবাদ বা modernism এমন একটা সার্বজনীন শিল্পভাবনা যার উৎপত্তি পশ্চিমের দেশগুলোতে এবং তারপর নির্বিবাদে সেই শিল্পভাবনা পাশ্চাত্য-বহির্ভূত বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর ফলে লেখক গবেষকদের ধারণা হয়েছে, পাশ্চাত্য-বহির্ভূত বিশ্বে modernismএর কোনও মৌলিক চিন্তা-ভাবনা ছিল না বরং modernism পশ্চিমি দেশের অন্ধ শিল্প-অনুকরণ। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। এখানে একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পকলা আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্পর্ক বা cross-cultural contactsএর চূড়ান্ত পরিণাম এবং এশিয়া, আফ্রিকা, ওশেনিয়া ও প্রাচীন আমেরিকার শিল্পকলার প্রভাবে রূপায়িত হয়েছিল। পাশ্চাত্যের আধুনিকতাবাদ বা modernism যেসব দেশে প্রসার লাভ করেছিল, সেসব দেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভিত্তি বা পটভূমিকে কখনও মুছে ফেলতেও পারেনি, এমনকি গ্রাস করতেও পারে নি। এটা অনেকটা মূল কাঠামোর ওপর একটা নতুন প্রলেপ দেওয়ার মতো। পরবর্তীকালে সেই অন্তর্নিহিত মূল কাঠামোর উপাদানগুলো যেন নতুন প্রলেপের রূপান্তর ঘটিয়েছে। শান্তিনিকেতনের আধুনিক শিল্পচর্চা এই রূপান্তরের একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের প্রাক-আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে যথেষ্ট স্বচ্ছ ধারণা ছিল; তাঁরা সেই উপলব্ধিকে কখনই মুছে ফেলতে চান নি, বরং সমাজের সমষ্টিগত চাহিদা এবং নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভবশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাপানি, চীনা এবং আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পকলা থেকে বিভিন্ন উপাদানকে সুচিন্তিতভাবে আত্মস্থ করে এক নতুন শিল্পরীতির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। ইউরোপীয় modern art বা আধুনিক শিল্পকলা যেমন একটি নির্দিষ্ট স্থান, কাল ও প্রেক্ষাপটের ফসল, ঠিক সেরকমই শান্তিনিকেতনের এই শিল্পচর্চাও ছিল সমকালীন অভিজ্ঞতা, জাতির প্রয়োজনীয়তা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের এক সার্থক গুণফল। এই প্রসঙ্গে Contextual Modernism বা ‘প্রাসঙ্গিক আধুনিকতাবাদ’ বলতে আমি সেটাই বোঝাতে চেয়েছি।

অন্বেষা ঃ বিনোদবিহারীর চিত্রকলায় উজ্জ্বল রঙের উচ্ছ্বাস খুব একটা চোখে পড়ে না। সম্ভবত দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণেই উজ্জ্বল রঙের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল কম। তাঁর সারা জীবনের চিত্রকলার দিকে তাকালে সহজেই বলা যায় যে, তিনি রঙের শিল্পীর চেয়ে রেখা ও আকৃতির শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। রঙের চোখ-ধাঁধানো মোহকে এড়িয়ে গিয়ে বিনোদবিহারীর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল monochromatic অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম বর্ণের ছবির জগৎ। এর কারণ কি তাঁর দুর্বল দৃষ্টিশক্তি, নাকি এটাই ছিল তাঁর নিজস্ব স্টাইল? আপনি কী মনে করেন?

রমণ ঃ এই প্রশ্নের কোনও সহজ উত্তর হয় না। বিনোদবাবুর প্রথম জীবনের কিছু কাজের দিকে যদি দৃষ্টি ফেরাই, তাহলে বেশ কিছু উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার আমাদের নজরে পড়বে। যেমন ধরুন তাঁর আঁকা Laughter। এমনকি তাঁর দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হওয়ার পর তিনি যে 'পেপার কাট' বা কাগজের নকশাগুলো তৈরি করেছিলেন, সেগুলোও ছিল অত্যন্ত বর্ণময় এবং সেই কাগজগুলোকে প্রায়ই ফরাসি শিল্পী অঁরি মাতিসের কাজের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এমন অনেক শিল্পীই আছেন যাঁরা তাঁদের কাজের কোনও কোনও নির্দিষ্ট পর্যায়ে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারকে সচেতনভাবে বর্জন করেছেন। যেমন ধরুন পাবলো পিকাসো। শিল্পী-জীবনে cubism পর্বে পিকাসো উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারকে অনেকটাই এড়িয়ে গেছেন। আবার পরবর্তী পর্যায়ে পিকাসো বহু বর্ণের উচ্ছ্বাসকে সাদরে ফিরিয়ে এনেছেন।

বিনোদবিহারীর ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি হয়তো তাঁকে স্পর্শ ও আকারের মাধ্যমে জগতকে অন্বেষণ করতে কিছুটা হলেও আগ্রহী করে তুলেছিল; আর হয়তো সেই কারণেই তিনি রঙের চেয়ে রেখা ও রূপকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে এ ধরনের প্রাধান্য যে শুধুমাত্র জৈবিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণেই নির্ধারিত হবে এমন তো কোনও কথা নেই; বরং অনেক ক্ষেত্রে উল্টোটাই হতে দেখা গেছে। একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন শিল্পী তার নিজস্ব ভালোলাগার শিল্পরুচির অভিমতে এবং নিজস্ব বিচারবুদ্ধিতে এমন চিত্রশৈলী পছন্দ করতেই পারেন। বিনোদবিহারীর শিক্ষক স্বয়ং নন্দলাল ছিলেন এমনই একজন শিল্পী। সুতরাং বিনোদবিহারীর এই

পছন্দকে এমনই একটা শৈল্পিক পছন্দের অংশ হিসেবে গণ্য করা যেতেই পারে, যার সঙ্গে সর্বদা তিনি নিজেকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। বিনোদবিহারীর ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্ভবত ছিল শারীরিক প্রতিবন্ধকতার এবং নিজস্ব সৌন্দর্যবোধের সম্মিলিত রূপ; যদিও রেখার প্রতি তাঁর ভালবাসা মাস্টারমশাই নন্দলালের পছন্দের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তবুও বলবো তাঁদের উভয়ের শৈলী ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নধর্মী।

অন্বেষা ঃ আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক; অস্ট্রিয়-মার্কিন শিল্পী স্টেলা ক্রামরিশ একবার একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শুনিয়েছেন, 'রবীন্দ্রনাথের ছবির সেই রহস্যময় উপাদানটি এমিল নোল্ডের (Emil Nolde) ছবির সঙ্গে তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের কাজের মধ্যে বিশেষত expressionismএর এমন একটি ছায়া বিদ্যমান, যা নোল্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই বার বার ফুটিয়ে তোলে।' রবীন্দ্রনাথের শিল্পশৈলী প্রায়ই আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীদের, বিশেষ করে জার্মান expressionist শিল্পীদের শিল্পকর্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়; এর মূল কারণ হচ্ছে, বাইরের বাস্তবতাকে ভেদ করে অন্তরের সত্যকে উন্মোচন করার শৈলী উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। তবে বিনোদবিহারী বিশ্বাস করতেন যে, রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে ইউরোপীয় শিল্পীদের expressionismএর প্রথম দর্শনে যতই সাদৃশ্য থাকুক না কেন উভয়ের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য সর্বদা লক্ষ করা যায়। এ বিষয়ে আপনার নিজস্ব উপলব্ধি কি?

রমণ ঃ আমার বিশ্বাস, এই বিষয়ে বিনোদবিহারীই সঠিক বলেছিলেন। যদিও আমাদের শিল্পকলার বিভিন্ন গুণাবলী নিয়ে চর্চা এবং বিধিসম্মত পাঠক্রমে একধরনের অর্থ বহন করে, তবুও কিছু কিছু ছবির বাইরের সাদৃশ্য অনেক সময় বিভ্রান্তিকর হতে পারে। ছবির বাইরের আকৃতি দেখে অনেক সময় তার অন্তর্নিহিত অর্থকে অনুধাবন করা যায় না। আসলে এডভার্ড মাঞ্চ বা এমিল নোলডের মতো expressionist শিল্পীরা ছিলেন নিচীয়ান (Nietzschean) যুগ পরবর্তী এক ঈশ্বরহীন জগতের উদ্বেগ পীড়িত বাসিন্দা; রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তেমনটা ছিলেন না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চারপাশের জগতে ঘটে চলা নানা অপ্রীতিকর ঘটনা তাঁকে কখনও কখনও বিচলিত করতো না

যে তা নয়, কারণ এই ধরনের প্রতিফলন বার বার ফুটে উঠেছে তাঁর 'সভ্যতার সংকট' রচনায়। কিন্তু তিনি কখনই আশা হারাননি। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চেতনা ছিল ভিন্ন। তাঁর কাছে ঈশ্বর ছিলেন এক জীবন্ত ও নিত্য-উপস্থিত সত্তা। সেই সত্তা আর যাই হোক, কোনও পশ্চিমি expressionistদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না। তাঁর শিল্পকলায় বেদনা বা যন্ত্রণা হলো অনেকটা ক্ষণস্থায়ী মেঘের ছায়ার মতো, জীবনের কোনও স্থায়ী অবস্থান নয়। বিনোদবিহারী তাঁর জীবনে এই সত্যটা গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন; আর ঠিক সেই কারণেই তিনি স্টেলা ক্রামরিশের মতের সঙ্গে এক হতে পারেন নি।

অন্বেষা ঃ শিল্প রসিকরা অনেক সময়ই বলে থাকেন যে বিনোদবিহারীর রঙের প্যালেটটা ছিল মূলত হলুদ গেরুয়া, পোড়ামাটি লাল এবং Terre verte সবুজ রঙে পূর্ণ। বিনোদবিহারীর কাজে এই সব বিচিত্র বর্ণের সমাহার অনেক সময় জার্মান শিল্পী ওটো মুলাহ'র কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুই শিল্পীর কাজে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। এতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ বিনোদবিহারীর মতো মুলাহ ছিলেন মূলত রেখা ও আকৃতির একজন দক্ষ শিল্পী। এ'ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় জার্মান expressionist। বিনোদবিহারীর শিল্পকর্মে আপনি কি কখনও expressionismএর ছোঁয়া খুঁজে পেয়েছেন?

রমণ ঃ হ্যাঁ, কথাটা খুব ভুল নয়। বিনোদবিহারীর শিল্প ভাবনার মধ্যে কোথাও যেন expressionismএর একটা ছোঁয়া আছে, বিশেষ করে গোড়ার দিকের কিছু চিত্রকর্মে এবং সর্বোপরি, তাঁর কাঠখোদাইয়ের কাজগুলোতে। শারীরিক অসুস্থতা এবং দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন একাকী স্বভাবের মানুষ। মনে হয় এই নিঃসঙ্গতা শুরু থেকেই তাঁর জীবনে এক গভীর ছায়া ফেলেছে, যার পরিণতি তাঁর ভাবুক এবং অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু কলাভবনে এসে তিনি খুঁজে পেয়েছেন অভিন্ন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমমনা একদল সহযাত্রীদের। আর এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে গড়ে তুলেছে একজন অত্যন্ত ধীরস্থির ও মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন একরোখা পুরুষ হিসেবে। এর ফলে জীবনের শুরু থেকেই তাঁর expressionism মনের স্থিরতার কাছে নতি স্বীকার করে গভীর মানসিক প্রশান্তিকে স্থান করে দিয়েছে। তিনি হয়ে উঠেছেন একজন

মননশীল শিল্পী, যিনি পরবর্তী জীবনে আরও বড় ঝঞ্ঝাকেও সাফল্যের সঙ্গে জয় করেছেন।

তবে বিনোদবিহারীর রঙের প্যালেটের সঙ্গে expressionismএর যে খুব একটা সম্পর্ক আছে তা কিন্তু নয়। বস্তুত, তাঁর গোড়ার দিকের যেসব চিত্রকর্মে expressionismএর সামান্য হলেও ছোঁয়া আছে, সেগুলোতে তিনি এমন রঙের ব্যবহারই করেননি। আর তাঁর woodcuts, যা কিনা তাঁর expressionismএর সর্বাধিক নিদর্শন, সেগুলো তো ছিল সম্পূর্ণই সাদাকালো! তাছাড়া গেরুয়া 'ইন্ডিয়ান রেড' এবং Terre verte সবুজ - এই সব রঙের বিন্যাস শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ শিল্পীর মধ্যেই তো বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। এর মূল কারণ ছিল, বিদেশ থেকে আমদানি করা জলরঙের পরিবর্তে তাঁরা দেশজ মাটির রঙের ওপরই অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। এই ধরনের রঙের ব্যবহারের পেছনে এক প্রকার জাতীয়তাবাদী এবং অর্থনৈতিক দিকও সক্রিয় ছিল। তাছাড়া শান্তিনিকেতনের আরও অনেক শিল্পীই বিনোদবিহারীর তুলনায় এই সব রঙের ব্যবহার আরও বেশি করে করেছেন। তারাও কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে সেই রঙগুলোকে ব্যবহার করেছেন।

অন্বেষা ঃ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বপর্যটক। বাইরের জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ। সম্ভবত তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয়, যাঁর ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক শিল্পকলার সমস্ত রীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল। অন্যদিকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় - অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন ঘরমুখী। তাঁরা বইয়ের মাধ্যমেই জগৎকে চিনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই ভ্রাতুষ্পুত্রদের তিরস্কার করে বলতেন, 'দক্ষিণের বারান্দার গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসো এবং দেখো বিশ্বজগতে কী ঘটছে'। প্রথাগত রক্ষণশীলতায় বিশ্বাসী ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। ১৯২১ সালে স্টেলা ক্রামরিশকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ; উদ্দেশ্য ছিল তাঁর শিক্ষার্থীদের পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পকলা সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরী করা। স্টেলা ক্রামরিশের পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন বিনোদবিহারী, যিনি স্টেলা ক্রামরিশের পাঠক্রমের চমৎকার অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ

করে গেছেন। একই ভাবে চলে আসে ফরাসি post-impressionist চিত্রশিল্পী আঁদ্রে কার্পেলসের কথা। কার্পেলস ১৯২০র দশকের শুরুর দিকে শান্তিনিকেতনে কিছুদিন শিক্ষা প্রদান করে গেছেন। তিনিও বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্করের মতো প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান কলাভবনে অনুসৃত অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল শিল্পনীতির মধ্যে কী কোনও সূক্ষ্ম অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান ছিল?

রমণ ঃ এ কথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ যতটা পাশ্চাত্য শিল্পের প্রতি উদার ছিলেন, নন্দলাল ততটা ছিলেন না; কিন্তু শুধুমাত্রই সেই কারণেই নন্দলালকে রক্ষণশীল বলা চলে না। একজন গান্ধী অনুগামী জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি হিসেবে তিনি দেশীয় উপকরণ ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছিলেন। সাধারণভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ কিছুটা হয়তো কমই ছিল। এটা ছিল নন্দলালের anti-colonial মনোভাবেরই একটা অংশ। তাছাড়া আমাদের দেশে দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করার পেছনে তাঁর যথেষ্ট যুক্তি ছিল কারণ আমদানি করা বিদেশি শিল্পসামগ্রী ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সহজলভ্য নয়। তবে 'ভারতীয়' বলে তিনি নিজেকে কোনও গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ রাখেননি। উল্টে তিনি ভারতীয়, এশীয় এবং রেনেসাঁ-পূর্ববর্তী বিভিন্ন শিল্পশৈলীর প্রতি গভীর ভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁর ছাত্রদের কাছে সেগুলোকে অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে প্রচলন করতেন। তাঁর সমসাময়িক যে কোনও শিল্পীর তুলনায় নন্দলাল অনেক বেশি উদারপন্থী ছিলেন, এমনকি গুরু অবনীন্দ্রনাথের থেকেও বেশি। নন্দলালের এই প্রয়াস তাঁর ছাত্রদের মধ্যে শিল্পের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছিল এবং সেই ছাত্রদের মধ্যে বিনোদবিহারীও ছিলেন। অবশ্য এটাও ঠিক, নন্দলাল তাঁর ছাত্রদের পাশ্চাত্য রীতি মেনে শিল্পচর্চাকে সরাসরি উৎসাহও দেন নি, অপরদিকে তাদের কখনও নিজেদের উদ্যোগে পাশ্চাত্য রীতি মেনে শিল্পচর্চা করার থেকে বাধাও দেননি। নন্দলালের প্রিয় ছাত্র রামকিঙ্কর এর সব থেকে বড় উদাহরণ। এমনকি দেশ স্বাধীনতার পর নন্দলাল তাঁর প্রথম জীবনে জাতীয়তাবাদী মননের কারণে পাশ্চাত্যশিল্পের বিপক্ষে তাঁর প্রাথমিক

অবস্থানের জন্য আক্ষেপও করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল - উভয়েই স্বতন্ত্র ভাবে, তাঁদের মনের দিক থেকে এবং নিজস্ব ভঙ্গিতে অন্যান্য সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট উন্মুক্ত ছিলেন।

অন্বেষা ঃ রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্ম প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশি conceptual বা নিজস্ব চিন্তা-ধারণাভিত্তিক। অনেক শিল্পরসিক রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের কিছু angular বা কৌণিক ধাঁচের আর্ট স্টাইলকে অঁরি মাতিসের 'কিউবিজম'-এর সঙ্গে তুলনা করেন। আবার কেউ কেউ বিনোদবিহারীর রেখা ও আকৃতি-ভিত্তিক শিল্পকর্মের মধ্যে মাতিসের conceptual শিল্পের সাদৃশ্য খুঁজে পান। কিন্তু মাতিসের ছবিতে বর্ণের বাহার ছিল প্রধান, যেই কারণে মাতিসকে বর্ণময় Fauvism এর অনুসারী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। অথচ বিনোদবিহারী অথবা রবীন্দ্রনাথের কাজে Fauvist শিল্পীদের মতো অতো বর্ণের ঝলক পাওয়া যায় না। তাহলে এই ধারণার কারণ কী?

রমণ ঃ এ কথা সত্যি যে রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি ছবির সঙ্গে মাতিসের কিউবিজমের সাদৃশ্য রয়েছে। আমি আগেও বলেছি, এই ধরনের তুলনা করাটা অনেক ক্ষেত্রেই অনাবশ্যক। অধিকাংশ সংবেদনশীল শিল্পীই নিজস্ব শৈলী বা পথ বেছে নেওয়ার আগে অতীত ও বর্তমানের শিল্পচর্চার নানা দিক নিয়ে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন। আবার রবীন্দ্রনাথের মতো কোনও কোনও ব্যক্তিত্ব একই সঙ্গে লেখক ও শিল্পী হিসেবে একাধিক লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হন। রবীন্দ্রনাথ কোনও তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যান নি। একজন স্বশিক্ষিত চিত্রশিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ একটা কোনও নির্দিষ্ট শিল্পপদ্ধতিকে নিখুঁত ভাবে অনুসরণ করেননি; বরং নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি হাতের কাছে যে মাধ্যম বা উপায়টাকে সহজলভ্য মনে করেছেন, সেটাকেই উদারভাবে ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও বিনোদবিহারী - উভয় থেকেই অনেকটাই স্বতন্ত্র ছিলেন; তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পিকাসোর মতো একজন অত্যন্ত দক্ষ ও কুশলী শিল্পীও বিভিন্ন শৈলীতে ছবি এঁকেছেন। এখানে পিকাসো সবথেকে বড় দৃষ্টান্ত। একজন শিল্পী তাঁর চিন্তা ভাবনার বৈচিত্র্য বা আবেগের গভীরতাকে প্রকাশ করতে নানা ধরনের

মাধ্যম বা উপায়কে অবলম্বন করেন, তার মূলে হয়তো রয়েছে সেই শিল্পীর ভাবনার বৈচিত্র। এটাকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের অভাব বললে ঠিক হবে না।

একইভাবে গত শতাব্দীর প্রথম দিকে বেশ কিছু সমালোচক শিল্পকে conceptual এবং perceptual - এই দুই ভাগে ভাগ করে আরও বেশি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। তাদের মতে রেনেসাঁ-পরবর্তী চিত্রকলার ধাঁচে আঁকা সমস্ত ছবিই ছিল উপলব্ধিমূলক বা perceptual। অন্যদিকে এর থেকে আলাদা স্টাইলে যা কিছু ছবিই আঁকা হয়েছে, তার সব কিছুই conceptual। সেই সূত্রে মাতিস বা কিউবিস্ট শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং অধিকাংশ পশ্চিমি দেশগুলোর বাইরে যা কিছু ছবি আঁকা হয়েছে, প্রায় সবটাই ছিল conceptual। কিন্তু এই ধারণাটাকে একটু বেশি মাত্রায় সরলীকরণ করা হয়েছে। ওনারা যা কিছুকে conceptual বলতে চেয়েছেন, বাস্তবে তার অনেকটাই perceptual অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে; শুধু তাদের রীতিগুলো বাস্তবসম্মত রীতি থেকে ভিন্ন ছিল। আসলে conceptual art অপেক্ষাকৃত ভাবে একটা আধুনিক অভিজ্ঞতা মাত্র এবং সেই শিল্পে ছবির চাইতে ‘ধারণা’ বা ‘concept’এর প্রাধান্যটাই ছিল বেশি।

অন্বেষা ঃ ১৯৩৭-৩৮ সালে বিনোদবিহারী জাপানে বেশ কয়েক মাস কাটিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি আরাই কাম্পোর মতো বিখ্যাত শিল্পীদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। আরাই কাম্পো এর আগে একসময় রবীন্দ্রনাথের ডাকে শান্তিনিকেতনেও এসেছিলেন। জাপান থেকে ফিরে বিনোদবিহারী ছাত্রাবাসের বারান্দার ছাদের ওপর তাঁর বিখ্যাত ফ্রেস্কো আঁকা শুরু করেন। আরাই কাম্পো অজন্তা শিল্পশৈলীর সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। আপনার কি মনে হয় যে, আরাই কাম্পো বিনোদবিহারীর শিল্পীসত্তাকে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন? বিশেষ করে কালি-কলমের কাজে কিংবা scroll অথবা ম্যুরাল আঁকার ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন এনেছিলেন? বিষয়টি নিয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা করবেন?

রমণ ঃ হ্যাঁ, ১৯৩৬ সালের শেষভাগ থেকে ১৯৩৭ সালের শুরুর সময় পর্যন্ত বিনোদবিহারী জাপানে ছিলেন এবং সেখানেই তিনি আরাই কাম্পোর সঙ্গে

সাক্ষাৎও করেছিলেন। তবে জাপানি ও চীনা ink-painting বা ক্যালিগ্রাফি চিত্রকলার প্রতি তাঁর আগ্রহ জাপান সফরের অনেক আগে থেকেই ছিল। সেটার সূত্রপাত ঘটেছিল ছাত্রাবস্থায় কলা ভবনের সংগ্রহশালায় রাখা পঞ্চদশ শতাব্দীর জাপানি শিল্পী সেশু তোয়োর আঁকা একটি 'হ্যান্ডস্ক্রল' বা হাতে আঁকা চিত্রপটের অনুলিপি দেখে। ১৯২০র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই তিনি স্থানীয় ল্যান্ডস্কেপের আদলে হ্যান্ডস্ক্রল আঁকা শুরু করেন। পূর্ব এশীয় ink paintingএর প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগই তাঁকে জাপান ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করে। বিনোদবিহারীর জাপানি স্টাইলে ছবি আঁকার পদ্ধতির ওপর খুব যে আগ্রহ ছিল, তা অবশ্য নয়। বরং তাঁর আগ্রহের মূল বিষয় ছিল জাপানি ink paintingএর স্বতন্ত্র গুণকে আত্মস্থ করা যা ক্যালিগ্রাফি বা লিখনরেখার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং জাপানের নিজস্ব স্টাইলের ছবি আঁকাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তিনি জাপানে গিয়েছিলেন জাপানি ছবি আঁকার পদ্ধতি রপ্ত করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং মূল জাপানি শিল্পকর্মগুলো স্বচক্ষে দেখার এবং জাপানি শিল্পী ও গবেষকদের সঙ্গে শিল্পভাবনা নিয়ে নিজস্ব মত বিনিময় করা - এটাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

জাপান থেকে ফিরে দু'বছর পরই বিনোদবিহারী কলাভবনের হোস্টেলের সিলিংয়ে যে ম্যুরালটি এঁকেছিলেন সেটা একজন ল্যান্ডস্কেপ শিল্পী হিসেবে তাঁর শিল্পীজীবনের এক চরম উৎকর্ষের নিদর্শন; একই সঙ্গে, পূর্ব এশীয় ink-painting জাপান থেকে নিপুণ ভাবে রপ্ত করে এসে তিনি যে নিজস্ব একটা অভিনব শিল্পশৈলী গড়ে তুলেছিলেন, কলাভবনের ছাত্রাবাসে সেই ম্যুরাল তারই এক সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।

অন্বেষা ঃ বিনোদবিহারী জাপানি ও চীনা শিল্পকৌশল, বিশেষ করে ক্যালিগ্রাফি প্রত্যক্ষ করে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। জাপান সফর শেষে বিনোদবিহারী শান্তিনিকেতনে ক্যালিগ্রাফি এবং সেই সঙ্গে বইয়ের অলঙ্করণ বা illustration শিল্পের ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন। অবশ্য বইয়ের অলংকরণের বিষয়টা শান্তিনিকেতনে নতুন কিছু নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের ইলাস্ট্রেশনের জন্য গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের মতো বরেণ্য

শিল্পীদের অসাধারণ কাজ আমরা আগেই দেখেছি। সত্যজিৎ রায় স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, তিনি বিনোদবিহারীর কাছ থেকেই ক্যালিগ্রাফি শিল্পটা শিখেছিলেন। আপনি কি বিনোদবিহারীর ক্যালিগ্রাফি শিল্প এবং শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের মধ্যে এই শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের সংক্ষেপে আলোকপাত করবেন?

রমণ ঃ আমার মনে হয় এখানে সত্যজিৎ রায় শুধুমাত্র তাঁর বইয়ের অলংকরণের কথাই বলছেন না, বাংলা ক্যালিগ্রাফির নকশাকে প্রয়োগ করে তাঁর আঁকা চমৎকার সব প্রচ্ছদের কথাও উল্লেখ করেছেন। সেই সময়ে ক্যালিগ্রাফি বা বইয়ের অলংকরণ নিয়ে খুব একটা চর্চা হতো না। তাছাড়া একজন designer ও typographer হিসেবে সত্যজিতের কাছে এগুলো নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় ছিল। তবে ক্যালিগ্রাফির প্রতি বিনোদবিহারীর আগ্রহ শুধুমাত্র তাঁর আঁকা কয়েকখানি বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রচ্ছদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, রবীন্দ্রনাথ রচিত বেশ কিছু কবিতার সংকলনের নকশাও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর বিনোদবিহারীর সৃষ্ট এই নকশাগুলো আমাদের জাপানি শিল্পী হোনামি কোয়েৎসু-র বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফি নকশার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

অন্বেষা ঃ আমার শেষ প্রশ্ন - আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে modernismএর আঙ্গিকে, শিল্পক্ষেত্রে revivalism বা পুনর্জাগরণকে ঘিরে প্রবল আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের বিপক্ষে বিনোদবিহারীর মতভেদ আমরা সর্বদা লক্ষ করে থাকি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই এই বিষয়ে সতর্ক করে বলেছিলেন, ‘I strongly urge our artists vehemently to deny their obligation careful to produce something that can be labeled as Indian art conforming to old world mannerism’। অর্থাৎ শিল্পীদের প্রতি তাঁর উপদেশ - প্রাচীন রীতির অনুকরণে ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বার্তা বা take home message দিতে চান? বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে এমন কোনও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কি আলোচনায় বাদ পড়ে গেছে যা আপনি বিশেষভাবে পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চান?

রমণ ঃ একদম সঠিক। এ কথা সত্যি যে, বিনোদবিহারী তাঁর জীবনের শুরু থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের মতো তিনি পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে ছবি আঁকবেন না। তখন সেটাই ছিল তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িক শিল্পীদের কাজের মূল উপজীব্য। কিশোর বয়সেই তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আমৃত্যু সেই সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। আমার ধারণা, তাঁর সিদ্ধান্তের নেপথ্যে অন্য কোনও কারণের থেকে তাঁর অন্তরের গভীর তাড়না এবং উৎসারিত মনের চেতনারই প্রাধান্য ছিল বেশি। তাঁর পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি যে অজ্ঞ ছিলেন, কিংবা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অথবা এই ধরনের কোনও স্বাদেশিক রাজনীতির বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, তা কিন্তু কখনই নয়। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যে ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা, তাঁর যুক্তিবাদী চেতনা, সর্বোপরি রবীন্দ্র দর্শন সম্পর্কে তাঁর অগাধ চর্চা হয়তো এই সিদ্ধান্তের পেছনে বড় ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে। তবে নেপথ্যে যাই কারণ থেকে থাকুক, এই সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত পছন্দ, কোনও সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত বা স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার অঙ্গ নয়। তাঁর চারপাশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি যে অনবহিত ছিলেন অথবা সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, এমনটা কিন্তু নয়। এখানে সমকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসঙ্গ উদাহরণস্বরূপ আনা যেতে পারে।

দূর থেকে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের গতিবিধির ওপর নজর রাখলেও সরাসরি তার আঁচ গায়ে লাগতে দেননি বিনোদবিহারী। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষে মুক্তিকামী মানুষের আন্দোলনের প্রতি আনুগত্যের প্রতীকস্বরূপ খাদি বস্ত্র পরিধানের মতো দু-একটি বাহ্যিক নিদর্শন করা ছাড়া আন্দোলনে আর কোনও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন কি না সেটা জানা যায় না। বরং তার বিকল্প হিসেবে শিল্পের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর মনঃসংযোগ করাকেই তাঁর priority বলেই মনে করতেন। তাঁর কাছে একজন শিল্পী হিসেবে শিল্পের অতলের মর্ম স্পর্শ করা এবং একজন শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের শিল্প-পরিধি বিস্তারে সহায়তা করা, রাজনৈতিক সক্রিয়তা বা জাতীয়তাবাদী বিষয় নিয়ে ছবি আঁকার থেকে কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ

ছিল না। তাছাড়া সক্রিয় রাজনীতি করার মতো মানসিক অথবা শারীরিক ক্ষমতা কোনওটাই তাঁর ছিল না। এ ক্ষেত্রে তিনি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তো জাতীয়তাবাদী কর্তব্য হিসেবে রাজনৈতিক সক্রিয়তা থেকে সরে এসে শিক্ষাবিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

তবে, বিনোদবিহারীকে শুধুমাত্র একজন formalist বা আচারনিষ্ঠ শিল্পী হিসেবে গণ্য করাটা ভুল হবে। যে কোনও দক্ষ পর্যবেক্ষকই তাঁর কাজে লক্ষ করে থাকবেন যে, তাঁর শিল্পকর্মের গভীরে একগুচ্ছ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ অন্তর্নিহিত রয়েছে। মধ্যযুগের সাধুসন্তদের জীবন অবলম্বনে আঁকা তাঁর ম্যুরালটা এর একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যদিও এই ম্যুরালের কম্পোজিশনে বহু ঐতিহাসিক এবং সাহিত্য-বর্ণিত চরিত্রের সমাহার লক্ষ করা যায়, তবুও ছবিটা নিছক কোনও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর চিত্ররূপ নয়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের এক উত্তাল পটভূমিতে রচিত ম্যুরালটি মূলত তাঁর কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের এক দৃশ্যপট। বাস্তবে এই রূপটাই তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে তিনি অতীতের শরণাপন্ন হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর এই শিল্পকর্ম অতীতের কোনও বর্ণনা নয়; বরং এটাই দেশের ভবিষ্যৎ নিয়তি বা তার গন্তব্যকে ইঙ্গিত করছে। এটি তাঁর আজীবন পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং গভীর চিন্তাভাবনার ফসল। এর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সর্বোপরি আত্মনির্ভরশীলতা। স্বাধীনতার আবহে নিজেকে গড়ে তোলার এই আদর্শটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের মূল ভাবনা। এই ম্যুরালের মাধ্যমে আমরা বিনোদবিহারীকে রবীন্দ্রনাথের সেই আদর্শকেই উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করতে দেখেছি।

আমার ধারণা, জীবনের সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজের সততার প্রতি অবিচল থাকাটাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

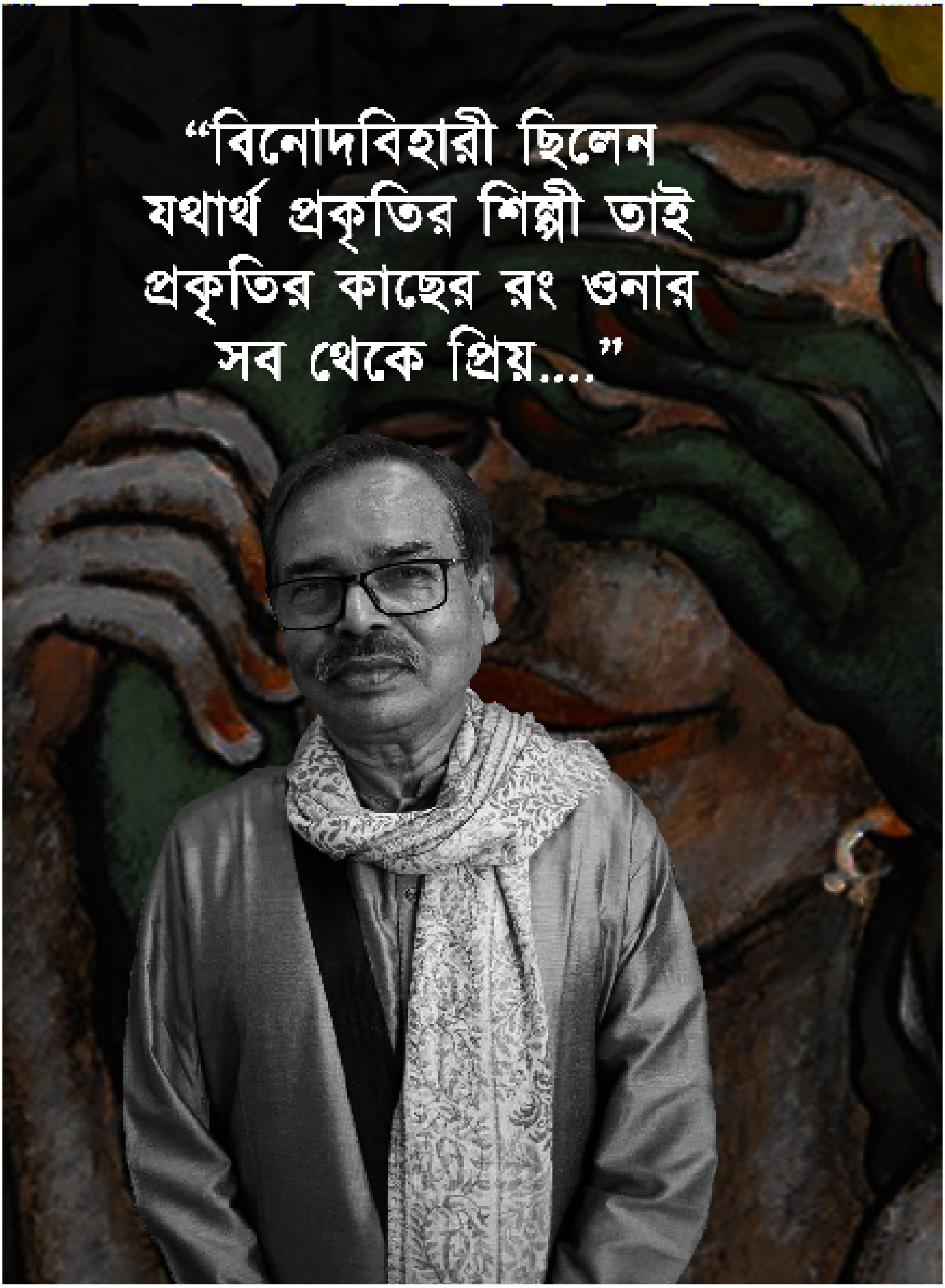
"বিনোদবিহারী ছিলেন
যথার্থ প্রকৃতির শিল্পী তাই
প্রকৃতির কাছের রং ওনার
সব থেকে প্রিয়...."

অন্বেষাকে
বললেন শিল্পী গবেষক
সুশোভন অধিকারী

বিনোদবিহারীর ছবি

অঁরি মাতিস'এর ছবি

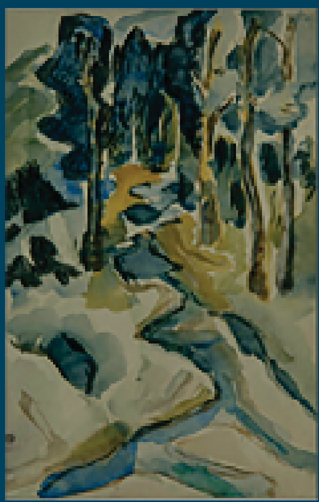

বিনোদবিহারীর ছবি

ওট্টো মুয়েলারের ছবি

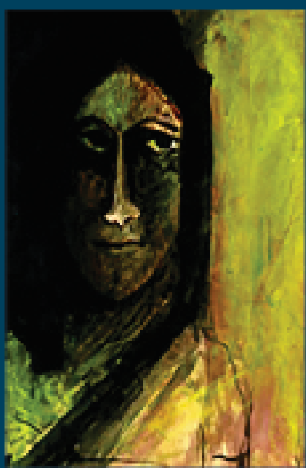

রবীন্দ্রনাথের
expressionism

একমাত্র শিল্পীরই একাকিত্বের অধিকার রয়েছে

[প্রাক কথা-- শিল্প-সমালোচক, গবেষক, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম বিশ্লেষক, লেখক এবং সর্বোপরি একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সুশোভন অধিকারীকে *অন্বেষা* পত্রিকার সাহিত্য আসরে পেয়ে আমরা অভিভূত। সুশোভনবাবু একজন বিরল ব্যক্তি যিনি কলাভবনের প্রাক্তন শিক্ষার্থী কে.জি. সুব্রহ্মণম, সোমনাথ হোর এবং দিনকর কৌশিকের ছাত্র। বিশ্বভারতীর স্নাতকোত্তর সুশোভন লন্ডনের ক্যাম্বারওয়েল কলেজ অফ আর্টস থেকে ছবির সংরক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি শান্তিনিকেতনের কলাভবনের 'নন্দন সংগ্রহশালা'-র প্রাক্তন কিউরেটর। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মের সংরক্ষক হিসেবে তিনি 'রবীন্দ্রভবন'এ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন। ১৯৮৩ সাল থেকে সুশোভনবাবু ভারতীয় শিল্পকলা, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্ম সম্পর্কে নিয়মিত লেখালেখি করে আসছেন। কেতকী কুশারী ডাইসনের সঙ্গে যৌথভাবে রচিত তাঁর গ্রন্থ 'রঙের রবীন্দ্রনাথ' ১৯৯৭ সালে 'আনন্দ পুরস্কার'-এ ভূষিত হয়েছে। বহু প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা সুশোভনবাবুর গ্রন্থতালিকার অন্যতম সেরা গ্রন্থগুলোর মধ্যে আছে *ছবির কথা ছবিকরের কথা; মাস্টারমশাই নন্দলাল; বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্কর; বাংলার পটচিত্র; শব্দের ছবি, কথার কোলাজ; Rabindranath Tagore His World of Art* প্রভৃতি গ্রন্থ]

অন্বেষা : বিনোদবিহারীর ছবিতে ঝলমলে রঙের প্লাবন তেমন নজর পড়ে না। দৃষ্টির স্বল্পতার জন্য সম্ভবত উজ্জ্বল বর্ণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল কম। তাঁর সমগ্র জীবনের কাজ দেখলে অনায়াসে বলা যায় তিনি যতটাই রেখায় শিল্পী বা আকারের শিল্পী, ততটা রঙের শিল্পী নন। রঙের যে একটা নিজস্ব চোখ ভোলানো মুগ্ধতা আছে তাকে পাশ কাটিয়ে বিনোদবিহারীর বিচরণ মনোক্রম ঘ্যাঁসা, অপেক্ষাকৃত কম রঙের ছবির জগতে। এই উপলব্ধি কতটা সঠিক বলে আপনার মনে হয়?

সুশোভন অধিকারী: যে কোনও ছবি প্রধানত তিনটি উপাদানের উপর গঠিত। এই তিনটি উপাদান হচ্ছে রং, রেখা এবং আকার। এটা অনেকটা গানের স্বরলিপির মতন সা রে গা মা পা ধা নি সা। এই স্বরলিপিকে বাদ দিয়ে যেমন

কখনও গান রচিত হতে পারে না, ছবির দিক থেকেও তাই। এই রং, রেখা এবং আকারের উপর চিত্রকলা দাঁড়িয়ে আছে। এখন এটা নির্ভর করছে শিল্পীদের ওপর - কোন শিল্পীর কোন বিশেষ দিকে পক্ষপাত বেশি। ছবির ক্ষেত্রে রেখা একটা মস্ত বড় শিরদাঁড়া। ইংরেজি ভাষায় painting শব্দটার মধ্যে রঙের কথা বলা আছে, কিন্তু বাংলায় 'চিত্র' কথাটার মধ্যে সে ভাবে কিছু আলাদা করে বলা নেই। আমাদের উনিশ শতকের যাঁরা প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক - যেমন শ্যামাচরণ শ্রীমানী বা মোকবুল চানডের কথায় বা পুরাতন সাহিত্যের বর্ণনা অনুসারে 'যে সৌন্দর্যজনিত বিদ্যার প্রধান অবলম্বন বর্ণ, তাকে চিত্র কহো' ! অর্থাৎ ছবি বর্ণের ওপর নির্ভরশীল। অনেক সময় একটু মনোক্রোমাটিক ছবিকে আমরা tinted ড্রয়িংও বলি। এখানে বিনোদবিহারীর ব্যাপারে আমার দুটো observations আছে। প্রথমত, বিনোদবিহারী জাপানি শিল্পীদের কাজে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে নন্দলাল দেশীয় ভাবধারার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত। পাশাপাশি রামকিঙ্করের দৃষ্টি কিন্তু পশ্চিমের দিকে - মূলত ফরাসি শিল্পের প্রতি ছিল তাঁর আকর্ষণ। ওনার আদর্শ হচ্ছেন পল সেজান, ভ্যান গগ, পাবলো পিকাসো এবং অন্যান্য শিল্পীরা। বিনোদবিহারীর কোলাজ ছবিতে অবশ্য মাতিসের খুবই সাদৃশ্য আছে।

অন্বেষা : রামকিঙ্কর তো cubism-এর ওপর অনেক ছবি করেছেন।

সুশোভন অধিকারী: অবশ্যই, cubism-এর ওপর বহু কাজ করেছেন রামকিঙ্কর। কিন্তু বিনোদবিহারীর ভালো লাগার জায়গা ছিল প্রাচ্য, মূলত দূর প্রাচ্য, অর্থাৎ চীন আর জাপান। মূলত ক্যালিগ্রাফি নিয়ে কাজ করার ওপর বিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁর। আর চীন জাপানের ক্যালিগ্রাফির বেশিরভাগ কাজ হয় সাদা-কালোতে, চীনের তো বিশেষ করে।

১৯৩৭-৩৮ সালে কিছু সময়ের জন্য বিনোদবিহারী জাপানে কাটিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার জন্য উনি রং তুলি থেকে একটু সরে এসেছেন। আপনারা জানেন সেই গল্প। শিল্পী জীবনের প্রথম দিকে বিনোদবিহারীর ছবিতে রং একটু ময়লা হয়ে যেত। যে কারণে একবার জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দায় বসে

বিনোদবিহারীর ছবি দেখে অবনীন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন যে তোমার রং এত নোংরা হয় কেন? বরং গগন ঠাকুর তখন সস্নেহে অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'অবন, সবাই যদি তোমার মতো ছবি করে, তবে নতুন ছবি হবে কেমন করে'? অবশ্য গগন ঠাকুর বিনোদবিহারীকে উপদেশও দিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে রং পরিষ্কার করে করতে। অবনীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সেটা যেন তার মাথায় থাকে। আমরা দেখেছি দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আমরা অনেক সময় দেখি যে লাল রংটাকে ঘষতে ঘষতে একটা বাদামি খয়েরি রঙের টোন এনে ফেলেছেন। তবে আপনি যেটা বললেন সেটা ঠিকই, রংয়ের একটা মনোহরণ করার ক্ষমতা আছে। আপনি একটা সাদা কালো ছবির পাশাপাশি একটা রঙিন ছবি ফেলে রাখলে সাধারণ দর্শক রঙিন ছবিটাকেই হতে তুলে নেবে। তাহলে সাদা কালো ছবি কি তার সৌন্দর্য হারায়? সাদা কালো ছবির মধ্যে একটা tonal variation আছে। একটা রঙের বর্ণস্তর ধীরে ধীরে একটা রহস্যময় ambience তৈরি করতে পারে, যেটা কিন্তু রঙিন ছবি সেভাবে করতে পারেনা। আজকে যদি 'চারুলতা'কে আমরা রঙিন করে দিতাম, সেটা কি আমাদের কাছে খুব গ্রহণযোগ্য হতো? এর জন্য সাদা কালোকে আমাদের মর্যাদা দিতেই হবে। সাদা এবং কালো অনেকটা খাদের 'সা' আর চরার 'সা'র মতো, অর্থাৎ সাদাকালো দুই বিপরীত ধর্মী বর্ণের মাঝখানে কিন্তু ছবির ঘনত্ব, ছবির গাম্ভীর্য, ছবির মাধুর্য এবং ছবির ওজন দাঁড়িয়ে থাকে যেটাকে বিনোদবিহারী বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

অন্বেষা : অর্থাৎ দ্বিতীয়ত, আপনি বলতে চাইছেন এটাই বিনোদবিহারীর নিজস্ব স্টাইল?

সুশোভন অধিকারী: একদমই তাই, এটাই ছিল ওঁর নিজস্ব স্টাইল। যে কোন শিল্পীকে দেখুন না কেন, শেষ বেলায় তার ছবিগুলোতে simplicity ফুটে উঠেছে। যোগেন চৌধুরীর শেষ বেলার কালি তুলির কাজ যদি আপনি দেখেন, তবে দেখবেন কী সহজ ভাবে আঁকা ছবিগুলো। প্রথম জীবনে বিনোদবিহারী কলাভবনে থাকাকালীন একবার টুকটুকে লাল খোয়াই-এর ছবি এঁকেছিলেন এবং তার সঙ্গে সবুজ গাছ। এই দৃশ্য নাকি উনি

স্বপ্নে দেখেছিলেন। এই ছবি আঁকার পরে বিনোদবিহারী বলেছিলেন, 'এটাই আমার জীবনের প্রথম রঙিন ছবি। এভাবে রঙিন ছবি আমি কখনও আর আঁকবো না'। অর্থাৎ ছবিটা প্রথমবার এঁকেছিলেন ঠিকই কিন্তু সেই ছবি হয়তো ওনার মনকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাই আবার ফিরে গেছেন নিজের সাদাকালো তথা বর্ণবিরল সীমানার মধ্যে। আমার বিনোদবাবুর জীবনের প্রথম ছবি দেখবার সুযোগ হয়েছিল, যখন উনি কলাভবনের ছাত্র। সেই সময় বন্ধু ও শিল্পী অর্ধেন্দু প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পোস্টকার্ডের মাধ্যমে একটি চিঠির পিছনে এই ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলেন। ছবিটা দেখে খুব আশ্চর্য লেগেছিল। ছবির বর্ণপট ছিল আশ্চর্য কালো এবং অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে ছবিতে আলোর এক উদ্ভাস দেখেছিলাম। কুচকুচে কালো বর্ণপটে একটা মাত্র ঘাসের ডগায় ছোট্ট একটা ফুল ফুটে আছে। ফুলটার মাঝখানে একটু সাদা রং দেওয়া আছে আর তার পাশে হালকা নীলের আভাস। ছবির আর চারিদিকটা শুধুই অন্ধকার। এ ছবি তাঁর শেষ জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিনোদবিহারী ছিলেন অত্যন্ত অনুভূতিশীল মানুষ। সেই কারণে বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্করের তুলনা করতে গেলে রামকিঙ্করের মধ্যে আমরা দেখি একজন বোহেমিয়ান মানুষের প্রতিচ্ছবি। বোহেমিয়ান রামকিঙ্করকে আমরা দ্রুত বুঝতে পারি, তাঁকে ধরতে পারি, স্পর্শ করতে পারি। তুলনায় বিনোদবিহারীকে বুঝতে পারাটা অনেক বেশি কঠিন। বিনোদবিহারীর অভিজাত ভাবনার উচ্চতায় আমরা সরাসরি পৌঁছাতে পারি না।

অন্বেষা : ছাত্র অবস্থা থেকেই বিনোদবিহারীর কাজে নিঃসঙ্গতার প্রতি বিপুল আকর্ষণ আমরা দেখতে পাই। বীরভূমের উন্মুক্ত প্রান্তর, গাছপালা, তাল, খেজুর - এরা সকলেই বিনোদবাবুর চিত্রপটের বিষয়। ওনার কথায় 'প্রকৃতির রুক্ষ মূর্তি উপলব্ধি না করলে আমার ছবি আঁকা হতো না'। অন্যত্র বলেছেন 'খোয়াই আর তাতে একটি সলিটারি তালগাছ - ওটাই আমার কাজের স্পিরিট'। শিল্পীর আঁকার এই অস্বাভাবিক নিঃসঙ্গতার উৎস কী বলে আপনার ধারণা?

সুশোভন অধিকারী: সত্যিকারের শিল্পীরা নিঃসঙ্গ হন। রবীন্দ্রনাথের চারপাশে এত মানুষজন ছিলেন কিন্তু তবুও তিনি নিঃসঙ্গ। ওনার অসম্ভব সুন্দর একটা কবিতার

লাইন আমাকে সারাজীবন haunt করে - 'বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা' - এই একা না হলে শিল্পী হওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ একের পর এক গান রচনা করেছিলেন তাঁর একাকিত্বকে নিয়ে--

আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে।।
ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয় নি বলা,
কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে।।
আমার চোখে ঘুম ছিল না গভীর রাতে,
চেয়ে ছিলেম চেয়ে থাকা তারার সাথে।
এমনি গেল সারা রাতি,
পাই নি আমার জায়গা সাথি--
বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে।।

এই নিঃসঙ্গতা প্রতিটি অনুভূতিশীল মানুষের মধ্যেই আছে। রবীন্দ্রনাথের কী আশেপাশের সঙ্গীর অভাব ছিল? পরিবারের মানুষজন ছাড়াও একপাশে মৈত্রী দেবী, রানী চন্দ, নির্মল কুমারী অন্য দিকে প্রতিমাদেবী, ইন্দিরা দেবী-- কিন্তু তবুও যেন কবি নিঃসঙ্গ। সারারাত জেগে বসে আছেন জানালার দিকে চেয়ে, অপেক্ষায় আছেন কখন সূর্যোদয় হবে। সূর্যের তাপ তিনি অনুভব করবেন। সেই নির্জনতা এবং নিঃসঙ্গতা শিল্পীদের ভিতরে একটা সৃষ্টির বীজ বহন করে বলে আমি মনে করি, যেটা বিনোদবিহারীর মধ্যে ভীষণভাবে কাজ করেছিল। তাঁর সেই নিঃসঙ্গতাকে সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবি Inner Eyeতে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আপনি ছবিতে কোথাও ওনার স্ত্রীকে পাশে দেখতে পেয়েছেন, উনি তো ছিলেন, তবুও...

অন্বেষা : না। ওই সময়ে কী লীলা দেবী শান্তিনিকেতনে বিনোদবাবুর সঙ্গেই থাকতেন?

সুশোভন অধিকারী: হ্যাঁ, অবশ্যই। লীলা দেবী তো ওই সময়ে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন। নিমাই ঘোষের শুটিং এর বেশ কিছু স্থির চিত্রে লীলা দেবীকে দেখা যাচ্ছে। উনি কিন্তু তখন শ্রীনিকেতনের কর্মী। সত্যজিৎ রায় যখন বিনোদবিহারীর অন্তর্দৃষ্টিকে তার সিনেমায় ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই সময় শিল্পী ঘরের মধ্যে একা। একাই উনি চা ছেঁকে নিচ্ছেন, ছবি আঁকছেন-

সেখানে কারোর থাকার অধিকার নেই, একমাত্র শিল্পীরই সেখানে একাকিত্বের অধিকার রয়েছে। সেই যে উনি বলেছিলেন খোয়াই এর মধ্যে 'সলিটারি তালগাছ' - উনি সেই নিঃসঙ্গ তালগাছ। সেই নিঃসঙ্গতাই মানিকবাবু ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ছবিতে। একটা মজার কথা বলি, বিনোদবাবুকে নিয়ে প্রথম ছবি করার কথা ছিল মৃণাল সেনের। কিন্তু বিনোদবাবু মৃণাল সেনকে দিয়ে ছবি করাতে রাজি হলেন না। এই গল্প আমি শুনেছি দিনকর কৌশিকের কাছ থেকে। কৌশিকদা ছিলেন আমাদের মাস্টারমশাই। যখন কৌশিকদারা বিনোদবাবুকে বলতে গেলেন ছবির কথা, উনি কিছুতেই রাজি হলেন না। কৌশিকদাকে বলেছিলেন 'আমি অন্য কারোর কাছে নিজেকে খুলে বলতে পারব না'। যিনি এতটাই সেনসিটিভ যে সামান্য পায়ের শব্দে যিনি 'কে'? বলে চিৎকার করে ওঠেন, তিনি কি করে অন্য কারোর কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন? তবে হ্যাঁ, একটা কথা উনি কৌশিকদাকে বলেছিলেন 'যদি আমার ছাত্র মানিক আমাকে নিয়ে কোনও ছবি করতে চায়, তাহলে আমার আপত্তি নেই, কারণ ওর সামনে আমি সব কথা বলতে পারব। মানিক আমার ছাত্র, ও আমাকে সঠিক ভাবে বুঝতে পারবে।

অন্বেষা : দিনকর কৌশিক একটা লেখায় বলেছিলেন যে সত্যজিৎ ছিলেন কলাভবনে তাঁর সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি প্রথম মানিককে প্রস্তাব দিয়েছিলেন রামকিঙ্করকে নিয়ে একটা ছবি করার। কিন্তু সত্যজিৎ বলেছিলেন 'যদি কোনও ছবি করতেই হয়, তবে বিনোদদাকে নিয়ে আমি ছবি করবো, বিনোদদা আমার মাস্টার মশাই' কথাটা বলার কারণ ঠিক কী হতে পারে?

সুশোভন অধিকারী: হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। তবে কিঙ্করদাও সত্যজিতের শিক্ষক, সে কথা ভুললে চলবে না। আসলে রামকিঙ্কর একটু অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন। কখন যে রেগে যাবেন আর কখন আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বলবেন আমরা বুঝতে পারতাম না। হয়তো শ্যুটিংয়ের মাঝে চিৎকার করে বলেই উঠবেন, 'এই মানিক, এসব তুমি কি করছ?' হয়তো শট গোলমাল হয়ে গেলো। রামকিঙ্করকে তো আমরা পাঁচ বছর পেয়েছি, আমরা দেখেছি উনি একটু খামখেয়ালী গোছের মানুষ ছিলেন। কখনও

আমাদের কাছে ডেকে যত্ন করে খাতা টেনে নিয়ে আঁকা শেখাতে বসলেন, কখনও আবার 'সকাল থেকে কি করছো? কোন কাজ নেই তোমাদের'? বলে হয়তো বকে দিলেন। উনি ছিলেন উদাসী বাউল। অপর দিকে বিনোদবিহারীর মধ্যে একটা অত্যন্ত সংযত ভাব ছিল।

অম্বেষা : হ্যাঁ, আপনার লেখাতেই পড়েছি শান্তিনিকেতনে আপনার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা। আপনি কলা ভবনের দিকে হেঁটে চলেছেন, উল্টো দিক থেকে একই রিক্সায় ঋত্বিক ঘটক এবং রামকিঙ্কর আসছেন। পিছনে আরেকটি রিক্সায় ক্যামেরা হাতে সিনেমাটোগ্রাফার পার্থপ্রতিম চৌধুরী। এবার পরের প্রশ্নে চলে যাই। মাস্টারমশাই নন্দলালই কি কলাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ? নন্দলাল বসুর পরে কলাভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কে? বিনোদবিহারী কি কখনও কলাভবনের কর্ণধার হয়েছিলেন, তবে সেটা কবে? কতো বছর উনি কলাভবনে শিক্ষকতা করেছিলেন?

সুশোভন অধিকারী: নন্দলাল বসু কলাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ নন। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অসিতকুমার হালদার। রবীন্দ্রনাথ ঠিক করেছিলেন যে অবন ঠাকুরের কাছ থেকে যে করে হোক নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে হবে। নন্দলাল ছিলেন অবন ঠাকুরের সব থেকে প্রিয় ছাত্র। অবন ঠাকুরের আশংকা - নন্দলালকে ছেড়ে দিলে তাঁর হাতে গড়া 'ওরিয়েন্টাল সোসাইটি' ভেঙে যাবে। অবনীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে বেঙ্গল স্কুল অফ আর্টের যে আধুনিক ধ্বজা উনি তুলে ধরেছেন, সেই ধ্বজা ভবিষ্যতে বহন করতে পারেন একমাত্র তাঁর প্রিয় ছাত্র নন্দলাল, কারণ নন্দলালের মতন প্রতিশ্রুতিবান ছাত্র আর কোথায়? এদিকে রবীন্দ্রনাথ কলাভবনের জন্য নন্দলালকেই চেয়েছেন, নন্দলালকেই তাঁর চাই। সেই সময় কিছুকালের জন্য নন্দলাল শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তখন উনি অধ্যক্ষ ছিলেন না। অধ্যক্ষ ছিলেন অসিতকুমার হালদার। সেই সময় বেশ কিছু কাল উনি সপ্তাহে একবার করে শান্তিনিকেতনে যাওয়া আসা করতেন, ক্লাস নিতেন, আবার কলকাতায় ফিরে যেতেন। বাকি সময়টা দিতেন ওরিয়েন্টাল সোসাইটিকে। একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল তখন নন্দলালবাবু প্রিন্সিপাল হিসেবে অভিষিক্ত হন নি। একবার রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের ছুটিতে

শিলং, আগরতলা বেড়াতে গেছিলেন। সেই সময় শান্তিনিকেতনে নন্দলালের থাকার কথা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ফিরে এসে দেখেন নন্দলাল নেই। নন্দলাল নিঃশব্দে কাউকে না বলে কলকাতায় চলে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথ নাকি নন্দলালকে একটা চিরকুট পাঠিয়েছিলেন, সেই চিরকুট পেয়ে উনি কলকাতায় চলে গেছেন। অবশ্য সেই চিরকুট পরে আমরা কখনও দেখিনি। এদিকে গরমের ছুটি শেষ হবার পরেও নন্দলাল শান্তিনিকেতনে পৌঁছননি। রবীন্দ্রনাথ ফিরে এসে অসম্ভব ক্ষুব্ধ হলেন, রাগ করলেন, আবার অভিমানও হলো। পিয়ারসনকে লেখা একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করে লিখলেন, 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল যে নন্দলালকে আমি পাবো না'। এই চিঠির পরই রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় একখানি চিঠি লিখলেন। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের অভিমানের ভাষা সুস্পষ্ট, 'নন্দলালকে তো নিজের জন্য চাইনি, দেশের জন্য চেয়েছিলাম। ও যদি এখানে কাজ করত তাহলে ওরই লাভ হতো'। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সারা জীবন আমি একলা পথে হেঁটেছি, এবারেও আমি একলা পথেই চলবো'। এরপরে অবন ঠাকুর অবশ্য আর নন্দলালকে আটকে রাখেন নি, চিঠি পেয়েই প্রিয় ছাত্রকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন উনি প্রিন্সিপাল হন নি কিন্তু তখনও অসিত কুমার হালদার প্রিন্সিপাল। এরপর ১৯২৩ সালে অসিত কুমার হালদার বিদেশে চলে গেলে কলাভবনের অধ্যক্ষ হলেন নন্দলাল বসু। বিদেশ থেকে ফিরে অসিত কুমার হালদার অবশ্য শান্তিনিকেতনে আসেন নি, লখনৌ আর্ট কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। অসিত হালদার শান্তিনিকেতন ত্যাগ করলে নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হলেন। ১৯২৩ সাল থেকে নন্দলাল কলাভবনে পাকাপাকি প্রিন্সিপাল হিসেবে ছিলেন। সেই থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত নন্দলাল কলাভবনের অধ্যক্ষ পদ সামলেছেন এবং ওনার পরে কলাভবনের অধ্যক্ষ পদে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ওনার পুত্র বিশ্বরূপ বসু। বিশ্বরূপ বসুর পরে এই দায়িত্ব সামলেছেন সম্ভবত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা।

অন্বেষা : এই পদে বিনোদবিহারী কি কখনও দায়িত্ব পালন করেছিলেন?

সুশোভন অধিকারী: হ্যাঁ, বিনোদবিহারী কিছুদিনের জন্য ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব

সামলিয়েছেন এবং সেটা দিনকর কৌশিক অধ্যক্ষ হিসেবে আসার কিছু আগে, অর্থাৎ সাতষট্টি সালের আগে। সেই সময় উনি চোখে কিছু দেখতে পেতেন না। অধ্যক্ষর কাজে বিনোদবিহারীকে তখন সাহায্য করতেন সুখময় মিত্র। সুখময়বাবু সমস্ত official চিঠিপত্র বিনোদবিহারীকে পড়ে দিতেন, সেই মতো বিনোদবিহারী চিঠির উত্তর দিতেন। রামকিঙ্কর কিন্তু কখনও এই পদে অধিষ্ঠিত হননি। ক্রমে ষাটের দশকের শেষের দিকে কলাভবনের মান ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছিলো। Society of Oriental Artএর আলংকারিক ছবির দিকে ছাত্র শিল্পীরা একটু ঝুঁকে পড়ছিলেন। রামকিঙ্কর তাঁর নিজের মতন ছবি করে যাচ্ছেন। সবার সঙ্গে সবার একটা তখন সমন্বয়ের অভাব। ১৯৬৭ সালে আচার্য হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী নিজের উদ্যোগে কলাভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে দিনকর কৌশিককে এনেছিলেন।

অন্বেষা : রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে শুনেছি কলাভবনের পরিবেশ বেশ কিছুটা আঁটো সাটো হয়ে গেছিলো। শিল্পীরা তাদের পছন্দ মতো ছবি আঁকতে পারছিলেন না।

সুশোভন অধিকারী: রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকার সময় নন্দলালকে আশ্রমের ব্যাপারে সবসময়ে পরামর্শ দিতেন, নির্দেশ দিতেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ চলে যাওয়ার পরে নন্দলাল তাঁর কাজে বেশ খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ ব্যাপারে একবার তো গান্ধীজির কাছে খুব বকুনিও খেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর গান্ধীজি ১৯৪৫ সালে শেষবার আশ্রমে এসেছিলেন এবং তিন দিন থেকেও ছিলেন। শেষ দিন সন্ধ্যেবেলায় শান্তিনিকেতনের সকল বিভাগীয় প্রধানদের ডেকেছিলেন এবং সেই বৈঠকে কে না ছিলেন - ক্ষিতি মোহন সেন, বিধু শেখর শাস্ত্রী, নন্দলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে। সেই বৈঠকে নন্দলাল গান্ধীজিকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে আমার কলাভবনের দায়িত্ব আমার পরে কাকে দিয়ে যাব? এই প্রশ্নে গান্ধীজি অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'এই কথাটা আমাকে জিজ্ঞেস করার অর্থ একটাই হতে পারে - তুমি তোমার যোগ্য উত্তরসুরী তৈরি করতে পারোনি'। গান্ধীজির এই কথায় নন্দলাল বেশ আঘাত পেয়েছিলেন। নন্দলাল স্বীকার করেছিলেন যে

ওনার জীবন, ওনার কাজ, সমস্ত কিছু আজ একটা জলহীন আলংকারিক কলস হয়ে উঠেছে। তারপরেও নন্দলাল যেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র - পুত্র দুর্যোধনের মতো কলাভবনের দায়িত্ব দিয়ে গেছিলেন পুত্র বিশ্বরূপ বসুর হাতে।

অন্বেষা : এবার একটু অন্য দিকে যাচ্ছি। নিবেদিতা এবং ওকাকুরার ওরিয়েন্টাল আর্ট বা বেঙ্গল আর্ট মুভমেন্টের একমাত্র ধারক বাহক অবনীন্দ্রনাথ। প্রথমে কলাভবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হলেও রবীন্দ্রপ্রয়াণে অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আচার্য হন। ততদিনে রামকিঙ্কর এবং বিনোদবিহারীর হাত ধরে শান্তিনিকেতনের শিল্পধারায় পশ্চিমের উন্মুক্ত বাতাস প্রবেশ করেছে। এই পর্যায়ে শিষ্যা রতি পেটিটকে একান্ত আপন আলাপচারিতায় অবনীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেন, 'যা হচ্ছে তাকে আর্ট বলতে পারি না, এ আমি তাদের কী শিখিয়েছি? আমার শেখানো যত পুরোনো পদ্ধতি ছিল, সেগুলো সব আকাশে মেঘের মতো অদৃশ্য হয়ে গেলো। এবারে আমি তোমাদের একেবারে অন্যভাবে শেখাবো'। মনে রাখতে হবে তখনও প্রিয় শিষ্য নন্দলাল কলাভবনের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত। বিশ্বভারতীর দায়িত্ব নেওয়ার পরে শিল্পাচার্যের গলায় কি কোনও আক্ষেপের সুর ছিল? উনি কি বাংলার শিল্পকলার revival-ism এর ওপর প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন? আপনার উপলব্ধি কি?

সুশোভন অধিকারী: আমার মনে হয় অনেকটা তাই। তবে এটা সামগ্রিক ভারতশিল্পের কথা। তখন রবীন্দ্রনাথ চলে গেছেন। নন্দলাল তখনও কলাভবনের অধ্যক্ষ। এখানে একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। আম্রকুঞ্জের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আমার পরে অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর দায়িত্ব নেবেন। 'রবিকা' যখন বলেছেন তখন সে আদেশ অবন ঠাকুর মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। সেটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া অবনীন্দ্রনাথ এটাও ভেবেছিলেন শান্তিনিকেতন জুড়ে তাঁর প্রচুর প্রিয় ছাত্ররা রয়েছে, সুতরাং সেখানে তাঁর সময় খুব ভালোই কাটবে। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ যখন কলাভবনে আসতেন, সমস্ত ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে বসতেন। অবনীন্দ্রনাথ কলাভবনের ছাত্রদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন, কারও খাতা টেনে ছবি এঁকে দিচ্ছেন তো কাউকে তার কাজ নিয়ে সুপরামর্শ দিচ্ছেন,

কখনও বা তাদের সঙ্গে অনেক রকম গল্প জুড়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে নন্দলালের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বিপরীত। কয়েকদিন দেখার পরে নন্দলালের মনে হল যে ছাত্রদের মাঝে অবনীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বিপন্ন হতে চলেছে। ভেবে দেখলে অবনীন্দ্রনাথ গুরুকুলে বিশ্বাসী ছিলেন, উনি সিলেবাস বা পরীক্ষার নম্বরে খুব একটা বিশ্বাস করতেন না। এ ব্যাপারে নন্দলাল ছিলেন বিপরীত। নন্দলালকে আর্ট স্কুল চালাতে হয়, মনে হল যে অবনবাবু যেন তার ইনস্টিটিউটের শৃঙ্খলা ভেঙে দিচ্ছেন। উপমা টেনে বললেন, 'দইটা যখন পাত্রে চাপ হয়ে বসে এসেছিল, অবনবাবু সেই দইটা নষ্ট করে দিলেন'। প্রিয় শিষ্যের কাছ থেকে এমন ভাবনায় অবনীন্দ্রনাথ আঘাত পেয়েছিলেন। কথাটা তাঁর কানে যেতেই উনি কলাভবনে যাওয়া কমিয়ে দিলেন। তবে গুরু শিষ্যের সম্পর্কে কোনও ভাঁটা পড়ে নি। বরং 'উদয়ন'এর বারান্দায় এসে তার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের আলাপ জমে উঠল। সেই সময় রতি পেটিটের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের গভীর যোগাযোগ হয়। রতি পেটিট শান্তিনিকেতনে ১২ বছর ছিলেন। উনি ছিলেন পার্সি এবং খুবই অভিজাত পরিবারের মেয়ে, বিদেশে পড়াশোনা করেছেন, নাচ শিখেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন ভিন্নস্তরের মানুষ, যেকোনও লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না। ওনার কথায় এমন সব ব্যঞ্জনা থাকতো যা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন। কিন্তু রতি পেটিটের সঙ্গে শিল্পাচার্যের খুবই সখ্যতা ছিল। এক সময় রতি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারের কপি আমি দেখেছি।

অন্বেষা : শান্তিনিকেতনে, এমনকি গোটা ভারতবর্ষে, শিল্পকলায় এই যে একটা পরিবর্তন আসছে পাশ্চাত্য ধারার অনুকূলে, সেখানে অবনীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে কোথাও কী কোনও আশংকা তৈরী হচ্ছিল, যেটা রতি পেটিটের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় প্রকাশ পেয়েছিল?

সুশোভন অধিকারী: না, পাশ্চাত্য ধারায় ওনার আপত্তি থাকার কথা নয়, কারণ ওয়েস্টার্ন আর্ট থেকেই ওনার শিল্পশিক্ষার সূচনা। আমার ধারণা শুধু কলাভবনই নয়, সারা ভারতবর্ষের শিল্পকলার দিকে তাকিয়েই উনি এই কথাটা

বলেছিলেন। ওনার কাজের মধ্যে অনেক বৈচিত্র আছে, যেমন ধরুন English watercolour transparency ওনার কাজে দেখা যায়, ওনার কাজে মোগল paintingsএর রঙের গমক আছে, পার্শিয়ান মিনিয়েচার এর প্রভাব আছে। আর আছে জাপানি আঙ্গিক। সব মিলিয়ে অবন ঠাকুরের ছবিকে কিন্তু টিপিকাল ভারতীয় লেভেল মার্কা বলা যায় না। ওনার মধ্যে সংমিশ্রণ আছে।

অন্বেষা : সেটা ওনার শিক্ষা ক্ষেত্রে হয়তো এসেছে। ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক নিবেদিতা, ওকাকুরার এবং আর্নেস্ট হ্যাভেলের গভীর সংস্পর্শ কী ওনাকে revivalismএর পথে হাঁটতে শেখাননি বলছেন?

সুশোভন অধিকারী: সেটা তো আপনি উনিশ শতকের গোড়ার কথা বলছেন। অর্থাৎ ১৯০৫ সালের কথা। এর পরে তো অবনীন্দ্রনাথ অনেক বছর শিল্প চর্চা করেছেন। উনি বেঁচে ছিলেন - ১৯৫১ সাল পর্যন্ত। একটা ভাবনাকেই কি উনি সারা জীবন বয়ে নিয়ে যাবেন? তা তো হয় না! প্রত্যেক মুহূর্তে বাঁক ফিরেছেন। প্রথমদিকে wash paintingএর টেকনিক এর উপর আগ্রহ ছিল কিন্তু পরে শেষের দিকে উনি পটের ওপর নির্ভর করতেন। এমনকি শেষ জীবনে উনি যাত্রাপালা লিখেছিলেন। উনি বলতেন, 'এখন যা ভাবি তাই আঁকতে পারি, সুতরাং ছবি আঁকার থেকে আমার মনটা উঠে গেছে'। শেষ জীবনে 'কুটুম কাটাম' বানাতে শুরু করলেন একদম পড়ে থাকা জিনিস দিয়ে। কোথায় তাঁর wash paintingএর আশ্চর্য সূক্ষ্মতা, লেয়ারের পর লেয়ার রং দিয়ে একটা কিছু তৈরি করছেন, অসামান্য আলোর দ্যুতি ছবির মধ্যে ফুটে উঠছে আর শেষকালে কি হলো? কতগুলো পাথর বা কাঠের টুকরোকে কেটেকুটে সুতো জুড়ে কতগুলো ফিগার বানাচ্ছেন আর নাম দিচ্ছেন - এটা যক্ষপুরীর ময়ূরী, এটা দারোয়ান, এটা কাঠের সিংহ ইত্যাদি। আসলে বেশিরভাগ শিল্পী শেষ জীবনে simplicityর দিকে ঝোঁকেন - সে অবনীন্দ্রনাথ বলুন আর পিকাসো বলুন। পিকাসোও তো শেষ জীবনে ফেলে দেওয়া junk জিনিসপত্র দিয়ে sculpture বানাতেন। রবীন্দ্রনাথের একটা ছোট্ট কথা বারবার আমার মনে পড়ে। উনি বলেছিলেন, 'সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে, সহজ কথা যায় না লেখা সহজে'।

সমস্ত শিল্পী সাহিত্যিকদের সহজ কথা বলবার জন্যে, সহজ ভাবে নিজেকে প্রকাশের জন্যে, সহজ চিত্র আঁকার জন্যে আজীবনের একটা যাত্রাপথ থাকে। অনন্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে।

অন্বেষা : কলাভবনের শিল্প-আদর্শের ধারা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি কোনও মতামত প্রকাশ করেছেন বলে জানা নেই। তবে সুধীর খাস্তগীরের কথায় আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথ কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের একবার বলেছিলেন ‘বড় করে বাহুর জোরে, মনের জোরে, কল্পনার জোরে ছবি আঁকো। ছোট সরু তুলি তুলে রাখো। মোটা তুলিতে নির্ভয়ে আঁকতে শেখো’। এই কথার মধ্যে কি অন্য কোনও ইঙ্গিত আছে? কলাভবনে আদর্শগতভাবে রক্ষণশীল বা সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে আশ্রমপিতার কি কোনও আগাম বার্তা?

সুশোভন অধিকারী: সুধীর খাস্তগীরের এই মন্তব্যটা ১৯২৫ সালের। নন্দলাল ১৯২৩ সালে পাকাপাকিভাবে প্রিন্সিপাল হয়ে কলাভবনে যোগ দিয়েছেন। উনি এমন একটা জায়গা থেকে এসেছেন যেখানে বদ্ধ ঘরের মধ্যে ছবি আঁকা হয় আর বছর বছর এক্সিবিশন করা হয়। কয়জন ছাত্রের মতন কিছু জুনিয়র শিল্পীরাও সেখানে আঁকা শেখে। পাশাপাশি কলাভবন এমনি একটি প্রতিষ্ঠান যা সমস্ত দেশকে দিশা দেখাচ্ছে, যার মাথার উপর রয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর এটা ১৯২৫ সাল, রবীন্দ্রনাথ ‘পূরবী’র কাটাকুটি থেকে রক্তকরবীর আঁকার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক করেছেন ছবি উনি আঁকবেন। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণ করে তাঁর চোখ নতুন করে খুলে গেছে। গোটা পশ্চিমের আর্ট মুভমেন্ট তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে যে শুধুমাত্র সূক্ষ্মতা বা ডেকোরেটিভ আর্টের মধ্যে শিল্পকলার আটকে থাকা উচিত নয়। তিনি মনে করছেন ছবির ভাবনাতেও বোল্ড হতে হবে, প্রকাশেও জোরালো হতে হবে। খুব আলংকারিক নকশা, সুন্দর মিষ্টি ছবির বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ওনার নিজের ছবিও তাই। নন্দলাল তখন পুরোপুরি তৈরি হয়ে ওঠেনি। শান্তিনিকেতনে আসার সময় অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে বলেছিলেন, ‘শোনো, সবাইকে তুমি শিল্পী করতে পারবে না। যে শিল্পী তার শিল্পীসত্তা ভেতরেই থাকে। আমড়া

গাছকে জল দিয়ে আম গাছ করা যায় না'। আসলে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাস্টারমশাইদের সেটাই করতে হয়। অবন ঠাকুরের সেই দায় ছিল না, কারণ সেরা সেরা ছাত্ররাই তাঁর কাছে আসতো। কিন্তু নন্দলালের ক্ষেত্রটা ছিল আলাদা। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মের গন্ডিতে আবদ্ধ। সেখানে দশজন ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, কোনও বিশেষ জায়গা থেকে শিল্প চর্চা করতে আসে নি। এখানেই গুরুকুল এবং একটা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য এবং সেই পার্থক্যটাই এই প্রসঙ্গে চলে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং কলাভবনের পরিচালনার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এখানে এসে নন্দলালকেও কিন্তু শিখতে হচ্ছে, আশেপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাঁওতাল গ্রাম, আদিবাসীদের সহজ জীবনযাত্রা - মাটি কামড়ে সবকিছু নন্দলালকে উপলব্ধি করতে হচ্ছে। কল্পনার নন্দলাল কাঁকর বেছানো পথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন। সেখানে স্টেলা ক্রামরিশ ক্লাস নিচ্ছেন, নন্দলালকেও সেই ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে। স্টেলা ক্রামরিশ শিল্প ইতিহাসের ক্লাস নিচ্ছেন। সেই ক্লাসে নন্দলালও উপস্থিত থাকছেন, সেটাও গুরুদেবের নির্দেশ। সুধীর খাস্তগীরের এই স্মৃতিকথা একদম প্রথম দিকের, তখন ওনারা প্রথম বর্ষ বা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। নন্দলাল তখন সদ্য এসেছেন এবং ওনাকেও তো সিলেবাসটা তুলতে হবে। নন্দলালের মধ্যে বেঙ্গ ল স্কুল অফ আর্ট এর ঘরানার প্রভাব তখনও বজায় ছিল। রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের সেই ভাবনাকেই ধাক্কা দিতে চেয়েছিলেন। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তোমরা সূক্ষ্ম তুলি ফেলে দিয়ে মোটা তুলি হাতে নিয়ে কবজির জোরে ভাবনার জোরে ছবি আঁকো'। উনি নিজেও তখন সেই পথে এগোচ্ছেন। ওনার আধুনিক শিল্পভাবনাকে এক দল তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সুচারুভাবে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন।

অন্বেষা : এই ধরনের ইঙ্গিত তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথকেও দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন দক্ষিণের বারান্দা থেকে নেমে এসে বাইরের জগৎটাকে একবার দেখতে, সেখানে কতো কী ঘটে চলেছে! এর অন্যতম কারণ ছিল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় কখনও

দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে শিল্প চর্চার আগ্রহ দেখান নি।

সুশোভন অধিকারী: হ্যাঁ, ঠিক কথা। সেটা ১৯১৬ সালে। তখনও কলাভবন হয়নি। সেই সময় 'জাপান যাত্রী' পর্বে মেয়ে মীরাদেবীকে বলছেন, 'আমি যদি ছবি আঁকতে পারতুম, দেখিয়ে দিতুম কী করতে পারতুম'। তার মানে ছবি আঁকার challangeটাকে উনি ভেতরে ভেতরে পোষণ করে এসেছিলেন। এখন আরও অনেক ঘটনার কথা আমরা জানতে পারি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গ্রন্থ থেকে।

অন্বেষা : একটি প্রসঙ্গে দিনকর কৌশিক লিখেছিলেন ছাত্র অবস্থায় সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় তার পছন্দের শিল্পী পিকাসোর নাম করাতে সত্যজিৎ সতর্ক করেছিলেন, পিকাসোর নাম মাস্টারমশাইয়ের কানে গেলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। রামকিঙ্করের শিল্প ভাবনা ও শিল্প রচনায় পিকাসোর সঙ্গে মিল পাওয়া যায় বলে কারও কারও ধারণা, বিশেষ করে পিকাসোর কিউবিজম। এমনকি বোহেমিয়ান পিকাসোর সঙ্গে সৃষ্টির নেশায় মাতাল রামকিঙ্করের স্বভাবেরও কোথাও একটা মিল পাওয়া যায়। সারা জীবন শান্তিনিকেতনের রক্ষণশীল পরিবেশে কাটিয়ে সুদূর ফরাসি কিউবিজমের প্রভাব রামকিঙ্করের জীবনে কিভাবে এলো বলে আপনার ধারণা।

সুশোভন অধিকারী: রবীন্দ্রনাথ ইন্টারন্যাশনাল আর্টের উপর বিদেশ থেকে কয়েক হাজার বই এনেছিলেন কলাভবনের জন্য শান্তিনিকেতনে। রামকিঙ্করের উপর সেই বইগুলোর প্রভাব ছিল অনেকখানি। নন্দলাল চাইতেন না ছাত্র অবস্থা থেকেই সকলের আধুনিক চিত্রকলার ওপর ঝোঁক হয়। রামকিঙ্করকে বলা ছিল, 'তুমি যখন অন্য ধরনের কোনও কাজ করবে স্টুডিওর দরজা ভেজিয়ে রেখে কাজ করবে, যাতে করে ছাত্রদের মধ্যে তাঁর কাজের প্রভাব না পড়ে। নন্দলাল সব সময় চাইতেন ছাত্ররা শিল্পশিক্ষার ধাপগুলোকে এক এক করে পেরিয়ে পেরিয়ে যাক। আমরা যদি সহজপাঠ না পড়ে প্রথমেই আধুনিক সাহিত্যের পাতা উল্টাই, তবে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে - এটা কখনোই কাম্য নয়। নন্দলাল পশ্চিমের আধুনিক শিল্পকলার চর্চা থেকে রামকিঙ্করকে বারণ করতেই পারতেন, কিন্তু তা তিনি কোনদিনও করেননি। শিল্পীদের সেই স্বাধীনতা উনি বরাবরই দিয়ে এসেছেন। ওনার আপত্তি ছিল ছাত্র অবস্থায় ছাত্রদের

মধ্যে প্রথম থেকে আধুনিক শিল্পের যেন কোনও প্রভাব না পড়ে। এই কথাগুলো যখন হয় তখন কৌশিকদা প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন, মানিকবাবুও তাই। মাস্টারমশাইয়ের বারণটা শুধুমাত্র ছাত্রদের জন্যই ছিল। কলাভবনে পড়াশোনা শেষ করার পরে ছাত্ররা যেভাবে কাজ করতে চায়, তাতে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।

অন্বেষা : অনেকের মতো আপনারও ধারণা, বিনোদবিহারীর রেখার এবং আকারের বিন্যাসের সঙ্গে ফরাসি শিল্পী আঁরি মাতিসের ছবি-ভাবনার অসম্ভব মিল আছে। কিন্তু আঁরি মাতিসকে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারের জন্য Fauvist শিল্পধারার পথিকৃৎ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। আর Fauvism মানেই বর্ণের বৈচিত্র। অথচ বিনোদবিহারীর ছবিতে ঝলমলে রঙের প্লাবন নেই বললেই চলে। এ ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যা।

সুশোভন অধিকারী: আঁরি মাতিস প্রথম যুগে Fauvist ছিলেন। Fauvist গ্রুপের মধ্যেই মাতিসের আত্মপ্রকাশ। যেমন ধরুন Impressionistরা প্রথম একটা গ্রুপ তৈরি করেছিল ঠিকই, কিন্তু পরে সেই গ্রুপটা ভেঙে গিয়েছিল, সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে গেছিলেন। ঠিক সেরকমই Fauvist গ্রুপটা মাতিস সূচনা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু মাতিস নিজেই সেই গ্রুপ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছিলেন। পরবর্তী কালে মাতিসের মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া, ওনার ওপর মধ্যপ্রাচ্যের ছবির প্রভাব - সবকিছু মিলিয়ে মাতিসের ছবির ধরনটাই বদলে গিয়েছিল। মাতিসের ছবি দেখলে প্রথমেই মনে হবে কোন মধ্যপ্রাচ্যের শিল্পীর আঁকা ছবি। ছবিগুলোর বেশিরভাগই রেখাভিত্তিক। আসলে শিল্পীদের জীবনে অনেকগুলো টার্নিং পয়েন্ট থাকে। বিনোদবিহারীর ছবিতে কখনও আবেগ তাড়িত মানুষের চেহারাটা ফুটে উঠতে দেখবেন না। মানুষ আর্তনাদ করছে, হাহাকার করছে, যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে - এমন ছবি কিন্তু দেখা যায় না বিনোদবিহারীর কাজের মধ্যে। আদর্শ সুন্দরের পক্ষে ছবি এঁকেছেন বিনোদবিহারী। মাতিসও তাই। আপনি যদি বিনোদবিহারীর পাশাপাশি মাতিসের ছবি দেখেন, তাহলে দেখবেন মাতিসের ছবি মানেই something joy of life। যেন আঁকায় রং ও রেখার বিশুদ্ধতা। মাতিস কখনও cruelty নিয়ে ছবি আঁকেননি। তা বলে কী উনি কখনও আঘাতে

দগ্ধ হননি, তাঁকে কোনও কিছুর তাড়না সহ্য করতে হয় নি, তেমন তো নয়। পিকাসোর ধরনটাও ছিল তাই। পিকাসোর ছবিতে একটি সাধারণ female nude এক অন্যরকম আবেদন নিয়ে আসে। Fau-vism থেকে সরে এসে মাতিস আদর্শ সৌন্দর্যের দিকে ঝুঁকেছিলেন। ওনার ছবির বিষয় গিয়ে দাঁড়িয়েছে Joy of Lifeএ। ঠিক যেন সেই কারণেই আমি এক সুরে বাঁধতে চাই, একই বেদীমূলে বসাতে চাই মাতিস এবং বিনোদবিহারীকে। বিনোদবিহারী এবং মাতিস, দুজনেই শেষ জীবনে কাগজ কেটে কেটে কোলাজের মতন ছবি করেছেন। বিনোদবিহারী অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই ধরনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। দেশে যখন দাঙ্গা হচ্ছে সেই সময় বিনোদবিহারীকে প্রশ্ন করেছেন, 'আপনার লজ্জা হয় না? দেশে যখন দাঙ্গা লেগেছে, মানুষ খাওয়ার পাচ্ছে না, আর আপনি তখন রং তুলি নিয়ে বসে আছেন'? বিনোদবিহারী উত্তর দিচ্ছেন, 'আমি তো সারা জীবনই রং নিয়েই বসে আছি, তা বলে যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ এগুলো কি আমাকে পীড়িত করেনি'? কিন্তু মাতিসের মতই বিনোদবিহারীও তাঁর শিল্পকলায় মানুষের দুঃখ কষ্টকে কখনও প্রকাশ করেন নি।

অন্বেষা : বিনোদবিহারীর অন্যতম ছাত্র সত্যজিৎ বলতেন, 'আমাকে ক্যালিগ্রাফি শিখিয়েছিলেন বিনোদদা'। বিনোদবিহারী সম্ভবত ক্যালিগ্রাফি শিল্প শান্তিনিকেতনে প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর জাপান ভ্রমণের পর - অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে জাপান থেকে ফিরে এসে। সেখানে তাঁর কালি-তুলির কাজ আমরা দেখতে পাই। ক্যালিগ্রাফি এবং প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে বিনোদবাবুকে কতটা এগিয়ে রাখবেন? শান্তিনিকেতনে কী প্রচ্ছদ অঙ্কন এবং ক্যালিগ্রাফির চর্চা এর আগে হয় নি?

সুশোভন অধিকারী: নিশ্চয়ই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা বইগুলোই দেখুন না কেন। সেগুলো কী লিখন শিল্প নয়? রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখাই তো একটা অসাধারণ লিখনশিল্প। রবীন্দ্রনাথের নিজের করা বইয়ের কভারগুলোই দেখুন - *স্ফুলিঙ্গ, গীতাঞ্জলি, মহুয়া, সে, খাপছাড়া, রাখী...* রবীন্দ্রনাথ নিজে যে কভারগুলো করেছেন তাতেও উনি নিজের লেখা নিজেই ব্যবহার করেছেন। ওনার হাতের লেখা তো একটা শিল্প- কী অসাধারণ

ছিল সেই হাতের লেখা। নন্দলাল *ছিন্নপত্রাবলী* এবং *ছিন্নপত্রে*র কভার করেছেন। বিশ্বভারতী হলুদ মলাটের ওপর রবীন্দ্রনাথের লিখনশিল্প দিয়ে যে কভারগুলো করেছে, তা আজও মানুষের মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ হাতের লেখাকে বিভিন্ন কায়দায় বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন। ১৯৮২ সালে *চিত্রাঙ্গদা*র কভার করেছিলেন অবন ঠাকুর। ১৯১২ সালে জীবনস্মৃতির ছবি করেছেন গগন ঠাকুর, সেখানে প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা ব্যবহার করেছেন; তবে এই সমস্ত ক্যালিগ্রাফি আমরা জাপানি বা চাইনিজ ক্যালিগ্রাফির সঙ্গে তুলনা করবো না এবং এটাও ঠিকই, এগুলো জাপানি ক্যালিগ্রাফি নয়। সেই স্টাইলটা অবশ্য বিনোদবিহারী শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসেছেন। তবে একটা কথা মানতেই হবে, অক্ষরশিল্প এবং তার simplicity রবীন্দ্রনাথেরই তৈরি। তবে এ'কথা ঠিক, বিনোদবিহারীর ক্যালিগ্রাফি সত্যজিৎ রায়কে অনুপ্রাণিত করেছে। তবে শুধু সাদা কালো তুলি কলমেরই কাজ নয়, আমি সত্যজিতের রঙিন ছবি অর্থাৎ পেইন্টিংও দেখেছি সন্দীপ রায়ের কাছে, যেটা উনি ছাত্র অবস্থায় শান্তিনিকেতনে থাকার সময় করেছিলেন। কলাভবনের থেকে সত্যজিৎ রায় তো হঠাৎই চলে গেলেন। ওনার ছবির খাতা ইত্যাদি সম্ভবত হারিয়ে গিয়েছে।

অন্বেষা : আপনার কথায় বিনোদবিহারীর রঙের প্রয়োগ বিশেষ করে ইয়েলো ওকার বা পোড়া লাল, সঙ্গে টেরেভার্ট সবুজের ব্যবহার, জার্মান শিল্পী ওট্টো মুয়েলারের (Otto Mueller) বর্ণবিন্যাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। মুয়েলার ছিলেন জার্মান expressionist। তবে কি বিনোদবিহারীর আঁকায় কখনও expressionismএর ছোঁয়া পাওয়া যায়? এব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার কী কোনও ভূমিকা আছে?

সুশোভন অধিকারী: ইয়েলো ওকার বা গেরিমাটির মতো রং বা রাঙামাটির লাল বা টেরেভার্ট গ্রীন ছিল বিনোদবিহারীর প্রিয় রং। বিনোদবিহারী ছিলেন যথার্থ প্রকৃতির শিল্পী তাই প্রকৃতির কাছের রং ওনার সবথেকে প্রিয়। অবশ্য এ অনেকটা অজন্তার প্যালেটও বটে। উনি নিজেই বলেছিলেন, 'আমার শিক্ষক প্রকৃতি। নন্দলাল আমাকে আঙ্গিকের কাজ শিখিয়েছেন'।

অন্বেষা : হ্যাঁ, শিক্ষার সূত্রকে উনি প্রায়ই বিভাজন করে বলতেন যে কোনটা উনি লাইব্রেরী থেকে শিখেছেন, কোনটা নন্দলালের কাছ থেকে শিখেছেন আর কোনটা প্রকৃতির কাছ থেকে শিখেছেন।

সুশোভন অধিকারী: বিনোদবিহারীর মতে উনি যতটা না শিক্ষকদের কাছ থেকে শিখেছেন তার থেকে অনেক বেশি শিখেছেন অরণ্য প্রকৃতির কাছ থেকে। নির্জন দুপুরে শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে প্রকৃতির অন্তরকে অনুভব করেছেন। ওনার ছবিতে পাবেন শুয়োর দৌড়ে যাচ্ছে, রামকিঙ্করের ছবিতেও জীবজন্তু আছে, প্রকৃতির মাঝে একাকার। উনি এমন রঙের ব্যবহার করতেন যা প্রকৃতির রঙের বৈচিত্রের খুব কাছাকাছি হয়। এই ব্যাপারে ওনার সঙ্গে মুয়েলারের বর্ণবিন্যাসের একটা মিল আছে। বলা যেতে পারে মুয়েলারের সঙ্গে বিনোদবিহারীর মিলটা রঙের প্যালেটের দিক থেকে। আর expressionism-এর কথায় যদি আসি, তাহলে তো বলতে হয় শিল্পীর অভিব্যক্তির থেকে উদ্ভূত যে কোনও ছবিই তো এক্সপ্রেশনিজম!

অন্বেষা : একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, স্বয়ং আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে প্রকাশ্যে ছবি আঁকতেন না। মৈত্রেয়ীদেবীকে কিছুটা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'আমার ছবি এ দেশকে দেখাইনি। এখানে অধিকাংশ লোকই ছবি দেখতে জানে না।...সেই জন্যই আমি এখানে ছবি প্রকাশ করতে চাইনে। আমার ছবি এ দেশের জন্যে নয়।' নিজের সৃষ্ট কলাভবনের শিল্প-নীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কী কোনও মতের অসঙ্গতি ছিল? রবীন্দ্রনাথ জীবিতকালীন আশ্রমে তাঁর কোনও একক ছবির প্রদর্শনী হয় নি। কেন? আমরা এমন কোনও ছবি বা বর্ণনা পাইনা যেখানে শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকছেন আর তাঁকে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে তাঁর কাজ দেখছেন। নাকি ওনার প্রভাবটা ছাত্রদের মধ্যে কাঁচা অবস্থায় যাতে না পড়ে সেই বিষয়ে উনি সতর্ক ছিলেন।

সুশোভন অধিকারী: আসলে রবীন্দ্রনাথ কখনও প্রথাগতভাবে ছবি আঁকেন নি। ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথের চীন দেশের বন্ধু সু সিমো যখন শান্তিনিকেতন এসেছিলেন, তখন তাঁর সম্মানে কলাভবনে একটা শিল্প প্রদর্শনীর

আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেই প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথেরও কিছু ছবি ছিল। রবীন্দ্রনাথ নির্মলা কুমারী মহলানবিশকে একটি চিঠিতে তাঁর ছবির প্রদর্শনীর কথা জানিয়েছিলেন। সেই পর্বে 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো যার সম্পাদিকা ছিলেন হেমলতা দেবী। সেই বছরই অর্থাৎ ১৯২৮ সালে 'বঙ্গলক্ষ্মী'র একটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটা ছবি মুদ্রিত হয়। আমরা অবশ্য সেই ছবি কখনও দেখিনি। রবীন্দ্রভবনে 'বঙ্গলক্ষ্মী'র সেই সংখ্যার একটা কপি আছে ঠিকই কিন্তু আশ্চর্যভাবে ছবির প্রচ্ছদের পাতাটা ছেঁড়া! এই ছবি প্রকাশিত হওয়ার পরে আনন্দবাজারে সমালোচনার ঝড় ওঠে এবং রবীন্দ্রনাথের ছবিকে কদর্য ভাষায় নিন্দে করা হয়। আনন্দবাজারের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ এতটাই আঘাত পেয়েছিলেন যে ঠিক করেছিলেন এই দেশে ওনার আঁকা ছবি আর কাউকে দেখাবেন না। ভারতীয় দর্শকের জন্য রবীন্দ্রনাথের ছবির তোরঙ্গ চিরকালের জন্য তখন বন্ধ হয়ে গেল। হয়তো সেই কারণে উনি বলতে চেয়েছেন যে তাঁর ছবি এদেশের দর্শকের জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বারবার করে বলে এসেছেন যে তাঁর আঁকা ছবি প্রথাগত কোনও ভারতীয় শিল্পধারা থেকে উঠে আসে নি। আসলে তিনি যে তখন বিশ্ব শিল্পের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন সেটা বাঙালি দর্শক ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। আমাদের দেশের দর্শকরা তখন সেই ছবি বুঝতে শেখেন নি, তারা বেশিরভাগই বেঙ্গল স্কুলের নরম ছবি দেখে অভ্যস্ত। রঙের ক্ষেত্রে, ভাবনার ক্ষেত্রে বাঙালিদের চোখ তখনও তৈরি হয়নি। এমনকি রাণী বা মৈত্রেয়ী দেবীরাও রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখে 'এ সমস্ত গুরুদেবের খেয়াল' বলে মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন। আসলে এই ছবির সঙ্গে আমাদের কোনও পরিচয় ছিল না। তখন তো আর ডিজিটাল যুগ ছিল না যে পৃথিবীর সমস্ত ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠবে। সুতরাং কোথায় কি হচ্ছে বা কি ছবি আঁকা হচ্ছে সেই সম্বন্ধে বাঙালিদের কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এখানে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে, এখানে অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা প্রভাব ফেলছিল। রবীন্দ্রনাথের লাল আর সবুজ রঙের বিভ্রম ছিল, সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখাটাও একটু অন্যরকম ছিল। একটা

প্যালেট থেকে লাল রংকে যদি ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নেওয়া যায় তাহলে একটা greyish অস্বচ্ছ ভাব ফুটে উঠবে। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সাদা-কালোর contrast সব থেকে সার্থক প্রয়োগ। কালো এবং আলোর দ্বন্দ্ব ওনার ছবিতে বারবার ফুটে উঠেছে। ওনার ছবিতে বিপরীত জিনিসগুলো যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতো। লেখার সময়েও সবসময় উনি কালো কলম ব্যবহার করেছিলেন।

অন্বেষা : রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শিল্পকলার প্রসারের জন্য অত কাজ করেছেন, তবে নিজের বেলায় ওনার শিল্পপ্রতিভার উন্মেষ ঘটাতে এতটা সময় নিলেন কেন?

সুশোভন অধিকারী: এখানে একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। 'ছিন্নপত্রাবলী'র চিঠির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলছেন যে যখন পদ্মার পাড়ে মেঘের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে তখন চতুর্দিকে প্রকৃতির কী বিচিত্র বর্ণ ফুটে উঠছে। সে রং ছড়িয়ে পড়ছে সব দিকে। আর একবার ইন্দিরা দেবীর কাছে বলে ফেলেছিলেন 'সেই রঙের বর্ণনা করা আমার মতো 'রং কালা মানুষের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র'। তাঁর দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতার কথা শুধুমাত্র একবারই ইন্দিরা দেবীর কাছে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সে কথা আর কোথাও উল্লেখ করেন নি। অর্থাৎ ওনার দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা ছিল এবং সেই কারণেই প্রকৃতিকে ঠিক ভাবে ধরতে পারছিলেন না, তাই হয়তো এমন বিলম্ব। সবাই এঁকে চলেছেন - অবন আঁকছেন, নন্দ আঁকছেন, অসিত আঁকছেন, শুধু উনিই ঠিক প্রকৃতিকে ধরতে পারছেন না। এর জন্য তাঁকে সেই সাতষট্টি আটষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অবশেষে বিশ্বশিল্পে যখন সেই আর্ট মুভমেন্ট জাগ্রত হলো, যখন উনি দেখতে পেলেন যে গাছের পাতা মানেই সবুজ নয়, আকাশ মানেই নীল নয়, রঙের ক্ষেত্রে যেটাই মনের ভাব সেটাই রং হতে পারে, যে রংটা শিল্পী express করবেন সেইটাই হবে আসল রং, তখন তিনিও আঁকতে শুরু করলেন। উনি শিখলেন যে শিল্পীর জীবনের expressionটাই বড়, অ্যাকাডেমিক আর্টের মতন হুবহু ইমিটেশন করা নয়। এই expressionism অবশেষে ওনাকে পথ দেখিয়েছে এবং সেই রাস্তা দিয়ে উনি হেঁটে চলেছেন। উনি বলেছিলেন একদিন আমি যদি

আঁকতে পারতাম, তাহলে বিশ্বকে দেখিয়ে দিতাম। ওনার সেই কথাটাই সার্থক হলো। Expressionismএর ধারার কাছে একটা কোনও বিশেষ কাঠামোকে ধরে রাখা যায় না, সব মিলেমিশে এক হয়ে যায়। এর আসল কথা কী? শিল্পীর ভেতরে যে যন্ত্রণাটা আছে সেটা শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করা। রবীন্দ্রনাথের মতন মানুষ, যিনি সারা জীবন ধাক্কা খেতে খেতে চলেছেন, যিনি প্রিয়জনদের মৃত্যুর মিছিল দেখেছেন, যাঁকে ফেলে প্রিয়তম মানুষেরা একে একে চলে গেছেন, প্রিয়জনের অকাল প্রয়াণ তাঁকে দগ্ধ করেছে কিন্তু কাঁদতে পারছেন না - ব্রাহ্ম পরিবারের মানুষকে সংযত তো থাকতেই হবে। অবশেষে expressionism একদিন তাঁকে সেই মুক্তির পথ দেখালো। রবীন্দ্রনাথের মনের দুঃখটা, মনের তাপটা আগ্নেয়গিরির লাভার মতন বেরিয়ে এলো। হয়তো সেই কারণেই শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের আঁকাকে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন volcanic erruption। Expressionism art ওনাকে মনের জোর এনে দিয়েছে, এক নতুন পথের দিশা দেখিয়েছে, সেই পথেই হাঁটতে সাহায্য করেছে। তবে ওনার ক্ষেত্রে expressionism একটা রাবীন্দ্রিক ভাবনা বা রাবীন্দ্রিক কাঠামোয় পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু জার্মানি থেকে মূল্যবান শিল্পকলার বইই সংগ্রহ করেননি, কখনও কখনও জার্মানি থেকে রং কালি আনিয়েছেন ছবি আঁকার জন্যও। তাই জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট ছবির ভাবনার পাশাপাশি তাদের উপকরণও ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্বেষা : কোনও কারণে কি এমন ধারণা করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের শিল্পধারা শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে প্রবাহিত করতে চাননি? সেই কারণেই ছাত্রদের থেকেও তাঁর চিত্রকলাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ?

সুশোভন অধিকারী: রবীন্দ্রনাথের একটা ধারণা হয়েছিল, কলাভবনে নন্দলালের ছাত্ররা তাঁর ছবির ধারাকে বুঝবে কী করে। অবশ্য কলাভবনে সবাইকে তার নিজের মতন করে এগিয়ে চলার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। তবে এখানে একটা চিঠির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৩০ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ প্যারিস থেকে নন্দলালকে লিখেছিলেন। চিঠির

প্রথমেই প্যারিসে তাঁর সাফল্যের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন যে, এতদিনে অফলা একটি গাছে ফল ধরেছে এবং সেই সাফল্য সম্পূর্ণই তাঁদেরই কৃতিত্ব। তবে সবকিছুর শেষে একটা অদ্ভুত কথা উনি লিখেছিলেন, 'আমার চিত্রকলা শান্তিনিকেতনের শিল্পের আদর্শকে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছে'। প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্রনাথের ছবি কি কখনও শান্তিনিকেতনের শিল্পকলার আদর্শ ছিল? অর্থাৎ প্রকারান্তরে নন্দলালকে বলা হলো 'তোমার দরজাটা আরও বেশি করে একটু খুলে দাও'।

অন্বেষা : আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ অনেক বিষয়ে আলোচনা হলো। পাঠকরা নিশ্চয়ই এই আলোচনা থেকে অনেক সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু তবুও কোনও কথা কি বাকি পড়ে গেল? পাঠকদের কি কোনও বিশেষ অজানা তথ্য দিতে চান?

সুশোভন অধিকারী: সমস্ত আর্ট কলেজের বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটা নিজস্ব ঘরানা বা mannerism আছে, যে mannerismকে দেখে সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা যায়। যে কোনও ছবিকে দেখলে পরে তার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঘরানার একটা তকমা লাগানো যায় - যেমন ধরুন এটা লখনৌ আর্ট কলেজের কাজ বা এটা অমুক জায়গার কাজ... ইত্যাদি। কিন্তু শান্তিনিকেতন একমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান যার কোনও বিশেষ মার্কা নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের তাড়নায় শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন যে ছাত্রদের নিজেদের মতন করে গড়ে উঠতে দাও। এখানে একই সঙ্গে নন্দলাল এক রকম ছবি আঁকছেন, রামকিঙ্কর আরেক রকম ছবি আঁকছেন, বিনোদবিহারী আঁকছেন ভিন্ন ধারার ছবি, উদয়ন বাড়িতে একজন মহাশিল্পী সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ছবি এঁকে চলেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে শিল্প ভাবনার বৈচিত্র খুবই বিরল। এখানে একটা নির্দিষ্ট কলসি থেকে সবাই জল তুলে নিচ্ছে না। শান্তিনিকেতনের শিল্পকলা একবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা ধারা, যা বিশ্ব শিল্পের সঙ্গে মিশে যায়। আর কোনও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এই বৈচিত্র আমরা দেখিনি এবং হয়তো বা দেখবোও না।

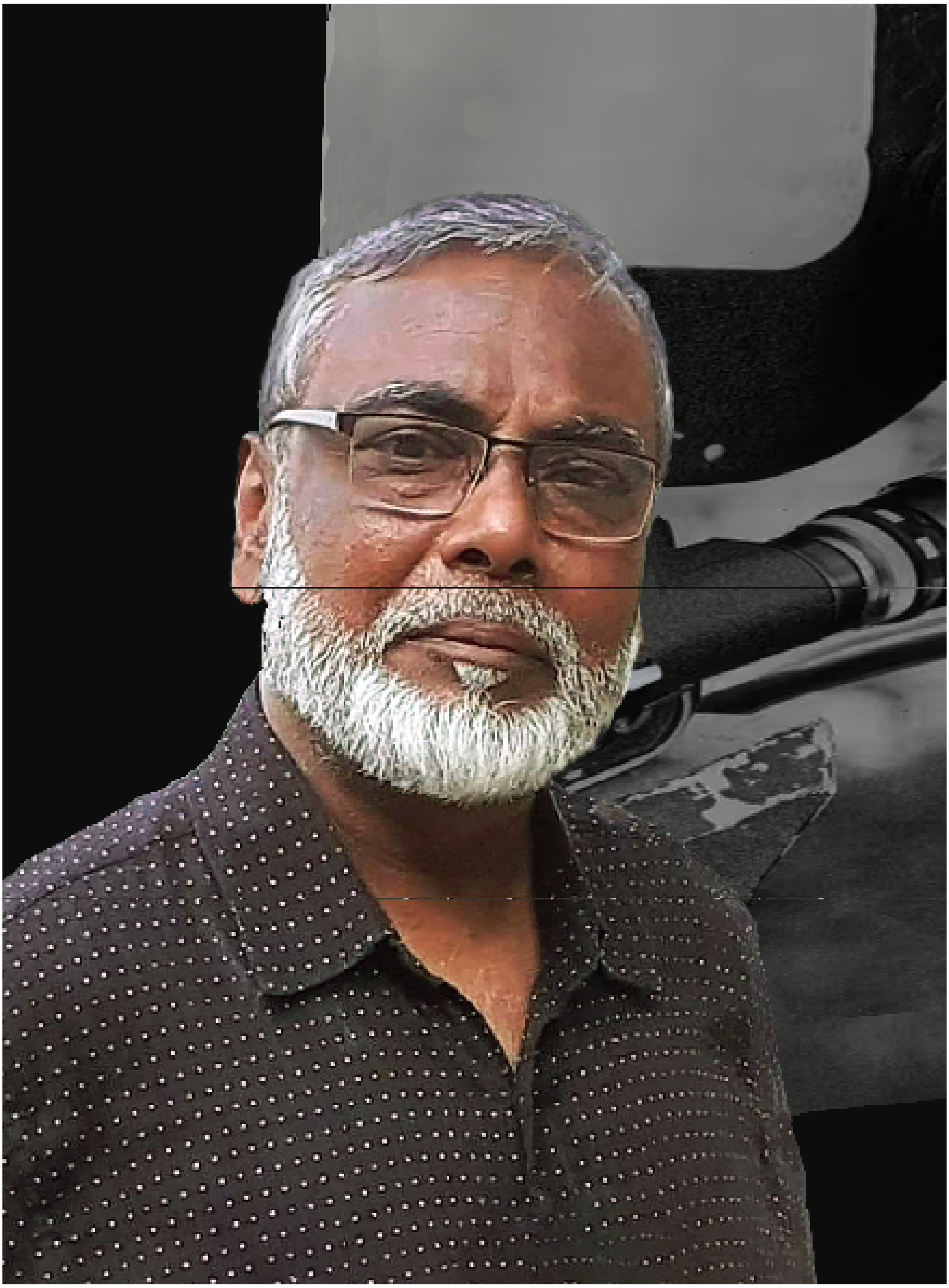

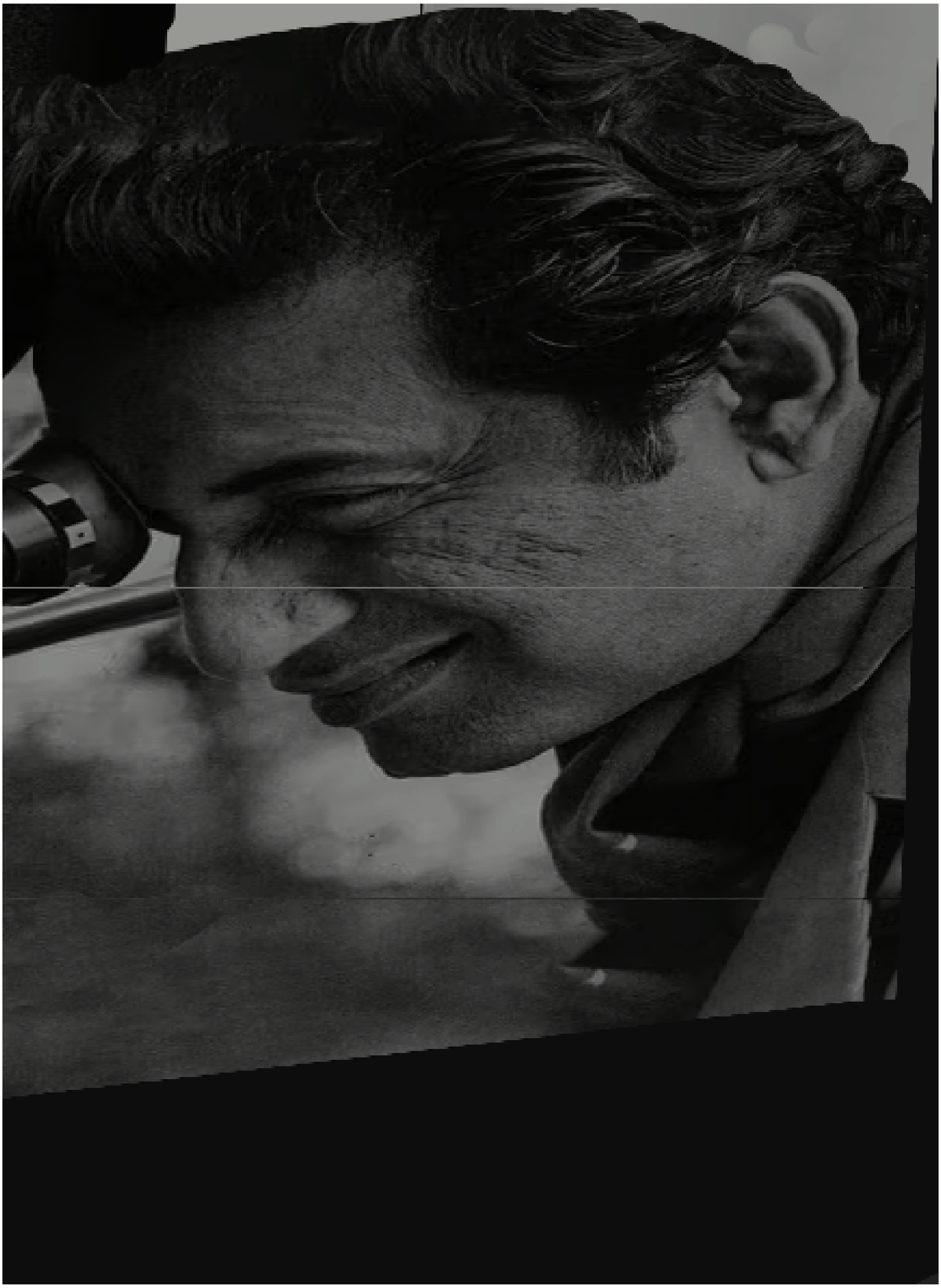

সিনেমায় সত্যজিৎ

TWO
সত্যজিৎ রায়ের
সোনার কেল্লা
চারুলতা
প্রতিদ্বন্দ্বী
দেবী
ganashatru
সীমাবদ্ধ
তিন কন্যা

সত্যজিৎ রায়ের বেশ কিছু কাজে বিনোদবিহারীর প্রভাব আছে, সেই কারণটা অবশ্য খুবই টেকনিক্যাল

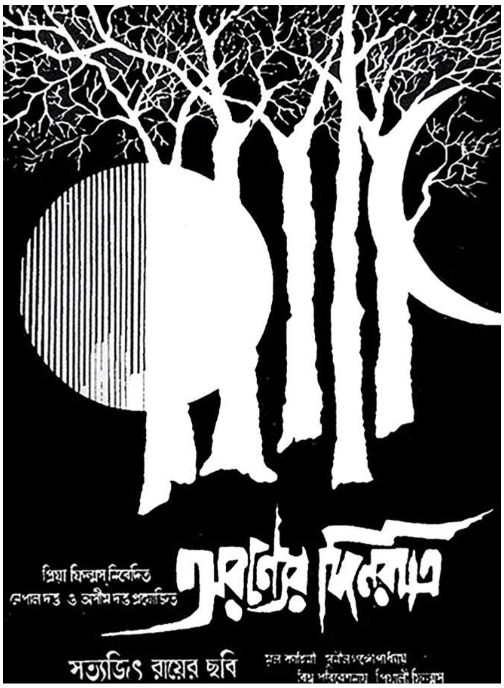

[সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত *সন্দেশ* পত্রিকায় অলংকরণের হাতে খড়ি শিল্পী দেবাশীষ দেবের। সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে উৎসাহ শুরু তখন থেকেই, যা কালক্রমে তাকে গড়ে তুলেছে সত্যজিতের শিল্পসত্তার ওপর একজন বিশিষ্ট গবেষকরূপে। *সন্দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম অলকংরণ জুড়ে ছিল সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজের অনবদ্য অভিজ্ঞতা। এরপর চার দশকের সুদীর্ঘ যাত্রাপথ। শিল্পী জীবনের গোড়া থেকে চাকরি করেছেন অলংকরণ

শিল্পী এবং কার্টুনিস্ট হিসেবে আনন্দবাজার পত্রিকায়, তারপর একে একে *The Telegraph, The Statesman* এবং খুশবন্ত সিং সম্পাদিত *New Delhi*র মতো ভারতের প্রথম শ্রেণীর খবরের কাগজে। স্বনামধন্য এই অঙ্কন শিল্পী নিজেই এখন এক সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তার হাত ধরে নতুন করে প্রাণ পেয়েছে বাংলার কার্টুন শিল্প। অলংকরণ করেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন, তারাপদ রায়, বাণী বসু-সহ বহু বিশিষ্টজনের বইতে। *আঁকায় লেখায় চার দশক, রং তুলিতে সত্যজিৎ, ক্যারিকেচার* এবং *কিছু কথা, বেড়ানোর ডাইরি, ঘুরি বেড়াই ছবি আঁকি, স্কেচবুক দার্জিলিং* সহ অজস্র বইয়ের জনক দেবাশীষ দেব। সত্যজিৎ রায়ের আঁকা নিয়ে তার গবেষণামূলক গ্রন্থ রং তুলির সত্যজিৎ এ বিষয়ে একমাত্র প্রামাণ্য দলিল। সত্যজিতের শিল্পীসত্তা এবং শান্তিনিকেতনে তাঁর সূচনা নিয়ে আমরা প্রশ্ন রেখেছিলাম শ্রী দেবাশীষ দেবের কাছে...]

অন্বেষা ঃ সত্যজিৎবাবুর জীবনের লক্ষ্য ছিল পেশাদারি শিল্পী হওয়া এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রায় আড়াই বছর প্রথাগত ভাবে শান্তিনিকেতনে কলাভবনে তালিম নিয়েছেন। গোড়ার দিকে সিনেমা করার কোনও ইচ্ছে ছিল না, যদিও কলকাতায় থাকতে নিয়মিত ভালো ভালো বিদেশি ছবি দেখতেন। পেশাদারি শিল্পী হিসেবে চাকরি শুরু করেছিলেন তিনি এবং যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ পেশার পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত কেন?

দেবাশীষ দেব ঃ আসলে এটা ঠিকই, সত্যজিৎ রায় প্রথম জীবনে সিনেমা করবেন বলে কখনও ভাবেননি, কিন্তু সিনেমা জগৎ নিয়েই সব সময়ে ডুবে থাকতেন। সিনেমা ব্যাপারটাই ওনার কাছে ছিল সব থেকে প্রিয় বিষয়। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি তো ওনারাই শুরু করেছিলেন। এছাড়া প্রচুর ভালো ভালো বিদেশি সিনেমা নিয়মিত দেখতেন - সে হলিউড সিনেমা হোক, রাশিয়ান সিনেমা হোক বা ইউরোপীয় সিনেমা, জাপানি সিনেমা বা যে কোনও দেশেরই সিনেমাই হোক, কোনও সিনেমাই উনি বাদ দিতেন না। চলচ্চিত্র এবং সংগীতের বিষয়ে সত্যজিৎবাবুর ধারণা ছিল খুবই

স্পষ্ট। অবশ্য হাতে কলমে কোনদিনও সিনেমা করবেন, এমনটা বোধহয় প্রথম জীবনে ওনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। পরবর্তীকালে হাতে কিছু কাজ নিয়ে যখন উনি বিলেতে গেলেন সেখানে বেশ কিছু ভালো ভালো সিনেমা দেখার সুযোগ হয়েছিল। তার মধ্যে *Bicycle Thief* ছবিটা ওনাকে সব থেকে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই থেকে সিনেমার প্রতি ওনার আগ্রহটা আরও বেড়ে গেল। ওনার তখন মনে হলো যে এই ধরনের একটা সিনেমা করা যেতেই পারে। এরও অনেক আগে, ১৯৪৫ সালে, যখন উনি সিগনেট প্রেসের হয়ে ইলাস্ট্রেশনের কাজ করতেন তখন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি গ্রন্থের ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন এবং গ্রন্থটির নাম ছিল আম আঁটির ভেঁপু। এটাই ছিল পথের পাঁচালীর কিশোর সংস্করণ।

অন্বেষা ঃ সেই সময় কি উনি সিগনেট প্রেসে চাকরি করতেন?

দেবাশীষ দেব ঃ না, সেই সময় উনি চাকরি করতেন ডি. জে কিমার নামে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায়, কিন্তু সিগনেটের বেশ কিছু ইলাস্ট্রেশনের কাজে উনি সাহায্য করতেন। বলা যায় উনি ছিলেন সিগনেটের প্রধান অলংকরণ শিল্পী।

অন্বেষা ঃ কিন্তু পেশাদারি শিল্পীসত্তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেননি সত্যজিৎ। ১৯৬১ সালে ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাতে গড়া *সন্দেশ পত্রিকার* পুনরাবির্ভাবের মাধ্যমে পুরোদমে ফিরিয়ে

আনলেন ছবি আঁকিয়ে হিসেবে তাঁর পুরোনো দিনগুলোকে। তার মানে সত্যজিৎবাবুর মধ্যে একজন চিত্রশিল্পী চিরকালই বাস করতো। আপনার কী ধারণা?

দেবাশীষ দেব ঃ অবশ্যই। উনি ইলাস্ট্রেশন ছেড়ে দিলেন, বইয়ের কভার করা ছেড়ে দিলেন এমনকি সিগনেট প্রেস থেকেও সরে এলেন - এটা তো ঘটনা। কিন্তু উনি যখন নিজে সিনেমা করা শুরু করলেন - সেই *পথের পাঁচালী* থেকে একষট্টি সালে *তিন কন্যা* অর্থাৎ নতুন করে সন্দেশ প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত, উনি কিন্তু আঁকার জগৎ থেকে সরে যান নি। ওনার সমস্ত ছবির পোস্টার এবং ছবির বিজ্ঞাপন, সবই উনি নিজেই করতেন। এছাড়াও স্বল্প পরিমাণে হলেও উনি কিন্তু ইলাস্ট্রেশনের কাজ কিছু কিছু তখনও করতেন। অর্থাৎ সিগনেট প্রেস থেকে *সন্দেশ*-এর পুনঃপ্রকাশনা - এই সময়কালে উনি কিন্তু কখনোই শিল্পচর্চা থেকে সরে আসেননি, ছবি আঁকাও চালিয়ে গেছেন। ছবি আঁকার প্রতি ভালোবাসা সত্যজিৎবাবুর মনের মধ্যে চিরকালই ছিল। ১৯৬১ সালে যখন *সন্দেশ* পত্রিকা পুনর্মুদ্রণ শুরু করলেন, সেই সময় থেকে ওনার দুটো কাজ একই সঙ্গে শুরু করলেন - লেখা এবং ছবি আঁকা। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, যখন উনি সিগনেট প্রেসে কাজ করতেন, অথবা সিগনেটের বাইরে কিছু কিছু কাজ করতেন, তখন কিন্তু উনি পুরোপুরি পেশাদারী শিল্পী হিসেবে কাজ করতেন। পরে যখন ফিল্মের জগতে চলে এলেন এবং যখন সিনেমা করাটা ওনার full-time engagement হয়ে দাঁড়ালো, তখনও যে আঁকার কাজগুলো করতেন সেগুলোকে ঠিক পেশাদারী ভাবে করতেন না, কারণ যতদূর জানি তাতে উনি কোনও পারিশ্রমিক নিতেন না, *সন্দেশ*-এর জন্য তো প্রশ্নই ওঠে না। পরবর্তীকালে উনি যখন লেখার জগতে পুরোপুরি চলে এলেন এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেলেন তখন উনি বইতে বা পত্রিকায় নিজের লেখার জন্য পারিশ্রমিকও পেতেন এবং এতে যথেষ্ট ভালো উপার্জন হতে লাগলো। লেখা এবং অলংকরণের কাজ উনি পুরোদমে শুরু করে দিয়েছেন ১৯৬৯-১৯৭০ সালের থেকে।

অন্বেষা ঃ অক্ষরমালার সাহায্যে গড়ে তোলা অজস্র রকমের ক্যালিগ্রাফির কাজগুলো সত্যজিতের অনবদ্য সৃষ্টি। সত্যজিৎ একবার বলেছিলেন, 'আমাকে ক্যালিগ্রাফি শিখিয়েছিলেন বিনোদদা'। বিনোদবিহারী সম্ভবত ক্যালিগ্রাফি শিল্পকে শান্তিনিকেতনে প্রচলন করেছিলেন জাপান থেকে ফিরে এসে

- অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে। বিনোদবিহারীর এই ভাবনা কতটা সত্যজিতের ওপর প্রভাব ফেলেছিলো বলে আপনি মনে করেন, কারণ দুজনের ক্যালিগ্রাফির ডিজাইনে অসম্ভব মিল পাওয়া যায়।

দেবাশীষ দেব ঃ শান্তিনিকেতনে বিনোদবিহারী ক্যালিগ্রাফির প্রচলন করেছেন, কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। এর আগে অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল ক্যালিগ্রাফি নিয়ে চর্চা করেছেন এবং প্রচুর ভালো ভালো কাজ করেছেন। তবে হ্যাঁ, বিনোদবিহারীর কাজের মধ্যে একটা স্বকীয় শৈলী ছিল, একটা অন্য ধারা ছিল এবং এটাও ঠিক যে সত্যজিৎ রায়ের বেশ কিছু কাজে বিনোদবিহারীর প্রভাব আছে, সেই কারণটা অবশ্য খুবই টেকনিক্যাল। বিনোদবিহারী dry brush-এর প্রচুর ক্যালিগ্রাফির কাজ করেছেন। তাঁর dry brush-এর কাজের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে বিশ্বভারতী পত্রিকার কভার ডিজাইন। এই পত্রিকার কভারে উনি 'বিশ্বভারতী' কথাটা এঁকেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন ১৯৪১ সালে আর ঠিক তার পরের বছর থেকেই বিশ্বভারতীর পত্রিকার প্রকাশনার শুরু এবং প্রায় প্রতিটা সংখ্যায় বিনোদবিহারীর কভার থাকতো। দীর্ঘদিন ধরে

উনি বিশ্বভারতী পত্রিকার ডিজাইন করে আসছেন। একবার সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে বিশ্বভারতী পত্রিকার কভার করানো হয়েছিল। সত্যজিৎবাবু অবশ্য ওঁর মতন করে অন্য স্টাইলে কাজ করেছিলেন। এরপর উনি বলেছিলেন যে বিশ্বভারতী পত্রিকার কভারের কাজটা বিনোদদারই করা উচিত, কাজটা ওনাকেই ফিরিয়ে দেওয়া হোক। তাছাড়া সত্যজিৎ রায়ের বেশ কিছু কাজ যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের অলংকরণ ইত্যাদি কাজগুলোর সঙ্গে বিনোদবিহারীর dry brush-এর কাজের বেশ মিল আছে। তবে এটাও ঠিক, সত্যজিৎ রায় ক্যালিগ্রাফিতে বা লেটারিংএ এমন সমস্ত অভিনব কাজ করেছেন এবং ক্যালিগ্রাফি শিল্পে ওনার যে অভূতপূর্ব অবদান বা কন্ট্রিবিউশন, সেই জায়গাটায় অবশ্য বিনোদবাবু যেতে পারেননি, বা বলতে পারেন বিনোদবাবু এই বিষয়ে নিজেকে অতটা ছড়াতে পারেননি। আবার এটাও ঠিক, ক্যালিগ্রাফি নিয়ে অতটা কাজ তিনি করেন নি। এর আরেকটা কারণও আছে। সত্যজিৎ রায়ের কাছে উনি ক্যালিগ্রাফি বলুন বা কভার ডিজাইন বলুন, একসময় এটাই ছিল তাঁর পেশা এবং এই ধরনের কাজে তিনি সর্বোচ্চ জায়গায় নিজের স্থান করে নিতে পেরেছেন। সব থেকে বড় কথা সত্যজিৎ রায় তখন কভার শিল্পী হিসেবে এক বিরাট জায়গায় চলে গেছেন।

অন্বেষা ঃ ৬১ সাল থেকে যখন *সন্দেশ* পত্রিকা বের হতে শুরু হলো, তখন কী উনি পুরোদমে আবার পেশাদারি শিল্পী হিসেবে ফিরে গেছিলেন?

দেবাশীষ দেব ঃ না, ধীরে ধীরে, step by step। প্রথম প্রথম উনি অন্যদের লেখায় অলংকরণ করছিলেন - অন্যদের বই, অন্যদের গল্পে illustrate করছিলেন। এরপর যখন নিজে লেখা শুরু করলেন, তখন তাঁর নিজের লেখার ওপর অলংকরণ করতে শুরু করলেন। ক্রমশ ওনার লেখা জনপ্রিয় হতে শুরু করলো, আরও ব্যাপকতা পেলো, পাশাপাশি ওনার লেখার ওপর ওনার অলংকরণও দারুন ভাবে স্বীকৃতি পেতে থাকলো। ওনার লেখার সঙ্গে ওনার অলংকরণ একপ্রকার বাধ্যতামূলক হয়ে গেলো। সেখানে ওনার অলংকরণ শিল্পে বিস্ময়কর বৈচিত্র আমরা

দেখতে পেলাম। শিল্প জগতে এটা একটা বিস্ফোরণ বলা যায়।

অন্বেষা : বইয়ের ইলাস্ট্রেশনে সত্যজিতের ওপর কার প্রভাব বেশি - বিনোদবিহারী না সুকুমার রায়? নাকি নন্দলাল? ঠিক কতটা?

দেবাশীষ দেব : এটা কখনই খুব নির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় না। একজন শিল্পী যখন আর একজন শিল্পীর কাজে প্রভাবিত হন, তখন তার মধ্যে থেকে নিজস্ব একটা প্রতিফলন বেরিয়ে আসে, অর্থাৎ যে চূড়ান্ত ফলাফলটা আমরা দেখতে পাই সেটা কখনও খুব direct হয় না। ধরুন একজন শিল্পীর কাজে অন্য কোনও শিল্পীর প্রভাব রয়েছে, সেই প্রভাবটা কিন্তু তার ভেতরে ভেতরে অথবা তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব পড়েছে বলা যায়। যেমন নন্দলালের *সহজ পাঠ* - তার একটা প্রভাব পড়েছে সত্যজিতের ওপরেও যেটা আমরা দেখতে পাই *আম আঁটির ভেঁপুর* অলংকরণে। তারপর ধরুন নন্দলালের হরিপুরা কংগ্রেসের পোস্টার। তারও প্রভাব সত্যজিৎ রায়ের ওপর পড়েছে। সত্যজিৎ রায়ের ক্যালিগ্রাফিতে বিনোদবিহারীর প্রভাবের কথাটা তো আগেই বললাম। তবে কার প্রভাব ওনার ওপরে কত, সেটা ঠিক ওজনদাড়ি দিয়ে মাপা যায় না।

অন্বেষা : আর সুকুমার রায়?

দেবাশীষ দেব : সুকুমার রায়ের প্রভাব পড়েছে অন্য দিকে, আঁকায় নয়। সুকুমার রায়ের sense of humour অথবা সুকুমার রায়ের rhymesএর প্রভাব পড়েছিল।

অন্বেষা : তবে কি শান্তিনিকেতনের নিজস্ব শিল্পচর্চার প্রভাব বলা যায়?

দেবাশীষ দেব ঃ না, না... তা ঠিক নয়। বিনোদবিহারীর মধ্যে বেশ খানিকটা বিদেশি স্টাইলও ছিল। এটাকে অনেক ধরনের আঁকার একটা সংমিশ্রণ বা amalgamation বলা যায়। এটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কম বেশি হয়।

অন্বেষা ঃ শঙ্কুর বইতে প্রচ্ছদের বৈচিত্র অনেক, কখনও কমিক স্টাইল, কখনও কোলাজ, কখনও ডিজিটাল গ্রাফিক্স, উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার, তুলনায় ফেলুদা সিরিজে বৈচিত্র কম, অনেক বেশি স্কেচ নির্ভর। এই পার্থক্যের মধ্যে কি চরিত্র রচনার কোনও প্রভাব আছে? না এটা শুধুই coincidence? অপর দিকে ডজন গল্পের প্রচ্ছদে আমরা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ক্যালিগ্রাফি ছাড়া সেই অর্থে কোনও illustration পাইনা।

দেবাশীষ দেব ঃ এটার একটা কারণ আছে। ফেলুদাকে আঁকতে গেলে জটায়ু এবং তোপসে পাশাপাশি এসে পড়ে। ফেলুদাকে নিয়ে কোনও কভার করা মুশকিল - এখানে ব্যতিক্রম অবশ্য ডবল ফেলুদা। Three Musketeers ছাড়া ফেলুদার existence হয় না। শঙ্কুর ক্ষেত্রে এই বাধাটা ছিল না, বলতে পারেন শঙ্কুর সঙ্গে একমাত্র ছিল শঙ্কুর বেড়াল - নিউটন। দেখবেন শঙ্কুর বইতে শঙ্কুর প্রিয় চাকর বা অন্য কোনও চরিত্রগুলো কখনও আসে নি। একটা বইতে রোবটকে এনেছেন, অন্য একটা কভারে কাক বা কর্ভাসকে এনেছেন। কিন্তু এই চরিত্রগুলো এসেছে একটা মাত্র বইতে - এর কোনও পুনরাবৃত্তি হয় নি বা ধারাবাহিকতা ছিল না ফেলুদা সিরিজের মতো। কিন্তু ফেলুদার বইতে ফেলুদার সঙ্গে তোপসে বা লালমোহনবাবু থাকবেনই - সেখানে compositionটা যাই হোক না কেন একটা ধারাবাহিকতা ছিল। ফেলুদার ক্ষেত্রে একটা অন্য স্টাইল ওনাকে তৈরী করতে হয়েছে। তাছাড়া ফেলুদার বেড়ানোর জায়গাগুলো খুব নির্দিষ্ট ছিল, যেমন *টিনটোরেটোর যীশু*তে হংকংয়ের একটা জায়গা এঁকেছেন, *হত্যাপুরীর* কভারে পুরীর সমুদ্র এঁকেছেন, *বাদশাহি আংটি*তে লখনৌ দেখছি আমরা, *গ্যাংটকে গন্ডগোলে* কিছু পার্শ্ব চরিত্র এঁকেছেন, *রয়েল বেঙ্গল রহস্য*তে একটা বাঘের মুখ দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং প্রতিটি ফেলুদার ক্ষেত্রে একটা রেফারেন্স তো ছিলই। শঙ্কুর ক্ষেত্রে কিন্তু সেই রেফারেন্সটা ছিল না। শঙ্কুর বইয়ের নামগুলো দেখবেন, নির্দিষ্ট ভাবে

কিছু বলছে না যেমন *শঙ্কু একাই একশো* বা *মহাসংকটে শঙ্কু* ইত্যাদি। এখানে টাইটেলে সত্যজিৎবাবু গরিলা বা কঙ্গো আনতেই পারতেন, কিন্তু সেটা উনি সচেতন ভাবেই এড়িয়ে গেছেন। শঙ্কুর লেখাতে নানা রকম অ্যাকশন বা চরিত্র কি আসেনি? হ্যাঁ এসেছে। কিন্তু সেগুলোকে সত্যজিৎবাবু এড়িয়ে চলেছেন।

অন্বেষা ঃ পেইন্টিংস নয়, ইলাস্ট্রেশন বা অলংকরণই ছিল তাঁর প্রথম পছন্দ। সেই ভাবে পেইন্টিংস সত্যজিৎ রায়ের হাত থেকে কখনও আমরা পাইনি। বেশির ভাগটাই লাইন ড্রইং এর ওপর ওনার দখল এবং ফলে, অনবদ্য সব অলংকরণের সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথের *রাজ কাহিনী* গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের রাজপুত মিনিয়েচার পেইন্টিংয়ের আদলে সৃষ্টি করেছেন লাইন ড্রইং এর সাহায্যে রাজপুত মিনিয়েচার্স। এবিষয়ে আপনার কী অভিমত?

দেবাশীষ দেব ঃ না, এই অলংকরণের সঙ্গে রাজপুত মিনিয়েচার পেইন্টিংস-এর কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে তো সত্যজিৎবাবু কোনও রং ব্যবহার করেন নি। তাছাড়া দেখবেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাজকাহিনী* যে সময়টাকে ধরেছে, অর্থাৎ আলাউদ্দিন খিলজির এবং পদ্মিনীর সময়কালে, সেই সময়ই তো রাজপুত মিনিয়েচার পেইন্টিংসগুলো হয়েছে। সত্যজিৎ রায় অবনীন্দ্রনাথের বইয়ের অলংকরণগুলো সাদা-কালোয় করেছেন। সেখানে রাজপুত মিনিয়েচার পেইন্টিংস ওই অনুকরণ হবে কেন? আর এর সাথে বেঙ্গল স্কুল অব আর্টের ধারার কোনও সম্পর্ক নেই।

অন্বেষা ঃ সত্যজিতের জীবনের প্রথম প্রচ্ছদ বাবা সুকুমার রায়ের লেখা *পাগলা দাশু* বইয়ের কভার। সেই সময় সত্যজিৎবাবু শান্তিনিকেতনে থেকে পড়াশুনা করছেন। এরপর শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসেই ১৯৪৩ সালে ছোটদের সরস গল্পের সংকলন *ছাতু বাবুর ছাতার* প্রচ্ছদ আঁকেন। সেই সময় সত্যজিৎবাবু সিগনেটে কাজ করতেন না। দেখা যাচ্ছে প্রচ্ছদ আঁকায় সত্যজিৎবাবুর একটা আলাদা আগ্রহ ছিল এবং সেটা ছিল বরাবরই। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও কিছু বলতে পারবেন?

দেবাশীষ দেব ঃ কিছুটা পারিবারিক সূত্র তো ছিলই। তবে উনি আলাদা করে কখনও কিন্তু বলেননি যে প্রচ্ছদ করতে আমার ভালো লাগে। ওঁর মধ্যে illustration বা অলংকরণ করার আগ্রহটাই বেশি করে ছিল এবং সেই বিষয়ে উনি formal শিক্ষার মাধ্যমে আরও ভালো করে শিখতে চেয়েছিলেন। ওঁর পেইন্টিং এর দিকে বা ভাস্কর্যের দিকে কোনও আগ্রহই ছিল না। উনি চেয়েছিলেন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হতে। উনি ইলাস্ট্রেশন করতে ভালোবাসতেন ঠিকই কিন্তু ওনার লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞাপনের কাজ করা। তবে অলংকরণ করতে কেন এত ভালো লাগতো সে ব্যাপারে উনি এক জায়গায় স্বীকার করেছেন যে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে একজন অলংকরণ শিল্পী হিসেবে তিনি সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকতে পারবেন। তাছাড়া বই পত্রের জগতের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হতে পারবেন। ঠিক সেই কারণেই উনি *রংমশাল* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। সন্দেশের অনেক আগেই উনি কামাক্ষ্যা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের রংমশাল পত্রিকার জন্য নিয়মিত ছবি আঁকতেন। সেটা ছিল ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সাল - মোটামুটি সেই সময়টাতে। পত্রিকার জন্য ছবি আঁকতে ওনার ভালো লাগতো। *রংমশালেই* উনি সুন্দর সুন্দর head piece করা শুরু করলেন এবং সুন্দর সুন্দর সব ক্যালিগ্রাফিও করেছিলেন। এই পত্রিকার জন্য উনি বেশ কিছু পিকটোগ্রাফও করেছিলেন।

অন্বেষা ঃ আচ্ছা pictography ব্যাপারটা কী একটু বুঝিয়ে বলবেন?

দেবাশীষ দেব ঃ Pictography একটু অন্য ধরনের ক্যালিগ্রাফি বলতে পারেন, যেখানে আপনি লেটারিংটা করছেন কিন্তু সেই লেটারিংটা একটা ছবির আকৃতি ধারণ করছে। যেমন *সন্দেশ* লেখাটা একটা হাতি হয়ে গেছে। এরকম অজস্র উদাহরণ আছে। অনেকেই লেটারিং দিয়ে ছবি এঁকেছেন, পূর্ণেন্দু পত্রীও করেছেন, কিন্তু সত্যজিৎ রায় পিক্টোগ্রাফিকে যে স্তরে নিয়ে গেছেন, সম্ভবত সেই স্তরে কেউ পৌঁছতে পারেনি।

অন্বেষা ঃ আপনি পূর্ণেন্দু পত্রীর নাম করতে মনে পড়লো যে সত্যজিৎ রায়ের পরেই পূর্ণেন্দুবাবুই ছিলেন একাধারে শিল্পী সাহিত্যিক এবং

চলচ্চিত্রকার। আপনার আর কারোর নাম মনে পড়ে যিনি সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সমানভাবে শিল্পচর্চা করে গেছেন?

দেবাশীষ দেব ঃ হ্যাঁ, পূর্ণেন্দুদার নাম যেমন করলাম, তেমনি আরও অনেকেই শিল্পচর্চা এবং সাহিত্যচর্চা সমান ভাবে করে গেছেন। একটা সময় কিন্তু সাহিত্যিক এবং শিল্পী, মোটামুটিভাবে অনেকেই ছিলেন - যেমন ধরুন শৈল চক্রবর্তী। শৈল চক্রবর্তী যেমন সুন্দর লিখতেন তেমন সুন্দর আঁকতেন। হিমানীশ গোস্বামীর নাম এই প্রসঙ্গে আসবেই, পরের দিকে কৃষ্ণেন্দু চাকি খুব ভালো ইলাস্ট্রেটর হয়েছিলেন এবং প্রচুর লেখালেখিও করেছেন। আমাদের সময়ের শিল্পীদের মধ্যে কৃষ্ণেন্দুই সব থেকে বেশি সাহিত্য ঘেঁষা ছিলেন এবং নিয়মিত সাহিত্যচর্চাও করতেন, অনেক বইও লিখেছেন।

অন্বেষা ঃ হ্যাঁ, বাদল বসুও তার বইএ বারবার বলে এসেছেন যে সত্যজিৎবাবু তাঁর নিজের লেখায় নিজেই অলংকরণ এমনকি লেআউট পর্যন্ত করে দিতেন, ফলে অন্যান্য লেখকদের থেকে সত্যজিৎ রায়ের লেখা ছাপতে আমাদের অনেক সুবিধা হতো। সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে আরও কিছু নতুন তথ্য পাঠকদের শোনাতে চান, যেটা আমাদের আলোচনায় আসে নি?

দেবাশীষ দেব ঃ বিনোদবিহারীর সঙ্গে সত্যজিৎবাবুর সূত্রটা মূলত ক্যালিগ্রাফিকে ঘিরে আর ক্যালিগ্রাফিই একসময় সত্যজিৎ রায়ের ধ্যান জ্ঞান ছিল বলা যায়। এমনকি আমার ধারণা ইলাস্ট্রেশনের থেকেও ক্যালিগ্রাফি - যাকে আমি অক্ষরশিল্প বলি, এই অক্ষরশিল্প নিয়ে কাজ করতে বেশি ভালবাসতেন সত্যজিৎ। এখানে একটা নমুনা দিচ্ছি - যেমন ধরুন *সন্দেশ*। এই *সন্দেশ* পত্রিকার যে লোগোগুলো করতেন, সেগুলোই দেখুন - একেক সময় একেক রকম লোগো। কী অসাধারণ বৈচিত্র! সে ক্ষেত্রে আমরা হলে কী করতাম বা সাধারণ একজন শিল্পী কি করবে? অনেক খেটে খুটে একটাই লোগো তৈরি করবে সেটাই সারা জীবন পত্রিকায় চলতে থাকবে। সত্যজিৎবাবু কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত সন্দেশের লোগো পাল্টাতেন, পাঠকদের নতুন নতুন লোগো উপহার দিতেন। আমার বইতেই দেখবেন *সন্দেশ* পত্রিকার আমি

দশখানা লোগোর ছবি দিয়েছি। তারপরই দেখুন *ছোটদের হাত পাকাবার আসর* কথাটা উনি কত রকমভাবে লিখেছেন। হাত পাকাবার আসর *সন্দেশ*-এর একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বিভাগ। আরেকটা খুব প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হচ্ছে ওনার *কাঞ্চনজঙ্ঘা* ছবির টাইটেলে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' লেখাটা। সেই লেখাটা উনি কত ভাবে লিখেছেন। পোস্টারে এক রকম ভাবে লিখেছেন, টাইটেল কার্ডে আবার অন্যরকম - তখন আবার ভিন্ন ধরনের অক্ষরশিল্প যোগ করলেন। সুতরাং একই জিনিস বারবার নানা রকম ডিজাইনে করতে ভালবাসতেন সত্যজিৎ। এক কথায় উনি লোগো নিয়ে খেলতেই ভালবাসতেন। আরেকটা বড় উদাহরণ - *এক্ষণ* পত্রিকার লোগো। কত রকম ভাবে *এক্ষণ* পত্রিকার লোগোটাকে এঁকেছেন। এত ধরনের লোগো তৈরী করতে ওনাকে কেউ অনুরোধ করেছিলেন বলে মনে হয় না। এটা নিজে থেকেই উনি নানা ধরনের অক্ষরশিল্পের মাধ্যমে *এক্ষণ* কথাটা লিখেছিলেন। বলা যায় এটা উনি স্বতস্ফূর্তভাবে করতেন। লোগো নিয়ে পরীক্ষা করতে ভালবাসতেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যেক বছর নতুন নতুন ভাবে *এক্ষণ* পত্রিকার ডিজাইন করে দিতেন। কোনও সন্দেহ নেই অক্ষরশিল্পী হিসেবে সত্যজিৎ রায়কে আমি সবার উপরে রাখবো।

অন্বেষা ঃ সত্যজিৎ রায়ের টাইটেল কার্ড ডিজাইন নিয়ে কিছু কথা বলুন।

দেবাশীষ দেব ঃ সত্যজিৎবাবুর টাইটেল কার্ডের ব্যাপারে বলতে গেলে একটা কথাই বলতে হয় যে, সব ছবিতেই যে উনি সমানভাবে খেটেছেন সে কথা বলবো না। আমার খুব মজা লাগে *অরণ্যের দিন রাত্রির* টাইটেল দেখে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে আর জানলা দিয়ে জঙ্গলটাকে দেখা যাচ্ছে। প্রথমে টাইপটা পড়ল, তারপর গাড়িটা যত চলছে আস্তে আস্তে সেটা রিভার্স হয়ে গেল। যে টাইপগুলোর মধ্যে দিয়ে দর্শককে জঙ্গলটা দেখতে হচ্ছে, সেটা একটু মোটা মোটা ধরনের। পরবর্তীকালে সন্দীপ রায় *রয়েল বেঙ্গল রহস্যতে* অনেকটা একই ধরনের টাইটেল করেছিলেন। *রয়েল বেঙ্গল রহস্যতে* সন্দীপ রায় কিন্তু ফন্ট টাইপের কোনও পরিবর্তন করেননি, সেটা অনেকটা *অরণ্যের দিন রাত্রির* মতোই

রেখেছেন। তবে *অরণ্যের দিন রাত্রি*তে সত্যজিৎ একটা নতুন টাইপ নিয়ে এসেছিলেন এবং সেই টাইপটা করা যে কী কঠিন, সেটা যারা বাংলা টাইপ নিয়ে বিন্দুমাত্র কাজ করেছেন, তারাই ভালো বুঝবেন। যেমন শমিত ভঞ্জ। ওই নিওয়ে'জটা ওরকম মোটা মোটা করে লেখা যে প্রায় অসম্ভব, সেটা টাইপ নিয়ে কাজ করলেই বোঝা যায়।

অন্বেষা ঃ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি এক্ষুণি বললেন। সেটা হচ্ছে লেটার ফন্ট। সত্যজিৎ রায় কী কী নতুন লেটার ফন্ট করেছিলেন সেই নিয়ে একটু বলুন।

দেবাশীষ দেব ঃ হ্যাঁ, উনি অনেকগুলো নতুন লেটার ফন্ট সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেগুলো সবই ইংরেজিতে - যেমন Ray Roman বা Ray Bizarre। বাংলায় অবশ্য কোনও ফন্ট উনি করেননি। একটা কথা ভাবলে অবাক লাগে, মানুষটা তাঁর নিজের চলচ্চিত্রের কাজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন আর আমরা আজকে ওনার যে কাজ নিয়ে আলোচনা করছি তার সব কিছুই কিন্তু উনি করেছেন তাঁর নিজস্ব কাজের বাইরে। অর্থাৎ ওনার অবসরের সময় যে কাজগুলো উনি করেছেন সেগুলোর গুণমান যে কোনও পূর্ণসময়ের পেশাদারি শিল্পীর থেকে এগিয়ে আছে! আবার দেখুন, উনি যখন পেশাদারি শিল্পী হিসেবে সিগনেট প্রেসেও কাজ করতেন এবং পরবর্তীকালে কাজের অবসরে উনি যখন সন্দেশে বা অন্য কোনও কাগজের ইলাস্ট্রেশন করতেন, তখন কিন্তু তাঁর কাজের ধারা অনেকটাই পাল্টে গেছে। সুকুমার রায়ের *খাই খাই*তে উনি যে ইলাস্ট্রেশনগুলো করেছিলেন কিংবা *হাতেখড়ি*তে যে ইলাস্ট্রেশনগুলো করেছিলেন সেই স্টাইলগুলো কিন্তু পরবর্তীকালে উনি আর করেননি। তবে এতে কিছু এসে যায় না। উনি শঙ্কুতে যে কাজগুলো করেছিলেন, সেই কাজগুলো চিরকালের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে থাকবে। Pen and Inkএ উনি যেভাবে কাজ করেছেন সেটা অকল্পনীয় আর ওনার ড্রয়িং তো ভাবাই যায় না, কী অসাধারণ সেই সমস্ত কাজ!

অন্বেষা ঃ ওনার কি তুলি-কালির কাজ আছে?

দেবাশীষ দেব ঃ হ্যাঁ, অনেক আছে। বিশেষ করে সিগনেট প্রেসে যখন কাজ করতেন,

তখন *পাগলা দাশু* বা *বহুরূপীর* ইলাস্ট্রেশনগুলো তুলি কালিতে করেছিলেন। আসলে উনি অনেক ধরনের কাজ করেছেন যা এই স্বল্প পরিসরে বলা যাবে না। শুধু *সন্দেশ*-এর জন্যই যে উনি কতো ধরনের কাজ করেছেন, সেই ভ্যারাইটি নিয়েই বলতে গেলে আজ আর শেষ হবে না। আরেকটা ওনার বৈশিষ্ট ছিল যেটা ভারতবর্ষে অন্য কেউ করেছেন কিনা জানা নেই, সেটা হচ্ছে ইলাস্ট্রেশনের সঙ্গে মিলিয়ে বা সামঞ্জস্য রেখে উনি নিজের সইটা করতেন। সত্যজিৎবাবু টাইপ নিয়ে নানা ধরনের মজা করতে ভালোবাসতেন, খেলতে ভালবাসতেন। যে স্টাইলে উনি আঁকছেন আবার সেই স্টাইলেই উনি সই করছেন। আমার বইতে এই ব্যাপারে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

জন্মান্ধের কাছে 'inner eye' বলে কিছু থাকে না

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

['বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় যখন শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন সেই সময় থেকেই ওনার দৃষ্টিশক্তি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। জন্ম থেকেই ওনার একটি চোখে দৃষ্টি ছিল না, অন্য চোখটিও ছিল বেশ খারাপ। মাস্টারমশাই নন্দলাল বিনোদবিহারীর ব্যাপারে প্রথমে খুব যে আগ্রহী ছিলেন তা কিন্তু নয়। শুধু রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন শিল্পীর ছবি আঁকা শুধুমাত্র চোখে দেখেই হয় না, মন দিয়েও ছবি আঁকতে হয়। কিন্তু শিল্পীর দুর্ভাগ্য, যখন তাঁর শিল্পীসত্তা পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত হয়েছে, সেই সময় অর্থাৎ তাঁর মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে শিল্পী হারালেন তাঁর দু চোখের দৃষ্টিকে। এর পরেও কিন্তু বিনোদবিহারী তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত ছবি আঁকা এবং নানা ধরনের শিল্পসৃষ্টির কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

বিনোদবিহারীর সঙ্গে আমাদের মূল পার্থক্য একটাই। রং, রূপ, আকার বা আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের কোনও অভিজ্ঞতাই নেই, যেটা ওঁর ছিল। সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরেও বিনোদবিহারী ছবি এঁকেছেন, তাঁর ম্যুরাল চিত্রে রঙের প্রয়োগ করেছেন, সেটা কিন্তু করেছেন সম্পূর্ণ তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে। উনি প্রকৃতির দৃশ্য এঁকেছেন মনের কোঠায় সঞ্চয় করা স্মৃতি থেকে সংগ্রহ করে। আমরা যারা জন্মান্ধ, তারা কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ লাল রংটা দেখতে কেমন, বিনোদবাবুর স্মৃতিতে ধরা আছে, কিন্তু আমাদের মনের কোঠায় লাল রঙের কোনও অস্তিত্ব নেই। আমরা নাম শুনেছি 'লাল' রঙের, কিন্তু সেটা কেমন 'দেখতে', তার অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের নেই। মনে করুন সাদা রং কেমন দেখতে হয়, সেটা বোঝাতে আপনি বলবেন 'বকের মতো সাদা'। এবার বক কেমন দেখতে হয়? সে উত্তর আমাদের কাছে নেই বা তার অভিজ্ঞতা আমাদের হয় নি। গোলাপের রং যে লাল হয়, সেটা আপনি দেখেছেন। এবার চোখ বুজে মনে করে দেখুন, আপনি কিন্তু লাল রংটা দেখতে পাবেন। অপরদিকে আমরা লাল রঙের কথা শুনেছি, কিন্তু সেটা দেখতে কেমন তা জানি না। রঙের নাম

আমরা শুধু মুখস্ত করেছি, কখনও সেটা উপলব্ধি করিনি। আমরা শুধু স্পর্শ করে বস্তুকে 'দেখতে' শিখেছি। আমরা একটাই রং দেখেছি আর সেটা হচ্ছে কালো অর্থাৎ অন্ধকার - বিজ্ঞানের ভাষায় যে রঙের কোনও অস্তিত্ব নেই! সুতরাং জন্মান্ধের কাছে 'inner eye' বলে কিছু থাকে না'।

এবারের অন্বেষা পত্রিকার সংখ্যা বিনোদবিহারীকে নিয়ে লেখা হচ্ছে শুনে নিজের অভিজ্ঞতার কথা এভাবেই ব্যক্ত করেছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমির শিক্ষক এবং এই প্রজন্মের 'বিনোদবিহারী'দের স্রষ্টা, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ইন্দ্রদা নামেই স্কুলের কর্মীদের কাছে সুপরিচিত। ইন্দ্রদা নিজেই জন্মগত দৃষ্টিহীন। আমরা অন্বেষা'র তরফে গিয়েছিলাম নরেন্দ্রপুরের ব্লাইন্ড স্কুল চত্বরে, কোনও এক 'বিনোদবিহারী'র খোঁজে। যে বছর বিনোদবিহারীর চোখের শেষ আলোকবিন্দুটি চিরতরে নির্বাপিত হলো, অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে, সেই বছরই বাংলার অপর প্রান্তে ১১ একর জমির ওপর বিস্তৃত এক মনোরম সবুজ প্রাঙ্গণে যাত্রা শুরু করেছিল 'রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমি' যার মূল লক্ষ্য দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জীবনমুখী শিক্ষা প্রদান করা। স্কুলের অধ্যক্ষ রাজদীপ মহারাজ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে গেছিলেন এক অদ্ভুত জগতের অন্দরমহলে। সেখানে আমাদের সঙ্গে পরিচয় হল ইন্দ্রদার এবং এক ঝাঁক উজ্জ্বল ছাত্রদের সঙ্গে। এই স্কুলে ক্লাস ওয়ান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করানো হয়। আমাদের জানতে ইচ্ছে হয় কেমন ভাবে তৈরী হচ্ছে ভবিষ্যতের 'বিনোদবিহারী'রা? ব্যাখ্যা করলেন স্বয়ং ইন্দ্রদা...]

আমরা যারা সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন তারা সাধারণভাবে পারিপার্শ্বিক যে দৃশ্যগুলো আছে, সেগুলো দেখতে সক্ষম নই, এক যদি না আমাদের মধ্যে কারও কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুটা হলেও থেকে থাকে। অর্থাৎ যদি পূর্বে দৃষ্টি ছিল এমন কেউ থাকে, তাদের মধ্যে কিছুটা হলেও ভিজুয়াল বা দৃষ্টিলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে যায়। কিন্তু যারা জন্মগতভাবে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন, অর্থাৎ জন্ম থেকেই তাদের বাড়তি কোনও অভিজ্ঞতা দর্শনগত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের মধ্যে প্রবেশ করেনি বা মস্তিষ্কে কোনও ছাপ বা ইম্প্রেশন তৈরি করতে সক্ষম হয় নি, তাদের কাছে বাস্তবে যে জিনিসগুলো আমরা দেখি সেই সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। সাধারণভাবে বলা হয় যে আমাদের আশি শতাংশ জ্ঞান নাকি দর্শন দিয়ে বা দর্শন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। তাই যদি

হয় তবে জন্মগত দৃষ্টিহীনরা পৃথিবীর রূপ রসের একটা বড় অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণভাবে। কিন্তু আমি সেটা মনে করি না যে ৮০ শতাংশ জ্ঞান আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়র মাধ্যমে বা চোখের সাহায্যে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয় সেটা ঠিক নয়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক যে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে - যেমন স্পর্শ ইন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা স্বাদেন্দ্রিয়, এগুলোর সাহায্যে আমরা পারিপার্শ্বিক জ্ঞানকে অর্জন করতে পারি, তার থেকে কিছুটা হলেও যারা partial বা স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন তারা পারিপার্শ্বিক দৃশ্যগত অভিজ্ঞতাকে খানিকটা হলেও বেশি করে অর্জন করে থাকে। তারা কিন্তু সম্পূর্ণ জন্মগত দৃষ্টিহীনদের থেকে কিছুটা হলেও সমৃদ্ধ হয়।

এই বিষয়ে Concept formation নামে আমাদের একটা সাবজেক্ট আছে যা plus curriculum বা compensatory curriculum হিসেবে আমরা ব্যবহার করি। Plus curriculum কেন বলছি তার কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে curriculum আছে তার সঙ্গে এটা একটা অতিরিক্ত curriculum হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাই একে plus curriculum বলা হয়। আবার পাশাপাশি Compensatory curriculum হিসেবেও বলি কেননা আমাদের দৃষ্টিজনিত যে ঘাটতিটা আছে, সেটা পূরণ করার জন্য আমাদের অতিরিক্ত কিছু concept দেওয়া হয়। সেই কারণে এই concept formationকে আমরা Compensatory plus curriculum হিসেবে অভিহিত করতে পারি। আমরা সাধারণভাবে যে জিনিসগুলোকে দেখে থাকি সেগুলো সাধারণত three dimensional না হলে আমাদের মতো জন্মান্ধদের অসুবিধা হয়। যারা চোখে দেখতে পান তারা two dimensional একটা ছবিকে সম্পূর্ণ ভাবে three dimensional হিসেবে দেখতে পারেন। তার দৈর্ঘ্য, তার প্রস্থ এমন কি তার গভীরতা বা উচ্চতা - সেটাও colour conceptএর মাধ্যমে আলাদা আলাদা করে তাদের বোঝানো সম্ভব হয়। অর্থাৎ two dimensionএর মাধ্যমেও সাধারণ দৃষ্টির মানুষ three dimension ব্যাপারটা বুঝতে পারেন বা তাদের বোঝানো সম্ভব হয়। কিন্তু দৃষ্টিহীনদের কাছে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। তাদের three dimensional মডেলের সাহায্যে না বোঝালে তাদের সেই অভিজ্ঞতাটা দেওয়া সম্ভব হয় না। যেমন একজন দৃষ্টিহীন মানুষকে একটা হাতির যদি ধারণা দিতে হয়, তাহলে তাকে একটা মডেলের সাহায্যে বোঝাতে হবে। তাকে হাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আলাদা আলাদা করে ছোট ছোট আকৃতির মডেলের সাহায্যে চিহ্নিত করতে হবে। সাধারণভাবে একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের যে ধারণা আছে সেই ধারণাটা একজন দৃষ্টিহীন

মানুষকে বোঝাতে গেলে মডেলের সাহায্যে হাতি বস্তুটা কী, সেটা উপলব্ধি করাতে হবে। মডেলের সাহায্যে তাকে বোঝাতে হবে যে এটা শুঁড়, এটা মাথা, এটা তার পা ইত্যাদি। সেই জন্য একটা ছোট হাতির মডেলকে সামনে রেখে যদি বোঝানো যায় তাহলেই সেই দৃষ্টিহীনকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করানো যায় যে সমগ্র হাতিটা কেমন দেখতে। তাছাড়া এই মডেলটা একটু প্রকৃত হাতি থেকে কত গুন ছোট সেটা যদি বলে দেওয়া যায়, তাহলে একটা সামগ্রিক ধারণা তার হতে পারে।

অপর পক্ষে দৃষ্টিহীনদের একটা ভাইরাসের মডেল আমরা করে দেখাতে পারি। ভাইরাসকে হাতের স্পর্শে বা খালি চোখে সাধারণ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের পক্ষেও দেখা সম্ভব নয় অথবা ভাইরাসকে দেখতে আলাদা করে মাইক্রোস্কোপ জাতীয় কোনও যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু ভাইরাসের আকৃতি কেমন হয় সেটা যখন একজন দৃষ্টিহীনকে বোঝাতে হয়, তখন ভাইরাসের একটা বড় মডেলের সাহায্যে সেটা বোঝানো সম্ভব হয়। পাশাপাশি তাকে এটা বলে দেওয়া প্রয়োজন যে এই মডেলটা প্রকৃত ভাইরাস থেকে কত গুন বড়, তাহলে তার একটা স্বচ্ছ ধারণা হতে পারে যে ভাইরাসটা ছোট অবস্থায় কী রকম দেখতে হয়।

সেজন্য আমাদের এখানে ক্লে মডেলিং করি অর্থাৎ 'প্লাস্টিসিন' বা এক ধরনের প্লাস্টিকের মাটি পাওয়া যায় যেটা অনেকটা কাঁচে লাগানোর পুটিং-এর মতন দেখতে হয়, সেটাকে ব্যবহার করে আমরা মডেলিং এর কাজে ছাত্রদের নিযুক্ত করে থাকি। এর জন্য নির্দিষ্ট একজন মাস্টারমশাই থাকেন। তিনি প্রকৃত একটা ফল বা একটা জন্তু বা একটা মাছ বা যে কোনও জিনিস বাস্তবে যে রকম দেখতে হয়, সেভাবে মডেল তৈরি করে ছাত্রদের বুঝিয়ে দেন। সেই ভাবে ওদের মধ্যে একটা কিছু তৈরি করার বা আঁকার একটা প্রচেষ্টা পূরণ করা হয়। যেমন একটা জামরুল কী রকম দেখতে হয়, সেটার একটা মডেল তৈরি করে ছাত্রদের বোঝানো হয়। ঠিক সেরকমই একটা আপেল বা আম কেমন দেখতে হয় সেটাও মডেলের সাহায্যে আমরা ছাত্রদের বোঝাই। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ফলকে যেন ছাত্ররা differentiate করতে পারে। যদিও তারা যে কোনও ফল হাতে নিলে তার গন্ধ পাবে, কিন্তু তবুও তার আকৃতিকে স্পর্শ করে তারা সনাক্ত করতে পারবে যে ফলটি আসলে কী। এমনকি একটা আম হয়তো কাঁচা অবস্থায় আছে এবং তার গন্ধ পাচ্ছে না তবুও সেই বস্তুটি যে আম সেটা স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ছাত্ররা সনাক্ত করতে পারে। অর্থাৎ মডেলের সাহায্যে বার বার

সেই বস্তুটিকে সনাক্তকরণ করতে পারে বা যে কোনও বস্তুর আকৃতিকে স্পর্শ করলে তারা বুঝতে পারে আসলে বস্তুটি কী। ঠিক সেরকমই একটা জন্তু কেমন দেখতে হয়, একটা বাঘ বা হাতির আকৃতি কেমন হয় সেটা মডেলের সাহায্যে তাদের বোঝানো হয়। প্রকৃতপক্ষে অনেক সময় বাজারে গিয়ে যে জিনিসগুলোকে কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলোকে কিনে এনে তাদেরকে বস্তুগুলোর আকৃতির concept দেওয়া হয়। এভাবে আমাদের শিক্ষাটা দেওয়া হয়। যেমন ধরুন বিভিন্ন রকমের ডাল কিভাবে নির্ণয় করা হবে, সেটা ছোট ছোট বাটিতে বিভিন্ন ধরনের ডালের নমুনা রেখে তাদের স্পর্শ করতে দিয়ে সেই বিভিন্ন ধরনের ডাল তাদের চিনিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক সে রকমই বিভিন্ন ধরনের মাছের বিভিন্ন রকম আকৃতি এবং আকার আছে। যেমন রুই মাছ না কাতলা মাছ - তার মাথাটা স্পর্শ করলে তারা বুঝতে পারে। রুই মাছের মাথাটা একটু সরু হয়। কাতলা মাছের মাথাটা একটু চওড়া হয়। সেগুলো স্পর্শ করে সে বুঝতে পারে যে এটা কাতলা মাছ না রুই মাছ। এই যে দুটো বস্তুর মধ্যে differentiate করার ক্ষমতা সেটাকে আমরা বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলি critical attribution। একটা জিনিসকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা - যেমন একটা টেবিল বা একটা চেয়ার বা একটা ছোট টুল - সবই কিন্তু চারপায়া। কিন্তু চারপায়া হলেই যে টেবিল হচ্ছে বা চারপায়া হলেই যে চেয়ার হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। একটা গোল টেবিল আর একটা গোল টুল একই আকৃতির দেখতে হয়। কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের যে পৃথকীকরণ করা যায়, সেই পদ্ধতিটাই দৃষ্টিহীনদের শেখানোর জন্য আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করি। আমরা সেই ভাবেই তাদের শিক্ষিত করি এবং ছোটবেলা থেকে concept development-এর সাহায্যে ওদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমরা চেষ্টা করি manual coordination বা হাতের স্পর্শ ঠিক মতন আসছে কিনা, ছোট আঙুল দিয়ে তারা সেই জিনিসটাকে উপলব্ধি করতে পারছে কিনা সেটার দিকে লক্ষ্য রাখার। এর জন্য ছোট ছোট প্লাস্টিকের এক ধরনের ব্লক পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে ঘর বাড়ি তৈরি করা বা ছোট ছোট গাড়ি তৈরি করা - সেটা দৃষ্টিহীন ছাত্রদের শেখানো হয়। এমনকি প্লাগ পয়েন্টে কিভাবে তার বদলানো হয় বা তার লাগানো হয় - যেগুলো আমরা ছোটবেলা থেকে শিখেছি, সেগুলোকেও শেখানো হয়। একটা তারকে একটা প্লাগের মধ্যে কিভাবে তিনটে পয়েন্ট ঢোকানো হয়, একটা আর্থ, একটা নেগেটিভ এবং একটা পজিটিভ, সেটাকে আলাদা করে identify করতে শেখানো হয়। একটা ছোট স্ক্রু দিয়ে একটা স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে সেটাকে বন্ধ করা

হয়, সেই সমস্ত মডেলের সাহায্যে দৃষ্টিহীনদের শেখানো হয়। সেগুলো আঙুলের স্পর্শ দিয়ে তারা সনাক্ত করতে পারে এবং সেগুলোকে ব্যবহার করে কাজও করতে পারে। এখনকার পিয়ানো সুইচগুলো লাগানো বেশ কঠিন। তাতে আবার গোল গোল পিন হয়, সেটা হাতের সূক্ষ্ম অনুভূতির মাধ্যমে তারা চিহ্নিত করতে পারে। অনেক দৃষ্টিহীনরা কারখানায় কাজ করছে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের ফাইল ব্যবহার করা হয়। তারও সনাক্তকরণ এবং ব্যবহার পদ্ধতির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আমরা করি। যেমন Dead Smooth File, Bastard File, Second-cut File, ইত্যাদি অথবা আকৃতির দিক থেকে হয় Triangular File, Half-Round File, Square File, Round File - এরকম বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন মাপের ফাইল হয় যেগুলো ওরা হাতের স্পর্শে, আঙ্গুলের চাপে বুঝতে পারে। এমনকি মাইক্রোমিটার আছে যেটা মিলি মিটারেরও কমে মাপ নেওয়া যায়, সেগুলোকে হাতের স্পর্শের এবং আঙুলের শক্তির দ্বারা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যে সব সময় সফল হয় তা বলবো না, তবুও দৃষ্টিহীন ছাত্রদের জন্য আমাদের এই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তবে বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে শেখার এই ঘাটতিটা অনেকটাই পূরণ করা যায়।

এবার আমি কম্পিউটারের বিষয়ে আসছি। সাধারণত কম্পিউটার ডিজাইন করা হয় দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষের কথা ভেবে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিহীনরা সেই একই কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকে, তবে ওদের ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত সফটওয়্যার লাগাতে হয় যেটাকে talking software বলা হয়। কম্পিউটারে যা কিছু ভিজুয়াল দেখা যাচ্ছে সেটাকেই talking softwareএর মাধ্যমে পড়ে দেওয়া হয়। দু ধরনের সফটওয়্যার আমরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকি, একটাকে বলা হয় Job Access with Speech বা সংক্ষেপে JAWS, আরেকটা হচ্ছে Non Visual Desktop Access বা সংক্ষেপে NVDA। এই দুটো সফটওয়্যার এর মাধ্যমে কম্পিউটারে যা দেখানো হয় সেটাকেই আবার পড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। JAWS খুবই উন্নত মানের সফটওয়্যার কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ, নতুন নতুন ভার্সন বেরোচ্ছে। অবশ্য NVDA সফটওয়্যারকে ব্যবহার করতে কোনও মূল্য লাগে না। এটা খুবই পোর্টেবল সফটওয়্যার এবং পেনড্রাইভ এ নিয়ে গিয়ে কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়। দৃষ্টিহীনরা যখন বাইরে অফিসে কাজ করে তখন কর্তৃপক্ষ এই ধরনের সফটওয়্যার কম্পিউটারে install করে দেয়। সাধারণত কম্পিউটারে বিভিন্ন রকম কমান্ড বাটন যেমন কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল সি - সেগুলোকেও শেখানো হয়,

এমনকি excelও অনেকে পারে, তবে সেটা করা খুবই কঠিন। যারা অল্প দেখতে পান তাদের পক্ষে excelএ কাজ করাটা তুলনামূলকভাবে সোজা। যারা একদমই দেখতে পান না তাদের পক্ষে excelএর কাজ বেশ কঠিন। তবুও বেশ কিছু ব্যক্তি আছেন যারা সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন এবং তারা excelএ নিয়মিত কাজ করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করব আমাদের খুবই পরিচিত অমিয় বিশ্বাসের কথা যিনি ব্লাইন্ড পার্সনস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত। শুনেছি অমিয় নাকি অ্যাসোসিয়েশনের অডিটটাও excel শিটে করে দেন! তবে এটাও ঠিক যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিল্লি ও মুম্বাইতে দৃষ্টিহীনরা অনেক বেশি অভিজ্ঞ, তারা বিভিন্ন জায়গায় এমনকি ব্যাংকেও কাজ করছেন। আমাদের এখানেও অনেকেই এই ধরনের কাজ করছেন। অনেকে আবার সংগীত নিয়ে কাজ করছেন, মিউজিকের বিভিন্ন সাউন্ড রেকর্ডিং করছেন। আমাদেরই প্রিয় ছাত্র প্রদীপ শিকদার একটি প্রাইমারি স্কুলে পড়ান ঠিকই, কিন্তু সাউন্ড নিয়ে অনেক কাজ করেন। তার রেকর্ডিং এবং মিক্সিং-এর ওপর অসাধারণ দক্ষতার কথা অনেক শোনা যায়। প্রদীপ মিউজিক রেকর্ডিং এর উপর নিয়মিত কাজ করে। তার সংগীতের ওপর ধারণাটা খুবই স্পষ্ট, তেমনই অসাধারণ তার কম্পিউটারের জ্ঞান। প্রদীপ ২০০৭ সালে আমাদের এখান থেকে মাধ্যমিক পাশ করে গেছে, কিন্তু বর্তমানে সে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হয়েও ও খুবই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। সুতরাং দৃষ্টিহীনরা কোনও কাজ করতে পারেন না বা ওদের পক্ষে সম্ভব হয় না, এ কথাটা একদমই ঠিক নয়। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিলে তারাও একদিন পারবে। আমাদের স্কুলের curriculumএর মধ্যে কম্পিউটার শিক্ষা একটা বিষয় আছে এবং ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য তাদের মধ্যে যারা ভালো ছাত্র তারা নিজেদের উৎসাহে এবং ক্লাসের routineএর বাইরেও কম্পিউটার নিয়ে অনুশীলন করে। আমাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য একজন মাস্টারমশাই আছেন, তিনিও সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন, নাম কুন্দন যাদব। উনিও আমাদেরই ছাত্র ছিলেন। এছাড়া আমাদের কম্পিউটার সেকশনে আছেন শংকর দেবনাথ, তিনিও ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেন। আমাদের এখানে COPA বা Computer Operating & Programming Assistant নামে একটি কোর্স চালু আছে এবং সেটা তারই দায়িত্বে আছে। এই কোর্সের বাইরে ছাত্ররাও ভর্তি হতে পারে। এখানে পরীক্ষাও হয়।

অবশেষে বলি, আমাদের দৃষ্টিহীনতাটা সত্যিই একটা প্রতিবন্ধক, কিন্তু সেটা নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই কারণ এতে কারও হাত নেই। তবে যারা স্বল্প দৃষ্টি

সম্পন্ন, তাদেরকেও আমরা উৎসাহ দিই বই পড়তে এবং অন্যান্য কাজ করতে - তবে অবশ্যই ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে। আমাদের দৃষ্টিহীনদের পড়াশোনার পাশাপাশি যাদের উৎসাহ আছে তাদেরকে কৃষিকার্য, গোপালন, পোল্ট্রি অথবা গানবাজনা বা যন্ত্রসংগীত চর্চা, এরকম বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনের একটা ইতিবাচক মূল্যবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করি। দৃষ্টিহীনতা মানেই যে সব শেষ হয়ে গেল তা কিন্তু নয়। এই ধরনের প্রতিবন্ধকতাটা অনেকেরই হতে পারে তবুও সেই প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। এখানে নিজেকে গুটিয়ে রাখলে চলবে না। এটাই সমাজের কাছে আমাদের চূড়ান্ত বার্তা।

আঁকায় মগ্ন বিনোদবিহারী - শিল্পী এলিজাবেথ ব্রুনার

(সৌজন্যে - Indira Gandhi National Centre for the Arts)

বিনোদবিহারী -
আত্মপ্রতিকৃতি

লিসা ফিচিপালডির ছবি

তেল রং ২০২৬ - প্যারিস

তেল রং ২০২৬ - প্যারিস

সৌজন্যে - শিল্পী

অন্তর্দৃষ্টি

লিসা ফিচিপালডি

লিসা ফিচিপালডির আঁকা ছবি

[প্রাক কথা - লিসার সঙ্গে *অন্বেষা পত্রিকার* তরফে যখন যোগাযোগ করি, তখন তিনি প্যারিসে তাঁর ছবির প্রদর্শনীতে ব্যস্ত। কিন্তু শত ব্যস্ততার মধ্যেও কথা দিয়েছিলেন, দেশে ফিরে *অন্বেষার* পাঠকদের তার নিজের জীবনের দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার কথা শোনাবেন। 'দুঃসাহসিক'ই বটে, তা না হলে দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরে নিজেকে প্রমাণ করতে, নিজের স্বতন্ত্রতাকে বজায় রাখতে ছবি আঁকা শুরু করেন? আজ লিসা ফিচিপালডি একজন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত চিত্র শিল্পী। The London Times, CNN International, BBC World, BBC World's Arts, NBC, Al Jazzera, Sky News এবং El Mundoর মতো সংবাদ মাধ্যমে বহুবার তিনি শিরোনামে এসেছেন। বিভিন্ন টেলিভিশন নেটওয়ার্কে তার কাজ প্রদর্শিত হয়েছে। তার শিল্পকর্ম বিভিন্ন জাদুঘরে নিয়মিত প্রদর্শিত

হয়। দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর প্রথম জীবনে লিসা জলরঙে ছবি আঁকা শুরু করেন, পরে অ্যাক্রিলিক এবং সবশেষে ক্যানভাসে তেলরঙে বাস্তবধর্মী ছবি এঁকে চলেছেন। তিনি একজন ভাস্কর হিসেবেও আন্তর্জাতিক শিল্প মহলে সুপরিচিত এবং প্রশংসিত। ১৯৪৮ সালে জন্ম ফিচিপালডি Michigan বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭০ সালে Education নিয়ে স্নাতক হন। এরপর তিনি South Carolina বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্সিং স্কুলে যোগ দেন। ১৯৭৬ সালে Maryland বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নার্সিংএ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি Blatimore Burn Centerএ একজন 'trauma care burn specialist' হিসেবে কর্মরতা ছিলেন। পরবর্তীকালে লিসা আবার শিক্ষাজীবনে ফিরে আসেন এবং ১৯৮২ সালে Houston বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Accountancyতে তাঁর দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রিটি অর্জন করেন। ১৯৯৩ সালে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারানোর পূর্বে লিসা একজন Trauma Care Nurse এবং একজন Certified Public Accountant হিসেবে কর্মরতা ছিলেন। তার লেখা বই *Brush with Darkness: Learning to Paint After Losing My Sight,* এখন বেস্ট সেলার। অবসর সময়ে তিনি Embracing Life নামে একটি নতুন বই লিখছেন এবং Autoimmune রোগ ও অন্ধত্ব নিয়ে বিভিন্ন দেশে বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে সমৃদ্ধ করছেন। শত ব্যস্ততার মধ্যে লিসা প্যারিস থেকে সাম্প্রতিক কালে তাঁর আঁকা কয়েকখানি ছবি আমাদের পাঠিয়েছেন, *অন্বেষা*র পাঠকদের উৎসর্গ করে]

আপনারা আমাকে হয়তো চিনবেন না। আমি লিসা ফিচিপালডি (Lisa Fittipaldi)। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রান্তে টেক্সাসের বাসিন্দা। আজকে আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি, আমার জীবনের কিছু কাহিনী, কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেবো বলে।

একদিন আমি আমাদের রাজধানী অস্টিন শহরের একটি প্রধান এক্সপ্রেস হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ আমি অনুভব করি আমি আর চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অন্য একজন গাড়ি চালকের তৎপরতায় আমি বড় কোনও দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা পাই ঠিকই, কিন্তু আমার দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি চলে যায়, আমি আর কিছু দেখতে পাই না। আমার দুর্ভাগ্য যে যেই সময় আমার জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছিলো, সেই সময় চিকিৎসা জগতে এই রোগের কোনও কারণ ডাক্তারদের জানা ছিল না বা এই রোগের তেমন কোনও চিকিৎসা হতো না, ফলে ঠিক সময় মতো উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ না পাওয়ায় আমি কোনও কিছুর রঙ, পারিপার্শ্বিক দৃষ্টি বা

লিসা ফিচিপালডির আঁকা ছবি

peripheral vision এবং স্পষ্ট ভাবে কিছু দেখার ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলি। ডাক্তারি পরিভাষায় আমার সর্বোচ্চ সংশোধিত দৃষ্টিশক্তির স্কোরিং দাঁড়ায় ২০/৩০০। অর্থাৎ এই ধরনের স্কোরিং অত্যন্ত সঙ্কটজনক দৃষ্টিশক্তির প্রতিবন্ধকতাকেই ইঙ্গিত করে। চিকিৎসকদের ভাষায় যাকে বলে severe visual impairment।

দুর্ভাগ্য আমাকে যেন পিছু ছাড়তে চায় না। বিগত বছরগুলোতে আমি বেশ কয়েকবার autoimmune রোগে আক্রান্ত হই, ফলে যেটুকু দৃষ্টিশক্তি অবশিষ্ট ছিল তার প্রায় পুরোটাই বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমার জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। ডাক্তাররা বললেন এটা নাকি খুব বিরল রোগ যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে Giant Cell Arteritis বা Cogan's Syndrome। ক্রমশ এই বিরল রোগ আমার দৃষ্টিশক্তি তো বটেই, এমনকি আমার শ্রবণশক্তিরও যথেষ্ট ক্ষতি করে। আমি এখন ভাল করে কানেও শুনতে পাই না। এখানেই রোগের শেষ নয়। ডাক্তারবাবুরা আরও বললেন যে এই রোগের পাশাপাশি আমার নাকি আরও অনেকগুলো অসুখ হয়েছে। কী সব কঠিন নাম বললেন ডাক্তারবাবুরা - Celiac, MCTD, EGPA, আরও কত কী বিরল রোগ সব। আচ্ছা, জগতের সব রোগকেই কী আমার দুচোখে এসে জড়ো হতে হয়েছে?

আমাকে Rehabilitation Centre for the Blinds নামে একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তি করে দেওয়া হলো এবং সেখানে আমাকে বেশ কিছু দিন থাকতেও হয়। সেখানকার counsellorদের থেকে সেদিন যে বার্তা আমি পেয়েছিলাম, সেটা যথেষ্ট জটিল এবং হতাশাজনক। দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন কয়েকজন কাউন্সিলর আমার দুঃখকে কতটা বুঝতে পারবেন? আমার বেঁচে থাকার উপকরণ হিসেবে আমার জীবনের 'স্বাধীনতা' নিয়ে তারা ছিলেন বিশেষ চিন্তিত। আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য তারা প্রায় বলতেন, 'দেখবে, তুমি একদিন না একদিন স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। সেটাই হবে তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু

না...', তুমি এটা করতে পারবে না, সেটা করতে পারবে না... অর্থাৎ তুমি পরবর্তী কালে পাইলট হতে পারবে না, পাহাড়ে চড়তে পারবে না, ছবি আঁকতে পারবে না, শিল্পী হতে পারবে না বা আইনজীবী হতে পারবে না - অর্থাৎ লম্বা 'না'এর তালিকা। রোজ রোজ বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরতেন তারা। সত্যি বলতে কী, ওদের কথা শুনে প্রথম প্রথম আমি খুবই ভেঙে পড়েছিলাম। গভীর হতাশা আমাকে গ্রাস করতে শুরু করে। মনে মনে নিজের প্রতি আমার নিজেরই রাগ হতো। পাশাপাশি লক্ষ করলাম ক্রমশ আমার নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। আমার মধ্যে একটা অদম্য জেদ চেপে গেলো - যেমন করেই হোক আমাকে ছবি আঁকা শিখতেই হবে। সমাজে একজন বাস্তববাদী চিত্রশিল্পী হয়ে এই সব মানুষদের একদিন আমি ভুল প্রমাণ করে ছাড়বো। অবশেষে অত্যন্ত সচেতন ভাবে আমি একদিন সেই সিদ্ধান্তই নিই।

আমার সমস্যা আমার কাছে খুবই স্পষ্ট। আমার সীমিত দৃষ্টিশক্তিতে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা আমার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। আমার কোনও রঙের পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা নেই সুতরাং আমাকে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে ছবি আঁকার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। আমার পক্ষে কোনও প্রখ্যাত শিল্পীর বা old mastersদের কাজ অনুসরণ করা বা তার থেকে শিক্ষা নেওয়া অথবা দূর থেকে দাঁড়িয়ে সেই ছবিগুলোকে সার্বিক ভাবে বিশ্লেষণ করা বা অন্য কোনও শিল্পীর কাজের পর্যালোচনা করা, কখনই সম্ভব হবে না। একজন দৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পশিক্ষার্থী যে সব পদ্ধতিতে কাজ শেখেন, তার কোনটাই আমার পক্ষে প্রযোজ্য হবে না, সে কথা আমি খুব ভালো ভাবেই জানতাম। তবুও বলবো একজন স্বশিক্ষিত চিত্র শিল্পী হওয়ার জন্য জীবনের সংগ্রাম এবং শিক্ষা গ্রহণের যে নিষ্ঠা বা মানসিক উদ্দীপনার প্রয়োজন হয়, তা কোনও দৃষ্টশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর থেকে আমার কোনও অংশে কম ছিল না। বরং এই সংগ্রাম আমার জীবনকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে বলে আমি মনে করি।

দশ বছর ধরে আমি জলরঙে ছবি এঁকেছি, কাগজের বুনন এবং বোর্ডের সীমাবদ্ধতাকে একটি অদৃশ্য ছক বা নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করে ছবি এঁকেছি। দৃষ্টিহীনরা যে ভাবে লাঠি ব্যবহার করে চলার পথকে নির্ণয় করে, ঠিক সেভাবেই আমি তুলি ব্যবহার করতাম। সীমিত পরিসরে পথ খুঁজে নেওয়ার জন্য এক ধরনের মানসিক মানচিত্র তৈরি করে নিতাম।

পরবর্তী দশ বছর আমি আমার perception, কাজের পদ্ধতি এবং আকৃতি

সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা অর্জন করতে ছবি আঁকা ছেড়ে ভাস্কর্যের দিকে ঝুঁকেছিলাম। তবে আমার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল তেলরঙ ব্যবহার করে ছবি আঁকা এবং বিভিন্ন মানুষের অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করা।

সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে মাথায় রেখে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিল্পীদের সঙ্গে সমান তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আমার যে অদম্য প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাকে সফল করতে আমার এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল।

লিসা ফিচিপালডির আঁকা ছবি

গত দু'বছর থেকে আমি শুধুমাত্র তেলরঙ দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করি। তেলরঙে ছবি আঁকার অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অ্যাক্রেলিক বা জলরঙে আঁকলে শিল্পী তার শিল্পকর্মে স্পর্শযোগ্য চিহ্ন বা tactile marker প্রয়োগ করে তার সাহায্য নিতে পারেন। যেহেতু অ্যাক্রিলিক এবং জলরঙ দ্রুত শুকিয়ে যায়, তাই শিল্পী তার মূল আঁকা এবং বিষয়কে অযথা বিঘ্নিত না করে প্রয়োজনে অন্য সময়ে আবার চিহ্নগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে কাজে ফিরতে পারেন। এটাই অ্যাক্রিলিক এবং জলরঙে কাজ করার বিরাট সুবিধা। কিন্তু তেলরঙের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন হয় না। তেলরং শুকোতে কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে যায় এবং ভেজা অবস্থায় ক্যানভাস স্পর্শ করলে তুলির আঁচড় এবং ছবির depth বা আগের করা রং - সমস্ত কিছুই লেপ্টে গিয়ে ছবি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া তেলরঙ হাতে লেগে যেতে পারে বা কাপড়ে এবং ক্যানভাসের উপর ছড়িয়ে পড়তে পারে, যার জন্য তেল রঙে কাজ করতে হলে বাড়তি মনঃসংযোগের প্রয়োজন এবং সাবধানে কাজটা করতে হয়। তেলরঙে কাজ করাটা নিঃসন্দেহে অনেক কঠিন। তেলরঙ প্রয়োগ করতে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন, কারণ তেল রং সবসময় পাতলা থেকে ঘন স্তরে প্রয়োগ করতে হয়। ক্যানভাসে লাগানো রঙ মিশে গেলে ছবির detailing এবং depth (হালকা, মাঝারি এবং গাঢ়) নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এতে ছবির উৎকর্ষ ব্যাহত হয়। আবার অতিরিক্ত মেশানো রঙ ছবির

vibrancyকে কমিয়ে দিয়ে এমন একটি হতাশাজনক পরিস্থিতি তৈরী করে যে পুরো পরিশ্রমটাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

আমার ছবি আঁকার এই সৃজনশীল প্রক্রিয়া বজায় রাখতে, আমি সবসময় এক সঙ্গে তিনটে বা তারও বেশি ক্যানভাসে কাজ করি। তেল রঙের ক্ষেত্রে আমি সবসময় এমন ভাবে রং লাগাতে পছন্দ করি যেখানে রং পুরোপুরি শুকায়নি, কিন্তু কাজের সময় আমি নতুন করে রং করতে পারি বা পছন্দ না হলে ছবির কিছু অংশকে আমার সুবিধে মতো পরিবর্তন করতে পারি। আমি চারটে রঙের একটি Zorn Palette ব্যবহার করতে ভালোবাসি যেখানে থাকবে একটা লাল, একটা নীল ও একটা হলুদ রং এবং সঙ্গে থাকবে সাদা। আমি প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে কালো অথবা কাঁচা আম্বার (Raw Umber) অদলবদল করে ব্যবহার করি। বিষয়টিকে আরও অভিনব করতে, আমি বিভিন্ন ঋতুতে কোনও একটা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে গিয়ে খোলা আকাশের নিচে বসে ছবি আঁকতে ভালোবাসি। এতে সেই মনোরম দৃশ্যের তাৎক্ষণিক অনুভূতিকে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক আলো, পরিবেশ ও রঙের বিন্যাসকে ক্যানভাসে সুন্দর করে ধরে রাখা যায়। এই ধরনের ছবি আঁকার পদ্ধতিকে ফরাসি ভাষায় বলে En plein air painting বা outdoor painting। এছাড়া আমি ã la prima paintingও করে থাকি। এটা তেল রঙে ছবি আঁকার একটা বিশেষ পদ্ধতি, যেখানে আগের ভেজা রঙের ওপর আবার নতুন রং লাগিয়ে ছবিটাকে একটা সিটিংয়েই শেষ করতে হয়। অনেক সময় এটাকে ‘wet on wet’ পদ্ধতি বলে। এই ধরনের পদ্ধতিতে ছবি আঁকলে ছবিতে আলো নিয়ে নানান রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে খুব সুবিধে হয়। আমার আশা আমার এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে ইনডোরে স্টুডিওতে বসে ছবি আঁকতে খুব কাজে দেবে, ফলে সৃষ্টি হবে আরও আকর্ষণীয়, আরও নাটকীয় নতুন সব ছবি।

আমার ছবির বিষয়গুলো নির্বাচন করতে আমি সবসময় আমার কল্পনাশক্তির আশ্রয় নিই, তা’ছাড়া আমার অন্য কোনও উপায়ও নেই। দৃষ্টিহীনতা আমার কাছে এক মুক্তির উপায়ও। আমি দৃষ্টিহীন বলে ছবির বিষয় নির্বাচন করতে গিয়ে আমাকে কোনও আলোকচিত্র বা বাস্তব জীবনের দৃশ্যপটের ওপর নির্ভর করতে হয় না, কারণ সেগুলো আমি চোখে দেখতে পাই না। যদি আমি চোখে দেখতে পেতাম তাহলে এই সব বাস্তব দৃশ্য আমার সৃজনশীলতাকে হয়তো কিছুটা সীমিত করে দিতো। এখন ছবির বিষয় যাই হোক না কেন - সে মানুষই হোক বা অন্য কোনও বস্তুই হোক, আমার নিজস্ব অনুভূতির

ওপর নির্ভর করেই আমি ক্যানভাসের ওপর রং চাপাই। সুতরাং আমার ছবিতে যে কোনও সময় চমৎকার কিছু composition ফুটে ওঠা সম্ভব আর সেই ছবি যে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হবে না, সে কথা কে বলতে পারে? ছবির বিষয় নির্বাচনে আমার তীব্র কল্পনা শক্তি, যা আমি দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে উন্নীত করেছি, নিঃসন্দেহে আমাকে আরও বেশি স্বাবলম্বী করেছে। আমার আত্মপ্রত্যয়কে আরও সুদৃঢ় করেছে।

আমার ছবির রং বা composition নিয়ে কখনও আমি চিন্তিত নই। যতক্ষণ না আমার তুলি রংগুলোকে ক্যানভাসে ঠিক ভাবে মিলিয়ে দিতে পারছে, ততক্ষণ আমার আঁকা চলতেই থাকে। তবে এটা ঠিক, আমার পরিশ্রমের শেষ বিচার করবেন আমার দর্শক। আমার ছবিতে দর্শক ঠিক কী দেখবেন এবং সেই ছবির সঙ্গে তাদের আবেগ মিশিয়ে কতটা সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন, তা নিয়ে সব সময়ই আমার কৌতূহল থেকে যায়।

আমার ভবিষ্যতের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটি দৃশ্যে কুড়িজন বা তারও বেশি মানুষকে একই ফ্রেমে compose করে ছবি আঁকা এবং সেই ছবিতে প্রত্যেকটা চরিত্রই তাদের স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় এবং মুখভঙ্গিতে বা facial expressionএ ক্যানভাসে দৃশ্যমান হবে। বর্তমানে আমি 'Unrealized Expectations' বা 'অবাস্তব প্রত্যাশা' এই শিরোনামে একটি সিরিজ নিয়ে কাজ করছি, যেখানে এমন সব মুখের অভিব্যক্তি তুলে ধরা হয়েছে যা মনের গভীরের ভাবনাকে সহজেই প্রকাশ করে।

আশা করি আপনাদের পত্রিকাতে আমার এই অভিজ্ঞতার কথা পাঠকদের ভালো লাগবে। কেউ যদি এই লেখা পড়ে আমার সম্বন্ধে অথবা আমার কাজের সম্বন্ধে উৎসাহিত হন, তাহলে আমার ওয়েবসাইট lisafittipaldiart.comএ গিয়ে আমার ছবিগুলোকে একবার দেখতে পারেন, আমার অনুরোধ রইলো। আগ্রহী পাঠকের কোনও প্রশ্ন থাকলে আমাকে লিখে পাঠাতে পারেন, আমি নিশ্চয় তার উত্তর দেব।

আমি এখন প্যারিসে এসেছি। সেখান থেকে পাঠকদের আমার আঁকা একটা plein air painting পাঠালাম যা সম্প্রতি ঘরের বাইরে বসে প্রায় তিন ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন করেছি। সমুদ্রসৈকতে হেঁটে চলা এক দম্পতির ওপর আমার নিজস্ব চিত্ররূপ এটি। আশাকরি পাঠকদের ভালো লাগবে।

শান্তিনিকেতন থেকে হাজারীবাগ - একটি পরিক্রমা

অধ্যাপক বিশ্বজিৎ গোস্বামী

[লেখক বিশ্বজিৎ গোস্বামী বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রকলা বিভাগের অধ্যাপক। এছাড়া বুয়েট ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের তিনি ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি। সমকালীন চারুশিল্পাঙ্গনের একঝাঁক কৃতী শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় মুখ বিশ্বজিৎ গোস্বামী এখন বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী, কিউরেটর ও শিল্প শিক্ষাবিদ। বিশ্বজিৎবাবুর জন্ম বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জে। বাবা বিদ্যুৎ গোস্বামী ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর। দাদু মনোরঞ্জন গোস্বামী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের

স্নাতক বিশ্বজিৎবাবু ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে চিত্রকলায় স্নাতকোত্তর করেন-- বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন থেকে। দেশ-বিদেশের শিল্পজগতে সুপরিচিত এই শিল্পী ক্যানভাসে মূলত অ্যাক্রেলিক ও তেলরঙে ছবি আঁকেন। বাংলাদেশ, ভারত এবং বিভিন্ন দেশে বহু স্বীকৃতি লাভ করেছেন, ভূষিত হয়েছেন বহু মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননায়। তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলাদেশের ১৬তম এশীয় চারুকলা দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনী, জাতীয় তরুণ শিল্পী পুরস্কার এবং কানাডার Elizabeth Greenshields Foundation পুরস্কার। এছাড়া পৃথিবীখ্যাত নানা আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন ও সম্মানিত হয়েছেন বিশ্বজিৎ।

ঢাকা শহরের চোদ্দ কিলোমিটার দক্ষিণ প্রান্তে, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পূতিগন্ধময় অস্বাস্থ্যকর পরিত্যক্ত চামড়ার আড়ৎ। চারপাশে কোনও বসতির চিহ্ন মাত্র নেই। সেই চামড়াপট্টি কোনও জাদুছন্দের স্পর্শে জেগে উঠেছে। অধ্যাপক বিশ্বজিৎ গোস্বামীর সম্পূর্ণ একক উদ্যোগে আজ সেই জায়গায় গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-পীঠস্থান বা 'বৃহত্ত্ব আর্ট ফাউন্ডেশন'। ২০২০ সালে 'বৃহত্ত্ব আর্ট ফাউন্ডেশন' একটি পরিত্যক্ত ট্যানারি প্রাঙ্গণকে বেছে নিয়েছিল-- যার উদ্দেশ্য ছিল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে একটি সবুজ নগরী গড়ে তোলা যেখানে সারা বাংলাদেশ থেকে আগত সৃজনশীল মনের মানুষদের জন্য বছরব্যাপী আবাসিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শান্তিনিকেতনের 'কলাভবন' থেকে হাজারীবাগের 'বৃহত্ত্ব আর্ট ফাউন্ডেশন' - বিশ্বজিৎবাবুর শিল্পী জীবনে কলাভবনের শিক্ষার আদর্শ কতটাই বা ছাপ ফেলেছে? তাঁর এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার অভিজ্ঞতাই বা কেমন ছিল? এই প্রশ্নই আমরা রেখেছিলাম শিল্পী বিশ্বজিৎ গোস্বামীর সম্মুখে। বৃহত্ত্ব আর্ট স্পেস-এর আঙিনায় শান্তিনিকেতনের স্মৃতিচারণা করেছেন বিশ্বজিৎ গোস্বামী।]

শান্তিনিকেতনের পাঠক্রমের চিত্রটা অন্যান্য যে কোনও শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থেকে স্বতন্ত্র। আমি ঢাকা থেকে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর জন্য গিয়েছিলাম ঠিকই তবে ভালো রেজাল্ট করতে বা ডিগ্রি পেতে আমার যতটা না উৎসাহ ছিল, তার থেকে অনেক বেশি উৎসাহ ছিল শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি এবং পরিবেশকে স্বচক্ষে দেখতে। কলাভবনে ছাত্ররা শুধু মাত্র ক্লাসের মধ্যে আবদ্ধই থাকে না, বাইরের জগতের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগও পায় এবং প্রকৃতির থেকে সরাসরি শিক্ষা লাভ করার যে অনুকূল পরিবেশ শান্তিনিকেতনে আছে তা বোধ হয় অন্য কোনও

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাওয়া সম্ভব নয়। আমার শান্তিনিকেতনে পড়ার সেটাই ছিল সব থেকে বড় প্রাপ্তি। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে নিবিড় সংযোগ সেটা উপলব্ধি করার এমন দুর্লভ সুযোগ আর কোথাও হবে না, সেই কারণেই সুদূর ঢাকা থেকে শান্তিনিকেতনে আমার পড়তে যাওয়া। আমার মনে হয় প্রকৃতি এবং তার মানুষকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার এটাই সব থেকে বড় সুযোগ। বিশ্বভারতীর একটা ছোট্ট পরিসরের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব কী করে একাত্ম হতে পারে, সেই কর্মধারাকে উপলব্ধি করার সুযোগ আমাকে বার বার আকর্ষণ করতো। এটাই তো রবীন্দ্রনাথের মূল দর্শন। বহু আগে থেকেই আমি মনস্থির করেছিলাম যে আমি শান্তিনিকেতনেই পড়তে যাব। আমার বাবা ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পী। তাঁর স্বপ্ন ছিল শান্তিনিকেতনে গিয়ে পড়াশোনা করার। বাবার সেই ইচ্ছেটাই আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল এবং আশা জাগিয়েছিল যে একদিন না একদিন আমিও শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করতে যাবো। বাঙালি বলে আমাদের মধ্যে একটা অহংকার আছে, যে বাঙালি সত্তা নিয়ে আমাদের এত গর্ব, শান্তিনিকেতনের পরিবেশ সেই সত্তাকেই আরও জাগ্রত করে তোলে। আমার উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেকটা পরিসরে রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে ভালো করে বোঝার এবং শান্তিনিকেতনকে ঘিরে যে প্রাচীন সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস, তাদেরকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা, তাদেরকে অন্তর থেকে স্পর্শ করা। শান্তিনিকেতনের ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করার সময় এইটুকু উপলব্ধি করেছি যে এখানকার মানুষের ভালমন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কেন

এত চিন্তাভাবনা করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের সন্নিকটে অবস্থিত শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নের যে মডেল পরিকল্পনা করেছিলেন সেটা আমি নিজের চোখে উপলব্ধি করেছি। সেখানে গিয়ে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন এবং চাহিদাকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। ছোটখাটো বিষয়গুলো যে জীবনে একটা বড় অংশ হতে পারে, সেই সত্যটাকে উপলব্ধি করেছি শান্তিনিকেতনে এসে। শান্তিনিকেতন শুধু শিক্ষার প্রতিষ্ঠানই নয়, শান্তিনিকেতন প্রকৃতপক্ষে শান্তির ভূমি। এখানে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকারকে রক্ষা করা হয়, সেটাও আমার কাছে কম আকর্ষণীয় ছিল না।

শান্তিনিকেতনের পরিবেশের কথা বলতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা আমাকে ভাবায় যে কেন রবীন্দ্রনাথ রুক্ষ, কাঁকর বিছানো বীরভূমের এই ছোট্ট জায়গাটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। নানারকম সংস্কৃতির মানুষের বসবাস বীরভূমের এই অজানা জায়গাটিতে মানুষের বৈচিত্রের অভাব নেই এবং আমার মনে হয় শান্তিনিকেতনের এই অদ্ভুত সুন্দর চরিত্রটাই রবীন্দ্রনাথকে সব চেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে একটা সুন্দর, নিবিড় সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের মাটিতে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জন্যই নয় সমগ্র বিশ্বকে শান্তিনিকেতনের এই বিরল উপলব্ধির সুযোগ করে দিয়েছেন। এই উপলব্ধি তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যেও হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন একজন প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের পাতায় অত্যন্ত বিরল। মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং তখনকার দিনে অত্যন্ত প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার মানুষ ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল, তা না হলে জোড়াসাঁকোর মতন বর্ণোজ্জ্বল শহর কেন্দ্রিক জায়গা ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলে আসতেন না। রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধু তাঁর আদর্শে বিদ্যানিকেতনের প্রতিষ্ঠাই করেননি, সাধারণ মানুষকে এবং গ্রামীণ সংস্কৃতিকে কিভাবে তাঁর বিদ্যালয়ের অংশ হিসেবে একাত্ম করা যায় সে বিষয়ে উনি ভাবনা চিন্তাও করেছিলেন। এই পরিবেশ থেকেই আমরা রামকিঙ্করের মতন একজন বিরল প্রতিভার ভাস্করকে পেয়েছি, যিনি ভারতীয় শিল্প দর্শনের এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। রামকিঙ্করের প্রবর্তিত শিল্প ধারা কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিরাজমান এবং সেটা শুধু শান্তিনিকেতনই নয়, সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে আছে। শান্তিনিকেতনের এই পরিবেশ আমার মতন অনেক মানুষকেই আপন করে নিয়েছে; শুধু আমি কেন আমার মতো অনেক শিল্পীকেই ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হতে সাহায্য করেছে।

সেটাই শান্তিনিকেতনের সব থেকে বড় শক্তি।

শান্তিনিকেতনের পাঠ্য প্রণালী সম্বন্ধে যদি বলি, তাহলে একটা কথাই বলতে হয় যে প্রথাগতভাবে ক্লাসের বাইরে গাছের তলায় বসে পড়াশোনা করার মধ্যে অবশ্যই একটা আলাদা তাৎপর্য আছে। গাছের নিচে বসে গাছকে দেখা, মাথার ওপর সেই গাছেরই শীতল ছায়া, গায়ের ওপর ঝরে ঝরে পড়ছে গাছের পাতা, ফুলের গন্ধ কিংবা ফল - এই পরিবেশের স্বাদই আলাদা। আসলে আমাদের জীবনটাও তো একটি বৃক্ষ আর সেই বৃক্ষের মতো আমাদের মূল্যবোধকে সমাজের মাঝে আমরা বিস্তৃত করতে পারি। শান্তিনিকেতনের ঐকান্তিক শিক্ষা পদ্ধতিটাও ছিল সেই বৃক্ষেরই সমতুল্য, সেটা খুব সহজ করে হয়তো বোঝানো সম্ভব নয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তো বলেই গেছেন, 'সহজ কথা কইতে আমায় কহ যে / সহজ কথা যায় না বলা সহজে'! এ একটা অসাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি, অনেক বেশি সার্বজনীন। ভারতবর্ষের শিক্ষা দর্শন বা শিল্প দর্শনের যেমন একটা আলাদা গুরুত্ব আছে পাশাপাশি পাশ্চাত্য জগতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সেটা জানারও একটা প্রয়োজন আছে আর সেই শিক্ষা আমরা পেয়েছি সেই শান্তিনিকেতনের ছাত্র হিসেবে। শুধু তাই নয় প্রাচ্যের কথা মনে রেখে জাপানি দর্শন অথবা চীনের দর্শনকে রবীন্দ্রনাথ বার বার আলাদা করে গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বহু বিদেশি শিক্ষাবিদ এবং শিল্পীদের শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সেই জায়গা থেকে শান্তিনিকেতন যে একটি ব্যতিক্রমী সার্বজনীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

শিল্পশিক্ষায় শান্তিনিকেতনের প্রভাব সম্বন্ধে যদি বলতে হয়, বিশেষ করে আমাদের কর্মক্ষেত্রে, শান্তিনিকেতন স্কুল অফ আর্টের প্রভাব ছিল বিস্তীর্ণ। সেটা বলতে গেলে বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট এবং বেঙ্গল আর্ট মুভমেন্ট এর বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবে কিছু কথা উঠে আসে। গত শতাব্দীর প্রথম দিকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে বেঙ্গল স্কুল অফ আর্টের ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিল্পঘরানা কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে। আমি শান্তিনিকেতনের শিল্প আন্দোলনকে এই কারণেই এগিয়ে রাখব, কারণ যে সময় আমরা স্বদেশী আন্দোলনকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে আমরা যখন একটা আলোড়ন তৈরি করার চেষ্টা করছি, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখিয়েছেন স্বদেশী আবহাওয়ার মধ্যেও কিভাবে বিদেশি জগতকেও কাছে নিয়ে আসা যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই একটা কথা বলতেন, 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে'। আমাদের জীবনের অর্থই হচ্ছে আমরা আদান প্রদানের ভেতর

দিয়ে বেঁচে আছি, ঠিক যেমন আমরা নিঃশ্বাস ছাড়ছি। এই অদ্ভুত স্বত্বটাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। শান্তিনিকেতনের পরিবেশের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমার একটাই কথা বারবার মনে হয় যে ক্রিয়েটিভিটি বা শিল্প আন্দোলনে সেই জায়গাটাতেই যাওয়া উচিত, যেখানে আমাদের কোনও গণ্ডি থাকবে না, অর্থাৎ গণ্ডির বাইরের জগতটাও আমাদের নিজেদের হতে পারবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শান্তিনিকেতন স্কুল অফ আর্ট সম্বন্ধে আমার যে মৌলিক উপলব্ধি, আমি মনে করি সেই উপলব্ধি আমাকে আমার শিল্প চিন্তাধারায় যথেষ্ট উর্বর করেছে।

ছেলেবেলা থেকেই আমার জীবন সম্বন্ধে একটা অন্যরকম ভাবনা বা একটা quest আছে। সব কিছুতেই আমি বরাবরই অনুসন্ধিৎসুপ্রবণ। আমার এই জীবনবোধ, অথবা আমার জীবনতরঙ্গ, জল, মাটি, হাওয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে বেড়ে উঠেছে। আর প্রকৃতির পরিবেশের মধ্যে থেকে প্রকৃতি রূপ রস গন্ধকে আকন্ঠ রসাস্বাদন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করা - এর সমস্ত কিছুই আমি পেয়েছি শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে কলাভবনের রবীন্দ্র ভাবধারায় বেড়ে ওঠা আমাদের মাস্টারমশাইদের - যেমন কে জি সুব্রামনিয়াম বা যোগেন চৌধুরীদের মতো বিখ্যাত মানুষদের সান্নিধ্য লাভ করাটা আমার জীবনের একটা পরম প্রাপ্তি। জীবন সম্বন্ধে আমার শিক্ষকদের অনুভূতি এবং সংবেদনশীলতা আমার জীবন আদর্শকে গড়তে অনেকটাই সাহায্য করেছে। আমার শিক্ষক হিসেবে শান্তিনিকেতনে আমি যাঁদের পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে এই মূল্যবোধের চর্চা এবং চর্যা দুটোই ছিল এবং এটাই হয়তো শান্তিনিকেতনের একটা legacy। ঠিক যেমন একদিন রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে নন্দলাল বসু অথবা বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন অথবা রামকিঙ্কর একই রকম ভাবধারায় এবং রবীন্দ্র আদর্শে বেড়ে উঠেছেন, সমৃদ্ধ হয়েছেন।

এখানে আলাদা করে বিনোদবিহারীর প্রসঙ্গ আনতেই হয়। একজন সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তিহীন শিল্পী কিভাবে সমস্ত কিছু অনুভব করছেন অথবা তাঁর শিল্পী সত্তাকে প্রকাশ করছেন, সেটা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারানোর পর তাঁর জীবনে যে একটা ট্রান্সফরমেশন এসেছিল অর্থাৎ চিত্তের ভিতর যা ঘটছে সেটা জগতের সামনে তুলে ধরার যে একটা অনবদ্য প্রক্রিয়া, সেটা আমাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। আমার মনে হয় শান্তিনিকেতনে একটা অসীম শক্তি আছে যেটাকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। শান্তিনিকেতনের সেই অদৃশ্য শক্তিকে উপলব্ধি করা শান্তিনিকেতনের যে কোন শিল্পী বা ছাত্রের কাছে সব থেকে বড় প্রাপ্তি হতে পারে।

আমার স্নাতক স্তরে পড়াশোনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে। ঢাকা শহরটা বাংলাদেশের ব্যস্ততম শহর, সারা বাংলাদেশের মানুষ জীবিকার সন্ধানে প্রতিদিন ঢাকা আসা যাওয়া করছেন। ঢাকার মানুষের আচার বিধি, সংস্কৃতি - এই সমস্ত বৈচিত্রধর্মী উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। ঢাকায় পড়াশোনা করাকালীন সমসাময়িক শিক্ষক যাঁরা ছিলেন, যেমন আবিরিনসার) বা তাঁর সমসাময়িক শিক্ষকরা যাঁরা এই বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা এবং রূপকার, তাঁদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পশিক্ষা ভবনগুলোর নিবিড় সংযোগ ছিল। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং শিক্ষাকর্মসূচির সঙ্গে ভারতীয় পাঠক্রম এবং শিক্ষাকর্মসূচির যথেষ্ট মিল আছে।

ঢাকার সেই ব্যস্ত পরিবেশ থেকে শান্তিনিকেতনে শান্ত পরিবেশে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য পড়তে যাওয়াটা আমার জীবনে একটা মূল্যবান স্থানান্তর বলতে পারেন। অত্যন্ত ব্যস্ত শহরকেন্দ্রিক পরিবেশ থেকে এসে শান্তিনিকেতনে নিবিড় প্রাকৃতিক প্রশান্তির পরিবেশের মধ্যে জীবনের এক নতুন সম্পদকে খুঁজে পেয়েছিলাম। অবশেষে শান্তিনিকেতনে এসে আমি একটু যেন থিতু হলাম। এখানে এসে নতুন করে ভাবনার অবকাশ পেলাম। শান্তিনিকেতনে এসে মনে একটা প্রশ্ন জাগল--জীবনের তাড়নায় কেন আমি বারবার ছুটে চলেছি? জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁকের মুখে একটু থামতে হয়, এখানকার পরিবেশ আমাকে সেটা ভীষণ ভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। শান্তিনিকেতনে এসে পড়াশোনা করাটা আমার জীবনে এক নতুন বাঁকের মুখে এসে একটু যেন শান্ত হওয়া।

এবার আমাদের সংস্থা 'বৃহত্ত্ব আর্ট ফাউন্ডেশন'এর কথায় আসা যাক। 'বৃহত্ত্ব'র মূল দর্শনের কথা যদি বলি তাহলে প্রথমেই বলতে হয় যে শিল্প এমনই একটা সাংস্কৃতিক বস্তু যেটা শুধু ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার জন্য নয়। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিল্পকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ঢাকার খুব কাছেই হাজারীবাগ নামে একটা পরিত্যক্ত ভূমি আছে, যেখান থেকে কয়েক দশক ধরে পরিবেশ দূষণ হয়ে চলেছে। এটা ছিল একটা পরিত্যক্ত চর্ম উৎপাদন শিল্পাঞ্চল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যানারির এলাকা। এই ভূমির পাশ দিয়ে বয়ে চলা বুড়িগঙ্গা নদীর অবস্থাও সঙ্গিন। প্রায় মজে যাওয়া নদীর স্রোতে শুধু কালো দুর্গন্ধময় নোংরা জল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দুর্বিষহ সেই পরিবেশে আমরা আবার নতুন করে জীবনকে খুঁজে পেয়েছি। এই ধরনের উদ্যোগে সব থেকে বড় যেটা দরকার সেটা হচ্ছে জায়গার আয়তন এবং অবশ্যই ভালো পরিবেশ। আমি কাজের মানুষ, কাজের মধ্যেই থাকতে পছন্দ করি। করোনা কালে আমরা এই পরিত্যক্ত দূষিত জায়গাটা অধিগ্রহণ করি। 'হাজারীবাগ' কথাটার মধ্যে একটা রূপক

অর্থ অন্তর্নিহিত আছে। হাজারীবাগ অর্থাৎ 'হাজার বাগ'। কবি সুকান্ত যদি পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটি হিসেবে দেখতে পারেন, তবে আমরা কেন একটি পরিত্যক্ত, দূষিত, আতঙ্ক-ছড়ানো পরিবেশকে 'হাজার বাগানে' রূপান্তরিত করতে পারব না? এটাই ছিল আমার মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। এই এলাকার মানুষ একদিন একটি পরিত্যক্ত জায়গাকে দূষিত করেছে অথবা ধমনী সম বয়ে চলা একটি নদীকে আবর্জনা ফেলে কলুষিত করেছে। সেখানে আজ মানুষের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। সেই মানুষই কিভাবে আবার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, কিভাবে আবার মুক্ত পরিবেশকে ফিরিয়ে আনতে পারে, তার সবথেকে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই 'বৃহত্ত্ব' সংস্থা। আমি চেষ্টা করেছি কয়েক দশক ধরে দূষিত এই পরিবেশকে আবার দূষণমুক্ত এক স্বপ্নের শিল্প গ্রামে পরিবর্তিত করতে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা যে বাড়িটাতে এখন আছি, সেই বাড়িটার নাম 'মুক্তি'। প্রায় ১৫ হাজার বর্গফুট জুড়ে আমাদের কর্মকান্ড। প্রথম যখন বাড়িটাতে আমি পা রাখি, বাড়ির পরিবেশটা ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, শ্বাসরুদ্ধকারী। এতদিন ধরে 'মুক্তি' বলতে শুধু চামড়ার গন্ধ আর ব্যবসার লেনদেনের কথাই শুনেছি। আজকে 'বৃহত্ত্ব' 'মুক্তি'র বন্ধু হয়ে গেছে। এই ধরনের অসম বন্ধুত্ব একমাত্র শিল্পকে কেন্দ্র করেই সম্ভব হয়। শিল্প কখনও নিজের জন্য নয়, অপরের জন্য শিল্প। এবং সেই শিল্পই একে অপরকে নিজের কাছে জুড়ে নিতে পারে। সেই জন্যই শিল্প অতটাই সার্বজনীন। সেদিক থেকেই হাজারীবাগের মতন একটা পরিত্যক্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে 'বৃহত্ত্ব'র আসাটা একটা অদ্ভুত সুন্দর পর্ব। এখানে একজন রিক্সাচালকের সঙ্গেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের চায়ের কাপ হাতে শিল্প নিয়ে আলাপচারিতা হয়। শুধু বাংলাদেশ বা ঢাকা শহরেই নয়, সারা পৃথিবীতে এই ধরনের সংযোগ অত্যন্ত বিরল। এই হচ্ছে আমাদের গুণমান, আমাদের সার্বজনীনতা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, মহানুভবতা - যার মধ্যে দিয়ে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারি। সেখানেই সম্ভাবনা তৈরি হয়, তৈরি হয় একটা মধুর সম্পর্কের। 'বৃহত্ত্ব' আমার কাছে এরকমই একটি জায়গা, যেখানে মানুষ পরস্পরের মধ্যে আলাপচারিতার মাধ্যমে নতুন সম্পর্ক তৈরি করবে এবং আকাশের মতো বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে সমগ্র জগতের হিতার্থে ফিরে আসবে। 'বৃহত্ত্ব' আমার কাছে পরম শান্তির জায়গা।

আমার বা আমার সংস্থা 'বৃহত্ত্ব' আর্ট ফাউন্ডেশন-এর ভবিষ্যৎ কী হবে সে কথা কখনও ভাবি না। নেত্রকোণা জেলায় আমার জন্ম আর বাংলাদেশ হচ্ছে নদীমাতৃক কৃষি প্রধান দেশ। আমি আসলে কৃষকেরই মতন জমিটাতে চাষ করছি। সেই জমিতে অনেক

কিছুই হতে পারে, - ধান, আলু, টমেটো, মরিচ কিংবা সর্ষে, আরও কত কী। এই অসাধারণ বৈচিত্র আমার কাজের ক্ষেত্রেও আমাকে প্রভাবিত করে। আমি শিল্পচর্চাও যেমন করছি, আবার একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে ছাত্রদের শেখাতে গিয়ে নিজেও অনেক কিছু শিখছি। সে রকমই, একজন কিউরেটর হিসেবে আমি চেষ্টা করছি অনেক ধরনের শিল্পের সঠিক সমন্বয় ঘটাতে, সেই অর্থে বলা যায় এটা এক ধরনের একটা আন্দোলন। শিল্পকে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প নিয়ে আমি নিজেকে কিউরেটর হিসেবে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করছি। 'বৃহত্ত্ব' সংস্থার একজন প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আমি যে কাজ করছি, তার সঙ্গে আমার পেশার একটা নিবিড় সংযোগ আছে আর সেটাই আমি আন্তরিকভাবে বিকশিত করার চেষ্টা করছি। নিঃসন্দেহে এটা আমার অন্তরের খুব ভালো লাগার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন সব কাজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। আসলে বিশ্বাসের উপরেই কিন্তু সবকিছু দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সংস্কৃতি বলি, আমাদের শিক্ষা বলি, আমাদের কৃষি বলি, সব পর্যায়ই কিন্তু আমাদের আদি পর্ব থেকে বহমান একেকটি ধারা। সেই ধারাই আমাদের চালনা করছে। তবে এতদিনে একটা সত্যকে আমি উপলব্ধি করেছি, যে কোনও কিছুর চর্চা বা কোনও পেশা বা যে কোনও প্রক্রিয়াতে কষ্টভোগ করাটা একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই কষ্টকে জয় করাটাই আমাদের আনন্দ। সেটাই আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি। বলা বাহুল্য শান্তিনিকেতনে না গেলে বা রবীন্দ্রনাথকে না বুঝলে এই সত্যটাকে আমি কোনও দিনও উপলব্ধি করতে পারতাম না। সেই জায়গা থেকে আমি যদি 'বৃহত্ত্ব'র কথা বলি, তবে মানতেই হয় যে এই হাজারীবাগের পরিকল্পনা আমার শান্তিনিকেতনের শিক্ষার একটা সম্প্রসারণ। রবীন্দ্রনাথ জনবহুল কোলাহলমুখর জোড়াসাঁকো ছেড়ে বীরভূমের শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন শান্তির সন্ধানে। আর আমরা ঢাকার মতো ব্যস্ত শহর ছেড়ে হাজারীবাগে এসেছি সেই শান্তিরই সন্ধানে। এখানে এসে আমরা এমন একটা পরিবেশের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছি, যেখানে মানুষ এলে মনে করবে যে কোনও কোলাহল মুখর ঢাকা শহরে নয়, সে আছে একটি গ্রামীণ নিরালায়, যেখানে অনির্বচনীয় শান্তি বিরাজ করছে। একটা দ্বৈততার মধ্যে থেকেও মানুষকে যে শান্তির সন্ধান দেওয়া যায়, তারই অনুসন্ধান আমরা সবাই মিলে করে চলেছি। হাজারীবাগে যেই আসুন তিনি কিন্তু শহুরে ব্যস্ততা ভুলে শান্তির কথা বলে যান। এটাই হচ্ছে 'বৃহত্ত্ব'র সার্থকতা এবং শান্তিনিকেতনে আমার নিজস্ব পঠন-পাঠনের কৃতি ফল।

বেঙ্গল আর্ট মুভমেন্ট-এ শান্তিনিকেতনের অবদান ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের শিল্পভাবনা

অধ্যাপক সুশান্ত কুমার অধিকারী

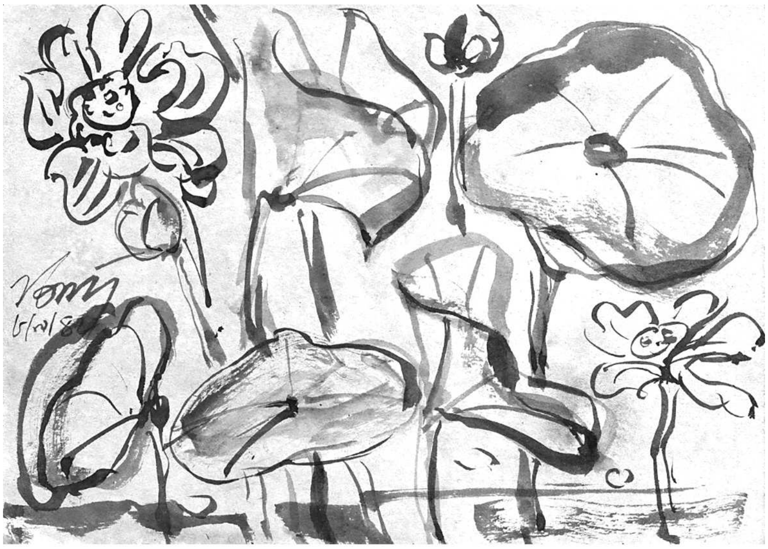

বিনোদবিহারীর ছবি

[লেখক শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর কলাভবন থেকে এম এফ এ (১৯৯৬-১৯৯৮) এবং পি এইচ ডি (২০০৫-২০১০) সম্পন্ন করেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ২৪তম জাতীয় প্রদর্শনীতে 'প্রাচ্যকলায় জাতীয় পুরস্কার' এবং ১৯তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে গ্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড এবং চীনাদেশ থেকে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছেন।]

বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে শান্তিনিকেতনের অবদান সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০১ সালে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' হিসেবে শান্তিনিকেতনে যে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন, তা পরে বিকশিত হয়ে ১৯২১ সালে 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নাটক প্রভৃতি আধুনিক সংস্কৃতিচর্চার বিকল্প দৃষ্টান্ত হিসেবে শান্তিনিকেতনের ভূমিকা অগ্রগণ্য। বিশ্বভারতীতে প্রতিষ্ঠিত কলাভবন পরবর্তী সময়ে ভারতীয় আধুনিক শিল্পচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল-এটি ভারত ও বিশ্বের জ্ঞানের সমন্বয়ে সৃজনচিন্তাধারার মিলনস্থল হবে। শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের বাইরে মুক্ত পরিবেশে হবে জ্ঞানচর্চা। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, কিংবদন্তিতুল্য চিত্রশিল্পী ও শিল্পশিক্ষক ছিলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমি তৈরিতে বিনোদবিহারীর ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

বিনোদবিহারীর ছবি

ব্রিটিশ ভারতে শিল্পবিদ্যাচর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান ছিল 'কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল'। এর 'ফাইন আর্ট' বিভাগের শিক্ষার বিষয় ছিল মূলত একাডেমিক স্বাভাবিকতায় দৃশ্যমান বস্তুকে যথাযথরূপে উপস্থাপন। চিত্রকলার মাধ্যম হিসেবে ছিল ইউরোপীয় প্রথায় তেলরং ও ব্রিটিশ প্রথায় জলরং। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আদর্শেই চিত্রাঙ্কন শিখেছিলেন। পরে নিজস্ব শিল্প-ঐতিহ্য ও স্বদেশচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে পদাবলী সাহিত্যাবলম্বনে 'কৃষ্ণলীলা' সিরিজ আঁকেন। শিষ্য ও প্রো-শিষ্যক্রমে অবনীন্দ্রনাথের এই ধারা 'বেঙ্গল স্কুল' হিসেবে স্বীকৃত হয়। এই ধারার চর্চার বিষয় ভারতীয় মিথ-পুরাণ আর মাধ্যম হিসেবে ছিল অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত জলরং ধৌত পদ্ধতি। সূচনালগ্নে এই ধারার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও উৎসাহ থাকলেও

বিনোদবিহারীর ছবি

পরবর্তী সময়ে একঘেয়েমি ও ছবির দুর্বলতা অনুভব করেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য নন্দলাল বসুকে কলাভবনে শিল্পবিদ্যাচর্চার শিক্ষকতার দায়িত্ব দেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণায় শিল্পচর্চার বিষয় মিথ-পুরাণের বাইরে উন্মুক্ত প্রকৃতি এবং জলরং ধৌত পদ্ধতির পরিবর্তে ওপেক বা অস্বচ্ছ টেম্পারা রঙে ছবির চর্চা করেন নন্দলাল। তিনি এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষাদান করেন। প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রজন্মের ছাত্রদের মধ্যে ভাস্কর রামকিঙ্কর (১৯০৬-১৯৮০) ও চিত্রশিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৮০) অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পবোধের আন্তর্জাতিকতা, নন্দলাল বসুর স্বাদেশিকতা এবং নিজের দেশাত্মবোধের অনুষঙ্গে সৃষ্ট বিনোদবিহারীর শিল্পকর্ম সমসাময়িক শিল্পীদের থেকে পৃথক ছিল। শিল্পী বিনোদবিহারীর চিত্রকলার বিষয়-বৈশিষ্ট্যসমূহ ও শিল্পবিষয়ক লেখাসমূহ এই সময়েও প্রাসঙ্গিক।

বিনোদবিহারীর মধ্যে ছিল ধ্রুপদী সৌন্দর্য ও শুদ্ধতার অন্বেষণ। তাঁর ছবির বিষয় ছিল নিসর্গ। নিসর্গকে জড়িয়ে অবয়বধর্মী ছবিও এঁকেছেন। শান্তিনিকেতনের আশেপাশের দৃশ্য, সাঁওতাল জীবন- এই ছিল তাঁর ছবির বিষয়। তাঁর ছবিতে প্রকৃতি এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। প্রকৃতির মধ্যেই যেন তিনি আত্মার মুক্তি অনুভব করেছেন। মানুষও এসেছে। কিন্তু সে মানুষ আত্মমগ্ন নির্জন মানুষ। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 'চিত্রকর' গ্রন্থে বলেছেন, 'নির্জনতাই বোধহয় আমার দৃশ্য-চিত্রের প্রধান বিষয়' (চিত্রকর,

পৃ. ৩৬)। এই আত্মমগ্নতার ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিনোদবিহারীর তীক্ষ্ণ এক অন্তর্দৃষ্টি। সত্যজিৎ রায় তাকে নিয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারিতে যার নাম দিয়েছিলেন 'ইনার আই', সেখানে এই 'ইনার আই'-এর মাধ্যমে তিনি বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবচেতনার গভীর রহস্যকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন। নিসর্গের ভেতর দিয়ে জানতে চেয়েছেন নিজেকেও। তিনি বলেছেন, 'আমি নিজেকে জানতে চেয়েছি' (চিত্রকর, পৃ.৩৭)। নিজেকে জানার মধ্যে দিয়েই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। একের ভেতর দিয়ে সমগ্রের উপলব্ধিতে পৌঁছাতে চেয়েছেন। এই জীবনবোধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনচেতনার মিল লক্ষ করা যায়। 'চিত্রকর' গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'আমার সাহিত্যবোধের অনেকখানি রবীন্দ্র প্রভাবান্বিত' (চিত্রকর, পৃ.৪২)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, জীবনে আনন্দময়, সৃষ্টির পথে চলে অবসাদ অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে যে মুক্তি পাওয়া যায় সেকথা উপলব্ধি করার সার্থক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, প্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গে একাত্মতাই ভারতশিল্পের স্থায়ীভাব। ভারতশিল্পের গভীরে সঞ্চালিত আছে এক ছন্দের বোধ। প্রকৃতির সাহচর্য ও তাঁর সঙ্গে একাত্মতা থেকেই আহৃত হয়েছে এই ছন্দ।

নির্জনতার এই অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই তাঁর 'দ্য ব্রিজ' শিরোনামের ছবিতে। 'দ্য ব্রিজ' ১৯৩২-এ আঁকা। কাগজের উপর টেম্পারায় আঁকা এই ছবিটি একটি সেতুর ছবি। একটি খাড়ি বা নদীর উপর ইটের স্তম্ভ উঠে গেছে। নিচে জলের ধারা। কিছু গাছপালা রয়েছে। একটু মৃদু আবছায়া আবহ সেখানে উপস্থিত। যেন নির্জনতা ভর করে আছে। একটি সেতু তার একাকী অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৯৩২ সালে আঁকা আরেকটি ছবি 'দ্য ট্রি লাভার'। শিমুল গাছের তলায় খড়ম পরে দাঁড়িয়ে আছেন বৃক্ষপ্রেমিক এক মানুষ। তাঁর পায়ের কাছে সবুজ তৃণ। হালকা লাল আর হলুদের বুনোট। দাঁড়িয়ে থাকা একলা মানুষ, যার চারপাশে শূন্যতার আভরণ। ছবি দুটোতে ইমপ্রেশনিজমের এক সমন্বয় দেখতে পাই। ছবি দুটোর মাধ্যমে বিনোদবিহারীর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। ইম্প্রেশনিজমের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ত অনুভব করা যায় কোথাও কোথাও। এক্সপ্রেশনিজমের আবহমণ্ডল তাঁর মননের নির্জনতাকে প্রকাশ করার পক্ষে উপযুক্ত। পাশ্চাত্য আধুনিকতার সারাৎসার থেকে যেটুকু তিনি নিয়েছেন, তা এসেছে প্রাচ্য-আঙ্গিকের মধ্যে দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে। জাপানের উত্তরাধিকার, ভারতীয় লৌকিক ও অনুচিত্রের ভাবধারার নানা অনুষঙ্গ তাঁর চেতনার নির্জনতা বোধের সঙ্গে মিলে গড়ে তুলেছে নিজস্ব আঙ্গিক।

শান্তিনিকেতনের দুটি কাজ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদানস্বরূপ। আর তা হলো দুটি ম্যুরাল। প্রথমটি ১৯৪০ সালে করা, কলাভবনে ছেলেদের হোস্টেলের ছাদে। শিরোনাম 'বীরভূম ল্যান্ডস্কেপ'। ডিমের আঠার টেম্পোরায় করা এই ম্যুরালটিতে তিনি বীরভূমের গ্রামের নিসর্গ এঁকেছেন। নিসর্গচিত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব এক দর্শনকে সেখানে তুলে ধরতে পেরেছেন। ম্যুরালের নিসর্গ দৃশ্য ছাদের তলদেশে আঁকা। একটি কেন্দ্রস্থ বিন্দু বা অঞ্চল থেকে দৃশ্য ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। সেই দৃশ্যে গ্রামের জীবনের বিস্তৃত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত আনন্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এইসব দৃশ্য দেখতে হলে নিচ থেকে মুখ তুলে উপরে তাকাতে হয়। এর পার্সপেক্টিভ একেবারে অন্যরকম। মাঝখানে একটি বর্গাকার পরিসর। তাকে ঘিরে চারপাশে গাছপালা, পশুপাখি, মানুষের জীবন আবর্তিত হয়েছে। শিল্পী যেন এই নিসর্গের ভেতরেই রয়েছেন। সেই একাত্মতায় ফুটে উঠেছে সমগ্রের রূপ। এখানে আছে ছন্দের স্বতন্ত্র এক স্পন্দন। দ্বিতীয়টি ১৯৪৬-৪৭ সালে হিন্দি ভবনে ফ্রেস্কো বুওনো পদ্ধতিতে করা 'মেডিইভাল সেন্টস' বা 'মধ্যযুগের সন্তরা'। মধ্যযুগে ভারতে যে ধর্ম আন্দোলন হয়েছিল, তা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে গড়ে তুলেছিল ঐক্যের সূত্র। বিনোদবিহারী সেই মানবিক ঐক্য ও সাম্যেরই গান গেয়েছেন এখানে। 'মধ্যযুগের সন্তরা' দেখলে বুঝতে পারি, তাঁর সমাজচেতনা কত গভীরে প্রথিত। ১৯৪৬-৪৭-এর সময়টিতে সাম্প্রদায়িক হিংসার উন্মত্ততায় দেশ যখন উদভ্রান্ত, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে করা এই কাজটিতে তিনি দেখালেন ভারতবর্ষের চৈতন্যের মূল স্বরূপটি কী? (মৃণাল ঘোষ, বিশ শতকে ভারতের চিত্রকলা আধুনিকতার বিবর্তন, পৃ. ২৩৯-২৪২)। চিত্রধারাতে দেখা যায়, হিমালয়ের শীতল নির্জনতায় সাধুদের ধ্যান, আরাধনা ও সংগীতচর্চার দৃশ্য। এখানে ভারতের অধ্যাত্মসাধনার পরিমণ্ডল পরিস্ফুট। পরের দৃশ্যে দেখা যায় রামানুজকে। এরপরে দেখা যায় কারুকর্মীদের জগত। সেখানে উপবিষ্ট আছেন ধ্যানমগ্ন কবীর। তার সামনে সংগীতের আসর। এরপর বেনারসের গঙ্গায় নৌকা, কুটিরের জ্যামিতিক বিন্যাসের ভেতর সাধারণ নর-নারীর ধর্মচর্চা করার দৃশ্য। এরপরে দেখা যায় সুরদাসকে। গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের বর্ণনা আছে। মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার জয়যাত্রাকে দেখিয়েছেন হিমালয়ের ঋষিদের অধ্যাত্মসাধনা থেকে সমতলের কৃষিভিত্তিক জীবনের বিস্তার পর্যন্ত। প্রাচীন জৈন মূর্তির মতো অবয়বগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। শরীরের কাঠামো সুডৌল। সাধকদের ভগবানরূপে না দেখিয়ে সাধারণরূপে উপস্থিত করেছেন। পাশ্চাত্য বুওনো ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে এই

দেওয়ালচিত্রটি আঁকা। শিল্পী বিনোদবিহারীর অধ্যাত্ম-সাধনার বহিঃপ্রকাশ সার্থক হয়েছে এই দেওয়ালচিত্রে। বাংলার পটের ধারাবাহিক কাহিনি উপস্থাপনের গুণ তাঁর ভিত্তিচিত্রে পাওয়া যায়। প্রতিটি দৃশ্যই যেন ঐক্যের নিয়মে বাঁধা।

ভারতীয় শিল্পদর্শন বিনোদবিহারীকে প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনাকে তিনি আধুনিকতায় উন্নীত করেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃতি ও জীবনের বন্ধনই ভারতশিল্পের স্থায়ী ভাব। ভারতশিল্পের গভীরে সঞ্চালিত আছে এক সুললিত ছন্দের বোধ। এই ছন্দের বোধ বিনোদবিহারীর ছবির মধ্যে আমরা দেখতে পাই। প্রকৃতির মধ্যে আছে নানা ছন্দের বিন্যাস। সেই ছন্দের অনুভবই শিল্পের প্রাণ। বিনোদবিহারী এই ছন্দের মাধ্যমে নৈঃশব্দের বোধ আনেন ছবিতে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'তাও পন্থি' অধ্যাত্মচেতনার দর্শন। তিনি জানিয়েছেন, 'অনেক সময় 'তাও পন্থি' ব্যাখ্যাকেই আমি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতাম' (চিত্রকর, পৃ. ৪৭)। পার্থিব জগতের সংস্পর্শ থেকে তিনি যেন নিজেকে নির্জনতায় উন্নীত করতে চেয়েছেন। আদর্শায়িত সৌন্দর্যের এক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এছাড়া চীন ও জাপানের শিল্পের উৎস থেকে তিনি পেয়েছিলেন আদর্শায়িত সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ। এর সঙ্গে মিশেছিল অলংকরণের ছন্দেও নানা বৈভব। এজন্য তাঁর ছবির ভাষা কখনও লিরিক্যাল, কখনও অভিব্যক্তিবাদী গাম্ভীর্যের প্রকাশ হয়ে উঠেছে।

চিত্রচর্চায় যেমন, তেমনি তত্ত্বগত দিকেও আধুনিকতার স্বতন্ত্র পথ নির্মাণ করেছেন বিনোদবিহারী। ছোট-বড় শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ ও আত্মজীবনীমূলক রচনা-- সব মিলিয়ে বাংলায় প্রায় ৮০টি এবং ইংরেজিতে ৩১টি। 'শিল্প জিজ্ঞাসা'য় নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তা ও গভীরতার চিত্র পাই। অবনীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের পরে কিংবা বেঙ্গল স্কুলের পরবর্তী প্রজন্মে বিনোদবিহারী এদিক থেকে অনন্য। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের পর বিনোদবিহারীই একমাত্র শিল্পের তত্ত্বগত আলোচনা করেছেন। শিল্পকলার ইতিহাসে চিত্রকলার মতোই উজ্জ্বল তাঁর তত্ত্বের জগৎ। 'শিল্প-জিজ্ঞাসা', 'চিত্রকথা' প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি শিল্পের অন্তর্নিহিত স্বরূপকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর অন্যান্য লেখা- 'চিত্রকর', 'চিত্রকথা', 'আধুনিক শিল্পশিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ খুবই সমাদৃত। 'চিত্রকর' গ্রন্থে শৈশব-কৈশোরের পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের নানা ঘটনা; শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য, শিক্ষক নন্দলাল বসুর অন্তরঙ্গতার সুযোগ এবং শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির জ্ঞান

অর্জনের অনুসন্ধানী তথ্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থটি রবীন্দ্রপুরস্কার (১৯৮১) ও ভারতীয় ভাষা পরিষদের শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থ হিসেবে (১৯৭৯-৮০) পুরস্কারপ্রাপ্ত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৃষ্ণলীলা' সিরিজের 'অভিসারিকা' চিত্রটির আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার সূচনা হিসেবে গবেষকের দৃষ্টিতে যৌক্তিক মূল্যায়ন করেছেন। লেখনীতে ভাষা প্রয়োগ, বিষয় বর্ণনার বিন্যাস ব্যতিক্রম। শিল্পীর মনোদৃষ্টির অভিজ্ঞতা দিয়ে লিখেছেন। গভীর নান্দনিক বোধ ও তত্ত্বের উপস্থিতি এইসব আলোচনায় দৃশ্যমান হয়।

'শিল্প-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে বিনোদবিহারী বলেছেন, 'জন্মমৃত্যুর টানে যেমন মানুষ বেঁচে আছে, তেমনি বিমূর্ত উপলব্ধি ও বাস্তব উদ্দীপনা এই দুই এর টানে ('tension') সৃষ্টি হয় শিল্পরূপ। এই দুইয়ে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলে দেখি বিচ্ছিন্নতা, অপরদিকে পাই জ্যামিতিক আকার'। শিল্প সম্পর্কে প্রচুর পাঠ ও কলাভবনের গ্রন্থাগারে নিরলস অধ্যয়ন তাঁর শিল্পবোধকে প্রাজ্ঞ করে তুলেছিল। বই পড়ার সময় সবসময় নোট নিতেন। এ ব্যাপারে জয়ন্ত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'বৌদ্ধ মূর্তি সম্পর্কে জানার জন্য 'The Gods of Northern Buddhism' - গ্রন্থটি থেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য নিয়েছিলেন। আদিবুদ্ধ, মৈত্রেয়, ধ্যানীবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ইত্যাদিও বিশেষ লক্ষণ, মুদ্রা, প্রতীক, বর্ণ প্রভৃতি নোট নিয়েছেন।' (নন্দন, পৃ.৮৮)

শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাবেই হয়ত এতখানি গভীরে যেতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। বীরভূমের লালমাটি, রুক্ষ্ম গাছ, স্বল্প-শ্যামল আভায় বিশেষ স্থানীয় ভাবও তাঁর দৃশ্যচিত্রে প্রাণ পেয়েছে। তাঁর ছবির সবটাই নিজের দেখা জগতের অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা থেকে উৎসারিত। চারপাশের মানুষ ও পরিবেশই তাঁর ছবির উপাদান। ফলে তাঁর ছবির সাথে রয়েছে মাটির নিবিড় যোগ। সেটাই তাঁর শক্তির উৎস, স্বাতন্ত্রের কারণ। তাঁর দৃষ্টিহীনতা তাকে রুখতে পারেনি বরং দিনে দিনে অর্জন করেছেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি। যার মাধ্যমে শিল্পের গভীরে অন্য এক আলোর সন্ধান করেছেন জীবনব্যাপী। তাঁর এই চিত্রসাধনার সঙ্গে যোগ হয়েছে তাঁর শিল্প আলোচনার জগত, যা আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আত্মচেতনা, নির্জনতা, নিসর্গপ্রেম-এসব তাকে এক আধ্যাত্মিক সংবেদন দিয়েছিল। সেই সংবেদনা থেকেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব শিল্পভাষা, আধুনিকতার বিশেষ এক অভিজ্ঞান।

শিক্ষক নন্দলালকে কবিগুরু যে কথা বলেছিলেন-- 'যদি ও নিয়মিত আসনে বসে এবং মনোযোগ দিয়ে কাজ করে তবে ওকে স্থানচ্যুত কোরো না'। বিনোদবিহারী

সত্যি ছবি আঁকা থেকে বিচ্যুত হননি, আমৃত্যু সৃষ্টিতে মগ্ন ছিলেন। প্রাচ্য চিত্র-দর্শন আর পাশ্চাত্যের আধুনিক বাস্তবচেতনার ভাবধারার সমন্বয়ে স্বতন্ত্র তাঁর চিত্রকলা। তিনি 'পদ্মভূষণ' ও 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সামগ্রিক অবদানে দেশ-বিদেশের শিষ্য-অনুসারী, শিল্প-ইতিহাস-অনুসন্ধানী, শিল্প-রসিকজনের কাছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় অনুস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সহায়ক রচনাপঞ্জি (গ্রন্থ, সংকলন, জার্নাল)

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, চিত্রকর, অরুণা প্রকাশনী, বাং ১৩৮৫, কলকাতা।
... চিত্রকথা (সম্পা, কাঞ্চন চক্রবর্তী), অরুণা প্রকাশনী, বাং, ১৩৮৭, কলকাতা। মৃণাল ঘোষ, বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা আধুনিকতার বিবর্তন, প্রতিক্ষণ, খ্রি. ২০০৫, কলকাতা
মৃণাল ঘোষ, শিল্পের স্বদেশ ও বিশ্ব, প্রতিক্ষণ, খ্রি. ১৯৯৪, কলকাতা।
রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ শিল্পচিন্তা, (রবীন্দ্ররচনা সংকলন)।
নন্দন, সংখ্যাসমূহ, বিশ্বভারতী।
পশ্চিমবঙ্গ, সংখ্যাসমূহ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা।

বিনোদবিহারীর ছবি

শান্তিনিকেতনের শিল্পচর্চায় জনজীবন ও প্রকৃতি

অধ্যাপক সুমন ওয়াহিদ

বিনোদবিহারীর ছবি - সৌজন্যে লেখক

[লেখক সহকারী অধ্যাপক, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শান্তিনিকেতনে শিল্পচর্চার মূল প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল স্থানীয় জনজীবন ও প্রকৃতিকে। প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তববাদ বা নব্য বঙ্গীয় ধারা কোনোটিকেই রবীন্দ্রনাথ সমকালীন শিল্পভাষা হিসেবে যথার্থ মনে করেন নি। তাই বিচিত্রা স্টুডিও-এর মাধ্যমে তিনি বিকল্প পথের অন্বেষণ করেছিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি জনজীবন ও প্রকৃতির সাথে শিল্পীর সরাসরি সম্পৃক্ততার ঘাটতি অনুভব করেন। তাই কলা ভবনে নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬)-র তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের শিল্পচর্চায় স্থানীয় প্রাণ-প্রকৃতির প্রাণবন্ত রূপায়ণ শুরু হয়েছিল। শোভন সোমের মতে,

কলাভবনের ছাত্ররা যখন তখন অনুশীলন করতে বেরোতে পারত। চারদিকের চলমান জীবনের বিভিন্ন রূপ, কর্মতৎপর নরনারী, সপ্রাণ পশুপাখি তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে অনুশীলন করতে বলা হত। গাছ পাতা ফুল তারা স্বাভাবিকপরিবেশ আঁকত। তার জন্য পাতা বা ফুল ছিঁড়তে হত না। জীবনকে তারা আয়ত্ত করত মুক্ত স্বাভাবিক পরিবেশে। কেবল শিল্পরচনার কালে মৌলিক ছবি আঁকতে বা মূর্তি গড়তে তারা স্টুডিও ব্যবহার করত (১৯৯৮:৩৮১)।

শান্তিনিকেতন কেন্দ্রিক শিল্পীদের কাজে জনজীবন প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দেয়। অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে ভারতীয় শিল্পের যে আঙ্গিককে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাতেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিল। গ্রামের সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত জীবনকে ফুটিয়ে তুলতেই ঘটে গেল আঙ্গিকগত এই পরিবর্তন। বলা যায় জনজীবনের ঘনিষ্ঠতাই এই শিল্পীদের আঙ্গিকগত পাশ্চাত্যরীতি বনাম স্বাদেশিকতার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিয়ে এক নতুন আধুনিক চরিত্র দান করল, আর. শিব কুমার যাকে বলেছেন প্রাসঙ্গিক আধুনিকতা (Contexual Modernism) (২০১৮)। এই প্রতিষ্ঠানের উন্মেষ পর্বে নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের শিল্পকর্মে এর নিদর্শন মেলে।

নন্দলাল বসু

নব্য বঙ্গীয় ধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী নন্দলাল বসুর কাজে পুরাণ নির্ভরতা থাকলেও শান্তিনিকেতনে আসার পর সে প্রভাব থেকে তিনি অনেকাংশেই বের হয়ে যেতে সক্ষম হন। পুরাণ ও ইতিহাস থেকে ক্রমেই তাঁর ছবিতে জায়গা করে নিচ্ছিল শান্তিনিকেতনের জনজীবন ও প্রকৃতি (আর. শিব কুমার, ২০১৮:২৪)। যদিও এর আগেই ১৯১৫-তে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তিনি ও মুকুল দে শিলাইদহে পদ্মা বোটে অতিথি হিসেবে এক মাস কাটান। শিলাইদহ বাস তাঁকে বাংলার প্রকৃতি ও জনজীবন সম্পর্কে সচেতন করে তোলে (শোভন সোম, ১৯৮৫:৫৩)। তাঁর *বোলপুরের পথে* (১৯৩৪) চিত্রকর্মে দেখা যায় এক সাঁওতাল পরিবারকে যারা বোলপুর শহরের দিকে ধাবমান। আবার এই ধাবমানতাকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাঁর *নতুন মেঘ* (১৯৩৭) চিত্রকর্মেও, যেখানে সাঁওতাল নারীরা কর্ম ব্যস্ত দিনের শেষে আকাশের কালো মেঘের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ির পানে দ্রুতলয়ে অগ্রসর হচ্ছে। জনজীবনের এই তাৎক্ষণিকতাকে রূপায়ণে শিল্পী কোনও বিদেশি 'ইজম'-এর উপর নির্ভর করেননি, বরং বিষয়ের অনুকূলে দ্রুত লয়ে তুলি চালনাতেই নির্মিত হয়েছে তাঁর নিজস্ব আঙ্গিক।

নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি ১৯৫৪

স্বদেশের শ্রমজীবী মানুষের এক অভিনব পরিচয় ধরা আছে ১৯৩৭-১৯৩৮-এ করা হরিপুরা পোস্টার নামে অভিহিত ছবিগুলিতে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নন্দলালের সংযোগ ভারতীয় রাজনীতি ও শিল্পের মধ্যে এক আদান প্রদানের সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছিল। ১৯৩৬ সালে গান্ধীজি নন্দলালকে আহ্বান করেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনে একটি প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য। নন্দলাল সেটা সফলভাবে করেছিলেন। পরের বছর মহারাষ্ট্রের ফৈজপুরে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশনের অনুষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণ নগরসজ্জার দায়িত্ব পালনের ভার দেওয়া হয়েছিল নন্দলাল বসুর ওপর। এড়ানোর চেষ্টা করেও নন্দলাল এবারও এড়াতে পারেন নি। বাঁশ ইত্যাদি সাধারণ গ্রামীণ জিনিস দিয়ে তিনি মণ্ডপ সাজিয়েছিলেন। সকলেরই তা মন কেড়েছিল। ১৯৩৮-এ আবার আমন্ত্রণ এল গুজরাটের হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশনে মণ্ডপ সজ্জার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে। এই কাজটি করতে গিয়ে নন্দলাল সারল্যময় এক অভিনব আঙ্গিক উদ্ভাবন করলেন। পটচিত্র নিয়ে প্রথম জীবনেও তিনি ভেবেছিলেন। ১৯০৮-০৯ সালে লৌকিক আঙ্গিকে ছবি এঁকে চারআনা করে দামে গ্রামের মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন (মৃণাল ঘোষ, ২০০৫:২৩৪)। অবনীন্দ্রনাথ এক টাকা করে কিনে নিয়েছিলেন অবশিষ্ট সব ছবি। তাঁর সাধারণ্যে শিল্প বিস্তারের সেই উদ্যোগ সেখানেই শেষ হয়।

হরিপুরার ছবিতে সেই পটচিত্রের আঙ্গিককে একেবারে নতুন জীবনে সঞ্জীবিত করলেন নন্দলাল। ভারতীয় রাজনীতিও তখন গান্ধীজির নেতৃত্বে গ্রামের জীবনের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে। শিল্পেও এসেছে লৌকিকের উজ্জীবন। হরিপুরার সুযোগে নন্দলালের ছবিতে লৌকিক সম্পৃক্ত এক নতুন দিক উদ্ভাসিত হল। প্রধান বিষয় হিসেবে এসেছিল নানা কাজে রত মানুষ। দিনকর কৌশিক এই চিত্রমালা নিয়ে বলেছেন,

> ভারতের জীবনভিত্তিক এই চিত্রমালিকা ‘হরিপুরা পোস্টার’ নামে এ দেশের শিল্পের ইতিহাসে একটি বিশেষ অবদান হিসাবে স্বীকৃত। বিষয় হিসাবে এতে দেখা যায়, মল্লবীর, শিকারী, যোদ্ধা, নারী, গৃহকাজ, মা ও শিশু, সূত্রধর, কামার, সুতো কাটিয়ে, ধান ভানা, গরু, ষাঁড় ও গ্রামের পশু। লোকশিল্পের সাবলীল স্ফূর্তিতে এই ছবিগুলি আঁকা হয়েছিল। মেজাজের দিক থেকে, লোকশিল্প হলেও এতে ধ্রুপদী-শিল্পসুলভ কারিগরি কুশলতা ও সৌকর্য দেখা যায় (১৯৯৫:৭৮)।

দ্রুত তুলির টানে আঁকা সমতল রঙে ভরাট রেখাঋদ্ধ এই ছবিগুলিতে অনুভব করা যায় ছন্দের অসামান্য বৈভব। এই বিবিধ কর্মময়তাকে হয়ত সর্বকাজে ভারতীয়দের পারদর্শিতার একটি দলিল হিসেবেও দেখা যায়, যা ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় নিজ জাতিসত্তার আত্মবিশ্বাস দৃঢ়করণের প্রতীকী কৌশল হিসেবেও বিবেচনা করা যায়।

ভিত্তিচিত্রের ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল শান্তিনিকেতন থেকে, তারও পুরোধা ছিলেন নন্দলাল। শান্তিনিকেতনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিচিত্র রয়েছে অনেক। ১৯৩০-এ শ্রীনিকেতনে করেছিলেন *হলকর্ষণ*, ফ্রেস্কো বুওনো পদ্ধতিতে। এই রচনাটিতে আয়তনময় ভরযুক্ত নৃত্যগীতরত মানুষের উপস্থাপনায় লৌকিকের সঙ্গে স্বাভাবিকতার সুন্দর মেলবন্ধন অনুভব করা যায়। কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষি যে এক গৌরব ও উদযাপনের বিষয় সে সত্যই হয়ত তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এখানে কৃষক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি কৌতূহল উদ্দীপক, যা দর্শককে আরও বৃহৎ পরিসরে ভাবতে উৎসাহ যোগায়।

রামকিঙ্কর বেইজ (১৯০৬-১৯৮০)

শ্রমজীবী মানুষের জীবন রামকিঙ্করের কাজের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছিল। কর্মময় মানুষের যে সচলতা-প্রাণোচ্ছলতা তা শিল্পীর কাছে ছিল এক বড় আকর্ষণ। তাঁর নিজের ভাষায়,

> চলমান কর্মরত মানুষ আমাকে খুব টানত। সাঁওতাল বা অন্যান্য সরল গরিব মানুষই তো আমাদের দেশের কাজের মানুষ। তাই তাঁরাই আমার মডেল। আর কী জানো, যাঁদের খেটে-খাওয়া মানুষ বলছ, তাঁদের মনের সরলতা, সহজ জীবন, শিক্ষা, নাচ-গান আমাকে উদ্দীপনা দিত, এখনও দেয় (২০১২:৫২)।

রামকিঙ্করের সাঁওতাল পরিবার (১৯৩৮)-এ দেখা যায় এক সাঁওতাল দম্পতি তাঁদের সন্তান, পোষ্য কুকুর ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে গন্তব্যের পথে ধাবমান। তবে তাদের গন্তব্য কোথায় তা নিয়ে ভিন্ন মত থাকতে পারে। কেউ দেখতে পারেন সারাদিনের কাজের শেষে তারা বাড়ির পথে ধাবমান (মৃণাল ঘোষ, ২০০৬:১২২), আবার কেউবা আরও বৃহৎ পরিসরে এই স্থানান্তরকে পর্যবেক্ষণ করেছেন (Janak Jhankar Narzary, 2005: 18)। জনক ঝংকার নার্জারী ত্রিশের দশকে ক্রম বর্ধিষ্ণু নগরায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে সাঁওতালদের আশ্রয়ের খোঁজে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে স্থানান্তরকে এ ভাস্কর্যের মূল উপজীব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে উল্লেখ্য যে চার বছর আগে নন্দলালের আঁকা *বোলপুরের পথে* চিত্রকর্মটিও তাঁর অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে। রাস্তার ধারে ভূমির সমতলে স্থাপিত এই ভাস্কর্যের অস্তিত্ব 'শিল্পবস্তু' হিসেবে যতটা না প্রকট হয়ে ওঠে, তার থেকে চলমান জীবনের প্রবর্ধিত রূপ হিসেবেই হয়ত একে অবলোকন ও অনুধাবনের অধিক সুযোগ তৈরি হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তেতাল্লিশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রামকিঙ্কর নির্মাণ করেন ধান ঝাড়া (১৯৪৩) ভাস্কর্যটি। ভাস্কর্যটিতে শ্রমকে মহিমান্বিত করে উপস্থাপনের জন্য রামকিঙ্কর নিচ থেকে নারী শ্রমিকের ভঙ্গিটি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এর আগে সুজাতা (১৯৩৫) ও সাঁওতাল পরিবার (১৯৩৮)-এ কোনও বেদি ব্যবহার না করলেও সম্ভবত এর মনুমেন্টাল গুণকে আরও বৃদ্ধির জন্য এক্ষেত্রে বেদির উপর ভাস্কর্যটিকে স্থাপন করেছেন। শক্তিশালী দুটি পা ও হাতকে শ্রমিক দেহের প্রতিনিধিত্বশীল অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের বিপরীতে উর্বরা শক্তি ও উৎপাদনশীলতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা যায় ভাস্কর্যটিকে। ভাস্কর্যগুলোকে প্রমাণ আকৃতি থেকে বড়ো আকারে নির্মাণের কারণ হিসেবে পুলক দত্ত উল্লেখ করেন,

> The fact that he chose to build more than life size, god-like working class people for public viewing itself was a political

act and an act of protest (Pulak Dutta, 2005: 30-31)

যদিও পরবর্তীতে ভাস্কর্যটির একটি ছোট প্রতিলিপি আননোন পলিটিক্যাল প্রিজনার (*Unknown Political Prisoner*) শিরোনামে নির্মিত হয়েছিল একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাকে উদ্দেশ্য করে এবং দুর্ভিক্ষের আসল বন্দি যে শ্রমিকশ্রেণী সে বিষয়ে শিল্পী ব্যাখ্যাও প্রদান করেছিলেন (Pulak Dutta, 2005: 31).

মহিমান্বিত শ্রমের এই উদযাপনকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কাঠামোতে যেমন ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনই রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের প্রথম দর্শক আদিবাসী সাঁওতালের কথাতেও বিশ্লেষণ করা যায় হয়ত,

> লোকে বলে সাঁওতাল কি আর আর্ট বোঝে? কথাটা ঠিক নয়। একদিনের কথা বলি। একজন মাঝি, দেখি খুব মন দিয়ে দেখছে, কখনও বহু দূরে চলে যাচ্ছে, আবার কাছে আসছে, চারদিকে ঘুরছে- যেটা সকলে সাধারণত করে না। আমি ভারাতে কাজ করছিলাম। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী করছিস বাবু?'
> আমি বললেম, 'এই তোদের মতন একটি মাঝি করার চেষ্টা করছি।'
> লোকটি হেসে বলল, 'হাঁ, খেতাবটা মাঝি বট্যে, কিন্তু হইচে দেত্তা।'- এ মন্তব্যটি আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছিল (রামকিঙ্কর বেইজ, ২০১২:৩২৩)।

আনন্দ না থাকলে আদর্শ দিয়ে হয়ত শ্রমকে এভাবে শিল্পকলায় উদযাপন করা যায় না। এখানেই রামকিঙ্কর সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের রীতিনিষ্ঠ শিল্পী না হয়েও সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে রূপায়িত করতে সমর্থ হয়েছেন।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৮০)

যদিও বিনোদবিহারী সামাজিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে খুব সরাসরি নিজ কাজে উপস্থাপনের বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না, তবে শান্তিনিকেতনের হিন্দি ভবনের দেয়ালে করা ভিত্তিচিত্র মধ্যযুগের সন্তরা (১৯৪৬-১৯৪৭)-তে সম্ভবত তিনি সবচেয়ে বেশি এ ধরনের বিষয়কে উপজীব্য করেছিলেন (R. Siva Kumar, 1995:55)। মধ্য যুগে ভারতে যে ধর্ম আন্দোলন হয়েছিল, তা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে গড়ে তুলেছিল ঐক্যের সূত্র। বিনোদবিহারী সেই মানবিক ঐক্য ও সমন্বয়েরই জয়গান গেয়েছেন এখানে।

তৎকালীন সময়ে সাম্প্রদায়িক হিংসার উন্মত্ততায় দেশ যখন উদভ্রান্ত, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে করা এই কাজটিতে তিনি দেখালেন ভারতবর্ষের চৈতন্যের মহত্বের মূল স্বরূপকে। মানবিক মূল্যবোধের এই প্রতীকী উপস্থাপনার সঙ্গে বহুদৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিত বিন্যাস, জ্যামিতিক গাঠনিকতা, সব মিলে রূপ বিন্যাসের দিক থেকেও এই ভিত্তিচিত্রের উপস্থাপনা অনন্য। সন্তদের ভিত্তি করে এর পটভূমি গড়ে উঠলেও তা সমাজজীবনের রূপায়ণে সার্থকতা লাভ করেছে। ধর্ম যে সমাজজীবনে বিকশিত হয়ে ওঠা এক সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ তাই যেন এখানে প্রতিফলিত হয়েছে,

বিনোদবিহারী ও সত্যজিৎ

The descriptive incidents get smothered in a great sense of flux;the personalities lose identity in the stupendous human pageant; it is the protrait of a whole society in movement, an ageless and immemorial society, with a exasperating variety of culture and custom, in which there were no dividing lines between religion and life (K.G. Subramanyan, 2006:97).

ভারতীয় সমাজবাস্তবতার দৈনন্দিন আবহে রামানুজ, কবীর, তুলসীদাস, সুরদাস ও গুরু গোবিন্দ সিং-এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শিল্পী এখানে সন্তদের চরিত্র নির্মাণে নাটকীয়তার পরিমিত ব্যবহার করেছেন যাতে অতিরিক্ত আধ্যাত্মিকতায় সমাজজীবনের

মূল সুরটি বিঘ্নিত না হয়। (Gulam Mohammed Sheikh, 1983:14)

এ ছাড়াও শান্তিনিকেতনের ছাত্রাবাসের উত্তর-পশ্চিম ব্লকের ছাদে বিনোদবিহারীর করা ম্যুরালটিতে বীরভূমের প্রকৃতির মাঝে স্থানীয় জনজীবনের উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। চৌকোণা একটি পুকুরকে ঘিরে প্রকৃতি, প্রাণী ও মানুষের এক স্থানিক বৃহত্তর 'সমাজচিত্র' চিত্রিত হয়েছে যেখানে শুধু মানুষই নয় অন্যান্য প্রাণ-প্রকৃতিও সমান গুরুত্ব পেয়েছে (R. Siva Kumar, 1995:31)।

শান্তিনিকেতনের জনজীবন ও প্রাত্যহিকতার অনন্য দলিল হিসেবে গণ্য হতে পারে নন্দলাল, রামকিঙ্কর ও বিনোদবিহারীর করা অসংখ্য রেখাচিত্র ও খসড়াগুলো। স্থানীয় প্রাণ-প্রকৃতি ও জনজীবনের অনুশীলনকে যে এই শিল্পীত্রয় অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক 'বস্তু'রূপ অনুশীলন থেকে বেরিয়ে শিল্পীর সংবেদনশীল সম্পৃক্ততায় তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন তার বড়ো উদাহরণ হয়ে আছে এই কাজগুলো।

সহায়কপঞ্জি

বাংলা

আর. শিব কুমার (২০১৮ [১৯৯৭])। *শান্তিনিকেতনে শিল্পচর্চা প্রাসঙ্গিক আধুনিকতার রচনা* (অনুবাদ শিবাদিত্য সেন)। কারিগর, কলকাতা।

দিনকর কৌশিক (১৯৯৫)। *নন্দলাল বসু ভারতশিল্পের পথিকৃৎ* (অনুবাদ: শোভন সোম)। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লী।

মৃণাল ঘোষ (২০০৫)। *বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা আধুনিকতার বিবর্তন*। প্রতিক্ষণ, কলকাতা।

(২০০৬ [১৯৯৫])। *সমকালীন ভাস্কর্য। প্রতিক্ষণ, কলকাতা।*

রামকিঙ্কর বেইজ (২০১২ [২০০৫])। *আমি চাক্ষিক, রূপকার মাত্র*। সংকলন ও বিন্যাস: সন্দীপন ভট্টাচার্য। মনফকিরা, কলকাতা।

শোভন সোম ('১৯৮৫)। তিন শিল্পী। বাণীশিল্প, কলকাতা।

(১৯৯৮)। শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত। প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, নিউ দিল্লী।

ইংরেজি

Gulam Mohammed Sheikh (1983), "*Viewer's View: Looking at Pictures",*

Journal of Arts and Ideas (ed. G.P. Deshpande). Number 3, April-June 1983, New Delhi.

Janak Jhankar Narzary (2005). “Ramkinkar Baij-An Assessment”, *Nandan An Annual on Art and Aesthetics* (ed. Dipak Bhattacharya), Department of Art History, Kala Bhavana, Visva Bharati, Santiniketan, Vol. XXV. p. 14-21.

K.G. Subramanyan (2006 [1978]). *Moving Focus Essays on Indian Art.* Seagull Books, Calcutta. Pulak Dutta (2005). “Ramkinkar’s Environmental Sculpture: a personal response”. *Nandan An Annual on Art and Aesthetics* (ed. Dipak Bhattacharya). Department of Art History, Kala Bhavan, Visva Bharati, Santiniketan. Vol. XXV. p.26-35.

R. Siva Kumar (1995). “The Santiniketan Murals: Brief History”. The Santiniketan Murals by Jayanta Chakrabarti, R. Siva Kumar & Arun K. Nag. Seagull Books published in association with Visva-Bharati, Calcutta, p. 5-78.

পোশাক পরিকল্পনায় সত্যজিৎ এবং খেরোর খাতা

সুদীপ্ত মিত্র

লর্ড আউট্রামের ঘর

এই প্রবন্ধ শুরু করার আগে নিজের পেশা সম্বন্ধে সত্যজিৎ রায়ের কী মতামত ছিল সেটা তাঁর মুখ থেকেই আগে শুনে নেওয়া যাক।

‘আমার পিতামহ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ অথচ স্বশিক্ষিত চিত্রকর ও অলঙ্করণশিল্পী যাঁর দক্ষতা ও খ্যাতি ছিল সুদূরপ্রসারী। আমার পিতৃদেবও ছিলেন একজন চিত্রকর যিনি শিল্পী হিসেবে কখনও কোনও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেননি। তাঁর নিজের লেখা মজাদার ছড়াগুলোতে এমন এক শৈলীতে অলঙ্করণ করতেন, যাকে কেবল ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা হিসেবেই ব্যাখ্যা করা যায়। হয়তো সেই সূত্রে

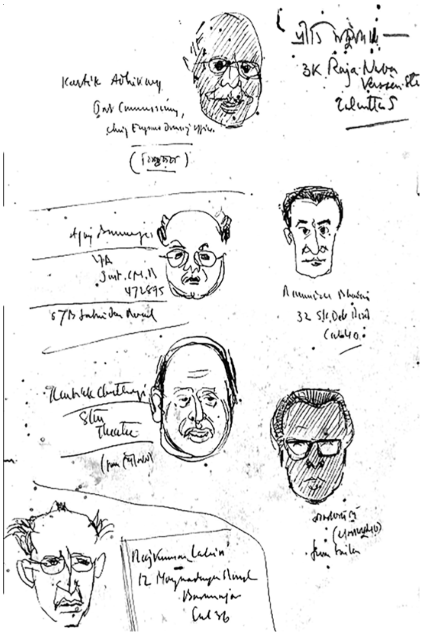

পরিচিত লোকের মুখ এঁকে রাখতেন সত্যজিৎ ভবিষ্যতে ছবিতে নেওয়ার জন্য

খুব অল্প বয়স থেকেই আমি ছবি আঁকার সহজাত একটা দক্ষতা আয়ত্ত করে ফেলেছিলাম, সুতরাং সেটা কোনও অবাক হওয়ার মতো ঘটনা নয়। যদিও শান্তিনিকেতনের কলাভবনে নন্দলাল বসুর অধীনে আমি প্রায় তিন বছর ধরে ছবি আঁকার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম, তবুও শেষ পর্যন্ত আমার এক পূর্ণাঙ্গ চিত্রশিল্পী হয়ে ওঠা হয় নি। পরিবর্তে, আমি একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই এবং একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করা শুরু করি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি উপলব্ধি করি যে যেহেতু একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা তার ক্লায়েন্টের চাহিদার কাছে সর্বদাই দায়বদ্ধ, তাই একজন বিজ্ঞাপনশিল্পীর খুব কম ক্ষেত্রেই তার কাজে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ থাকে। এই উপলব্ধির সূত্রেই আমি চলচ্চিত্র নির্মাণের পেশায় যুক্ত হই এবং এই পেশায় কাজ করে আর যাই হোক, আমি আমার নিজস্ব ভাবনা ও সৃজনশীলতাকে স্বাধীন ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাই। কোনও চলচ্চিত্রের প্রস্তুতিপর্বে আমি আমার 'শুটিং স্ক্রিপ্ট'-এর জন্য স্কেচ আঁকা, সিনেমার সেট এবং পোশাক পরিকল্পনা করা, এমনকি আমার নিজের চলচ্চিত্রের পোস্টার ডিজাইন করার মধ্যে দিয়েও আমার চিত্রশৈলী ও গ্রাফিক-ভাবনাগুলোকে সার্থক রূপ দিতে শুরু করি'....। দিল্লির The Village Galleryতে অনুষ্ঠিত সত্যজিতের শিল্পকলা নিয়ে তাঁর একক প্রদর্শনীর কিউরেটর ডলি নারাঙকে লেখা প্রদর্শনীর ক্যাটালগের মুখবন্ধের প্রতিটি কথাই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। মূল ইংরেজিতে লেখা এই ছোট্ট মুখবন্ধের কিছু লাইন অনুবাদ করে পাঠকদের জন্য তুলে ধরলাম।

একটা কথা স্পষ্ট, বিজ্ঞাপনের গতে বাঁধা কাজে কোনও উৎসাহ পান নি সত্যজিৎ, বরং মানিকবাবুর পছন্দ অলংকরণ এবং ক্যালিগ্রাফি জাতীয় কাজ।

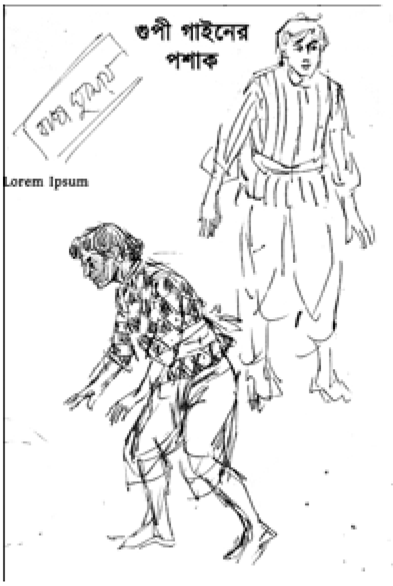

সত্যজিতের নিজের গল্পে বা সন্দেশ পত্রিকার অলংকরণ, প্রচ্ছদ শিল্প, প্রচ্ছদের ক্যালিগ্রাফি, এমন কি তাঁর নিজস্ব সিনেমার বিজ্ঞাপনের পোস্টার থেকে টাইটেল কার্ড - এই সব বিষয়গুলো নিয়ে বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিরা চর্চা করেছেন, কিন্তু যে বিষয়ে চর্চার এখনও কিছুটা খালি জায়গা থেকে গেছে সেটা হলো সিনেমায় মানিকবাবুর অভিনব পোশাক পরিকল্পনা।

সিনেমার প্রত্যেকটি অভিনেতা অভিনেত্রীর ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ ছবির চরিত্র বিন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গল্পের বয়ান তৈরীর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কোনও নির্দিষ্ট চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পরিচালক যেসব মাধ্যমের সাহায্য নেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চরিত্রের পোশাক-আশাক। সিনেমার ভাষায় costume পোশাক মূলত চরিত্রের বা দৃশ্যের তিনটে বিষয়কে চিহ্নিত করে এবং সেটা সিনেমার পরিভাষায় বলে 3P - অর্থাৎ People, Place এবং Period। চলচ্চিত্রের একটি চরিত্রকে ঠিকঠাক রূপায়ণ করতে যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন, তার মধ্যে চরিত্রের পোশাক-পরিকল্পনা, কেশবিন্যাস এবং তার মেকআপ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধরুন হাল্লা রাজার মন্ত্রীমশাই। মন্ত্রী আসলে দস্যু সর্দার, সেটা তার জাঁদরেল গোঁফজোড়া এবং লম্বা কেশবিন্যাস দেখলেই চিহ্নিত করা যায়। বিশাল বপুর মন্ত্রীমশাইকে তার স্বভাবের মতো আরও স্থূল দেখানোর জন্য তার পোশাকটিতে সাদা কালো সমান্তরাল ডোরা কাটা হয়েছে। অতএব দৃষ্টির বিভ্রান্তিতে যে কোনও মানুষকে পর্দায় আরও স্থূল দেখাবে। এছাড়া বেশ কিছু মানুষের সমষ্টিগত পোশাকের নকশা একটি জায়গাকে বা Placeকে বিশেষ করে নির্দিষ্ট করে। এখানেও শুন্ডি রাজ্যের বাজার এলাকার দৃশ্যর কথা মনে করুন, অনেকটা যেন মধ্য এশিয়ার কোনও শহরকে ইঙ্গিত করে এই দৃশ্যে কোনও সংলাপ নেই, শুধু বাজারের মানুষজনের পোশাক-আশাক দেখলে বোধহয় এটা মধ্য প্রাচ্যের কোনও রাজ্য।

এবার আসছি শেষ P অর্থাৎ Period এর কথায়। আবার সত্যজিৎ প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সিনেমায় period sense-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ *শতরঞ্জ কে খিলাড়ি* ছবিতে নবাবি লখনউ-এর চরিত্রের মেকআপ এবং পোশাক পরিকল্পনা। এখানে একটা বা দুটো চরিত্রের জন্য নয়, সমষ্টিগত প্রচুর মানুষের পোশাক পরিকল্পনা এবং উপযুক্ত মেকআপের প্রয়োজন হয়। কোনও ঐতিহাসিক সময়ের দৃশ্যের পোশাক তৈরী করতে গেলে সমকালীন ইতিহাসের ওপর পুরদস্তুর দখল থাকা প্রয়োজন। period filmএ পোশাক এবং তার সঙ্গে কেশবিন্যাসের এক সুচিন্তিত সমন্বয়ের খুবই প্রয়োজন। তবে এই ধরনের পোশাক পরিকল্পনা যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। *শতরঞ্জ কে খিলাড়ি*র শেষ দৃশ্যে Brigadier Wheelerএর সৈন্য বাহিনীর প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাটজন সৈন্যের জন্য একই ধরনের পোশাক নির্মাণ করতে হয়েছে, ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। ঠিক এরকমই দৃশ্য আমরা দেখেছি কেতন মেহতা নির্দেশিত *মঙ্গল পান্ডে* ছবিটিতে, যেখানে পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্বে ছিলেন লভলিন বেইনস (Loveleen Bains)। সিনেমায় period costume পরিহিত প্রায় শ' খানেক সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমন্বয় পর্দায় দৃশ্যমান। অথবা

বিশাল বাজেটের period film ১৯৬০ সালে নির্মিত আসিফ করিম পরিচালিত *মুঘল-ই-আজম* সেখানে পোশাক পরিকল্পনায় এবং অঙ্গসজ্জায় ছিলেন বি এন ত্রিবেদী।

নিঃসন্দেহে সত্যজিতের শৈল্পিক সত্তার গোড়াপত্তন শান্তিনিকেতনে। সুতরাং রবীন্দ্রভাবধারায় প্রসূত শান্তিনিকেতনের সৃজনশীল পরিবেশে সত্যজিতের শিল্পী সত্তার বিকাশ ঘটেছে। এখানে প্রকৃতির ভাষাই ছিল শিল্পীর ভাষা এবং প্রকৃতির রূপই ছিল শিল্পীর অগ্রাধিকার। সেই শান্তিনিকেতনের প্রথানুসারেই হোক অথবা পিতৃকুলের শিল্পচর্চার ধারা মেনেই হোক, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে simplicity অথবা সারল্যই ছিল প্রথম এবং প্রধান বৈচিত্র। এই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন মাস্টারমশাই নন্দলাল এবং শিক্ষক বিনোদবিহারীর কাছ থেকে। ঠিক সেই প্রতিফলনই বার বার পরিলক্ষিত হয়েছে সত্যজিতের চলচ্চিত্রের শিল্পবিন্যাসেও। জীবনের প্রথম চলচ্চিত্র *পথের পাঁচালীর* কথা ধরা যাক। সম্পূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশের প্রতিটি দৃশ্যায়নের চিত্রলৈখিক খসড়া সত্যজিৎ আগেই করে রেখেছিলেন। এই ছবির পোশাক পরিকল্পনা নিয়ে আপাত দৃষ্টিতে খুব সাধারণ গ্রামীণ স্টাইল মনে হলেও, গ্রাম্য জনজীবন নিয়ে শিল্পীর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাই বার বার প্রকাশ পায়। পথের পাঁচালীর দৃশ্যায়নের পরিকল্পনা সত্যজিৎ আগেই করে রেখেছিলেন বিভূতিভূষণের *আম আঁটির ভেঁপুর* অলংকরণের সময়। গ্রাম্য পরিবেশের দৃশ্য এবং গ্রামীণ জনজীবনের পোশাক পরিচ্ছদ কেমন হতে পারে তার সম্যক ধারণা সত্যজিতের আগে থেকে ছিল শান্তিনিকেতনে থাকার সুবাদে। তার ওপর মাস্টারমশাইয়ের আঁকা *সহজপাঠ*এর woodcutতো সর্বদাই চোখের সামনে ভাসছে। তা ছাড়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামীণ পরিবেশের detailing তো আছেই তা' না হলে ইন্দির ঠাকুরণের কস্টিউম ডিজাইন কেমন হবে, সেটা পরিকল্পনা করা অতো সহজ হতো না। Simplicityর এই একই ধারা একনাগাড়ে চলে আসছে সত্যজিতের দ্বিতীয় ছবি *অপরাজিত* থেকে ১৯৬৭এর শহর কেন্দ্রিক *চিড়িয়াখানা* পর্যন্ত।

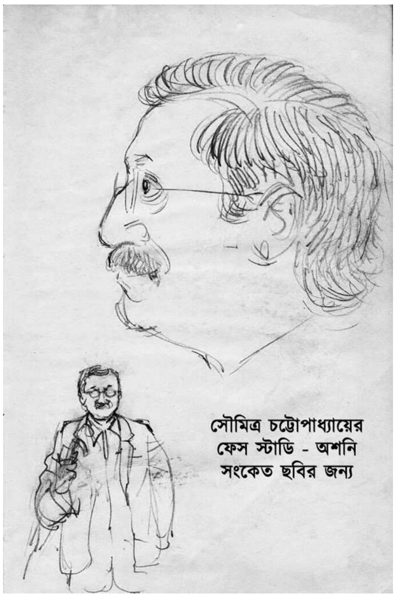

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ফেস স্টাডি - অশনি সংকেত ছবির জন্য

পথের পাঁচালী থেকে *চিড়িয়াখানা*, এই প্রথম সতেরোটি ছবির (এর মধ্যে একটি তথ্যচিত্র এবং একই স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ধরে) পোশাক পরিকল্পনা, মেকআপ এবং চরিত্রায়নের গঠন প্রণালী নিয়ে আলাদা করে আলোচনার কিছু নেই, শুধু ব্যতিক্রমী তিনটি ছবির কথা এখানে উল্লেখ্য - '৫৮ সালে *জলসাঘর*, ৬১ সালে তথ্যচিত্র *রবীন্দ্রনাথ* এবং *'৬২র কাঞ্চনজঙ্ঘা*। *জলসাঘর*-এর লোকেশন নিমতিতার রাজবাড়ীর অন্দরে গিয়ে সত্যজিৎকে কিছুটা হলেও সমকালীন যুগ থেকে পিছিয়ে তৎকালীন বর্ধিষ্ণু জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়ে উঠতে হয়েছে। এই ছবিতেই সত্যজিৎ-এর পিরিয়ড ফিল্মের হাতে খড়ি। জমিদারবাড়ির প্রাচীন আসবাব পত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পোশাক পরিকল্পনায় বেশ কিছুটা অভিনবত্ব চোখে পড়ে। সেই সঙ্গে '৬০ সালে *দেবী* ছবিতেও ছবির পরিবেশে, পোশাক পরিচ্ছদে এবং set designএ খানিকটা বর্ধিষ্ণু পরিবারের ছাপ রয়েছে। ১৯৬০ সালে সত্যজিৎ ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে *দেবী* ছবিটির প্রসঙ্গ এনেছিলেন। ছবিটিতে পোশাক পরিকল্পনায় তেমন আড়ম্বর না থাকলেও, *খেরোর খাতায়* ছবির নামটা পোস্টারে বা বিজ্ঞাপনে কীভাবে লেখা হবে, তা নিয়ে বিস্তর ভাবনা চিন্তা করেছেন সত্যজিৎ। অক্ষরশিল্প নিয়ে অনেকগুলো নকশা এঁকেছেন। বাংলা অক্ষরগুলোর মাত্রা একটা মন্দিরের চূড়ার আকৃতিতে এঁকেছেন। *দেবী* শিরোনাম লেখার মধ্যে কালীর ত্রিনয়নও এক জায়গায় দেখানো হয়েছে। সংলাপের কয়েকটা খসড়া আর কিছু আঁকিবুঁকি *খেরোর খাতার* পাতায় দেখা যাচ্ছে। একটা আঁকিবুঁকিতে ইংরেজি 'এস' আর 'আর' অক্ষর লক্ষণীয়, হয়তো এস আর প্রোডাকশনস-এর লোগো আঁকার কথা ভাবছিলেন সত্যজিৎ।

এই সময়ের মধ্যে দুটো ছবি সত্যজিৎ করেছেন রবীন্দ্রযুগের আঙ্গিকে - ৬১ সালে *রবীন্দ্রনাথ* তথ্যচিত্র এবং '৬৪ সালে *চারুলতা*। এই দুটি ছবি রাবীন্দ্রিক যুগের

কাঞ্চনজঙ্ঘা

'পিরিয়ড ফিল্ম' যেখানে নির্ভেজাল ব্রাহ্ম পরিবারের সদস্যদের পোশাক পরিকল্পনা করেছেন সত্যজিৎ। এই পরিকল্পনাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন শিল্পী যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র চোখে দিলেও খুঁত বের করা যায় না। সত্যজিতের পারিবারিক অভিজ্ঞতার সূত্রে বাস্তবে এবং সিনেমায় ব্রাহ্ম পরিবারের detailingএ পরিপূর্ণতা থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। রবীন্দ্রযুগের চরিত্র নির্মাণে সত্যজিৎ আরও একবার তাঁর মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তাঁর *ঘরে বাইরে* ছবিটি করতে গিয়ে। দু'একটা দৃশ্য বাদ দিলে, প্রায় সম্পূর্ণ ছবিটাই ইন্ডোরে দৃশ্যগ্রহণ হয়েছে। অবশ্যই ছবিটি সত্যজিতের তৃতীয় 'টাইম পিরিয়ড' সিনেমা। রবীন্দ্রযুগের পোশাক পরিকল্পনায় সত্যজিৎ অদ্বিতীয়ম, তার নমুনা আমরা *চারুলতা* থেকে *রবীন্দ্রনাথ,* সর্বত্রই দেখেছি। তবে এই ছবিতে দুটো ব্যতিক্রমী দিক আছে - এক, রাবীন্দ্রিক পরিবেশ ছাড়া ছবিতে স্বদেশীয়ানার দিকটাও এসেছে এবং দুই - ছবিটা রঙিন। আলো আঁধারিতে পোশাক পরিচ্ছদের অনেক বেশি গাঢ় রং ব্যবহার করেছেন সত্যজিৎ। আলাদা করে বিমলার পোর্ট্রেট স্টাডিও করেছেন *খেরোর খাতায়*।

এখনও পর্যন্ত প্রথম সতেরোটি ছবির সেট পরিকল্পনা, শিল্পীদের পোশাক, মেকআপ - এই সবকিছুই কোনও ভালো পরিচালকের বাংলার মূলধারার চলচ্চিত্র থেকে উৎকর্ষ হলেও খুব বেশি পার্থক্য কিন্তু ছিল না। এখানে চরিত্রের মেকআপ নিয়ে

একটু ছুঁয়ে যাওয়া দরকার। সত্যজিৎ চরিত্রের মেকআপের ব্যাপারে অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন, সেটা অনেকেই জানেন। এক মাত্র পিরিয়ড ফিল্মে তখনকার দিনের গোঁফের স্টাইল বা ব্রাহ্ম পরিবারের মতো দাঁড়ি লাগিয়ে অঙ্গসজ্জা করা ছাড়া মেকআপ বাক্সটিকে সত্যজিৎ বরাবরই সযত্নে সরিয়ে রেখেছেন। যেমন ধরুন সদ্য জলবসন্ত থেকে সেরে ওঠা উত্তমকুমারকে মেকআপ নিতে বারণ করা বা নায়িকাকে মেকআপ ছাড়া সাধারণ প্রসাধনী লাগিয়ে অভিনয় করানোর মধ্যে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা আছে। এখানে একটু হলেও ব্যতিক্রম '৬২ সালে মুক্তি প্রাপ্ত অভিযান ছবিতে নরসিংহের চরিত্রটি। একজন জাঠ ড্রাইভারের ভূমিকায় সাতাশ বছরের সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের এটা ছিল অষ্টম ছবি। একটি নমনীয় ছাত্রসুলভ চেহারার সাতাশ বছরের যুবককে একজন শক্ত পোক্ত কঠিন চেহারার জাঠ 'সিংজি'তে রূপান্তর করতে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ লাগে। চাপ দাঁড়িতে মুখের মেকআপ এবং মানানসই লম্বা জোব্বা জাতীয় পোশাক পরিকল্পনার মধ্যে শিল্প মননের ছাপ স্পষ্ট। এর জন্য চাই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং চরিত্রের খুঁটিনাটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। নরসিংহ ধরনের মেকআপে closeup shot, বিশেষ করে কোনও আবেগ জনিত মুহূর্তে, গ্রহণ করতে কতোটা সতর্ক হতে হয়, সেই ব্যবহারিক দিকটা সত্যজিৎ স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

এবার আসি *কাঞ্চনজঙ্ঘা* ছবির কাজে। মাত্র দশজন প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে এক দিনের গল্প নিয়ে ছবি, পর্দায় সত্যজিতের প্রথম রঙিন অভিযান। *কাঞ্চনজঙ্ঘা* ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সত্যজিৎ খোদ দার্জিলিং-এর মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে বসে আর নিচে লেখা আছে মাউন্ট এভারেস্ট হোটেল, রুম নং ৮৮,২১/১০/১৯৬১। কস্টিউম ডিজাইন বা সেট পরিকল্পনায় কোথাও কোনও বাহুল্য নেই, মেকআপে কোথাও কোনও চটকদারী নেই, রঙিন ছবিতে রঙের কোনও ঝলকানি নেই। এক তথাকথিত উচ্চ মধ্যবিত্ত, রুচিশীল সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবারের গল্পে যতটুকু বাহুল্য থাকতে পারে, সেটুকুই ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার সেই simplicity, অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে মুক্তি প্রাপ্ত প্রথম রঙিন বাংলা ছবির নায়িকার মতো ডজন খানেক 'ঝলমলে রঙিন' শাড়ি বদলানোর কোনও বালাই নেই সত্যজিতের।

'৬৬ সালে নির্মিত *নায়ক* ছবির *খেরোর খাতায়* সত্যজিৎ ডিটেলে ট্রেনের কামরার ছবি পর্যন্ত এঁকে রেখেছিলেন আর চরিত্রগুলো কে কোথায় থাকবে, অর্থাৎ ফার্স্টক্লাস কুপে, চেয়ার কারে, ডাইনিং কারে - একেবারে তাদের সিট নম্বর মিলিয়ে ছকে

রেখেছিলেন।

১৯৬৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সত্যজিতের আঠারোতম ছবি *গুপী গাইন বাঘা বাইন* নিয়ে আলোচনা করার আগে সত্যজিতের *খেরোর খাতার* সঙ্গে একটু পরিচয় করে নেওয়া দরকার। এই বিষয়ে পরিচালক গৌতম ঘোষ সত্যজিৎ রায়ের *খেরোর খাতা* নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা কী বলেছিলেন সেটা একবার শুনে নেওয়া যাক।

''আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মানকিদার সেই বিখ্যাত লাল রঙের 'খেরোর খাতা'গুলো নেড়েচেড়ে দেখার। মানিকদাকে নিয়ে আমার তথ্যচিত্র ওঁর খেরোর খাতাগুলোর মধ্যে দিয়ে এক পরিক্রমা বলা যায়। খাতাগুলো খুঁটিয়ে দেখার বিরল অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। সেই লাল মলাটের খাতাগুলো শুধু তাঁর সিনেমার চিত্রনাট্যের খাতাই ছিল না; বরং এক কথায় সেগুলো ছিল মানিকদার 'ওয়ার্ক স্টেশন' বা কর্মকেন্দ্র। সেখানে শুধু তাঁর বিশদ চিত্রনাট্যই থাকত না, বরং অন্যান্য গল্পের নানা টীকা-টিপ্পনী, অলঙ্করণ, পোশাক পরিকল্পনা, লোগো এবং চরিত্রের স্কেচও থাকত। এমনকি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা অভিনেতাদের তিনি চটজলদি স্কেচ এঁকে ফেলতেন সেই খাতাতে। আর থাকত নানা গাণিতিক হিসাববিকাশ। *পথের পাঁচালী* নির্মাণের সময় প্রথম ছবি বলেই কিনা জানি না, তিনি কোনও 'খেরোর খাতা' ব্যবহার করেননি। তবে *অপরাজিত*'র পরিকল্পনা থেকেই তিনি তাঁর এই লাল খাতার সদ্ব্যবহার করা শুরু করেন। এই বাতিকটা মানিকদা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর পিতৃদেব সুকুমার রায়ের কাছ থেকে। সুকুমার রায়েরও ঠিক এই রকমই একটা লাল রঙের খাতা ছিল, যার নামকরণ করেছিলেন 'ফালতু খাতা' অথবা 'জাবেদা খাতা' আর তাতে ছিল তাঁর সমস্ত টীকা, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিবিধ বিষয় নিয়ে লেখা। মানিকদা *অপরাজিত* থেকে শুরু করে তাঁর শেষ চলচ্চিত্র *আগন্তুক* পর্যন্ত এই লাল খাতাগুলো ব্যবহার করে গেছেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, লাল খাতার একেবারে শেষ পৃষ্ঠার উল্টো দিকের পাতায় রোজের ব্যবহৃত কিছু ওষুধের নামও লিখে রাখতেন। সেই লাল খাতাগুলোর পাতায় পাতায় লেখা থাকতো নানা ধরনের তথ্য। সেই খেরোর খাতার মধ্যে দেখা যায় তাঁর লেখা চমৎকার সব চিত্রনাট্য যার প্রতিটি ধাপের পাশেই আঁকা রয়েছে ছোট ছোট ফ্রেম বা দৃশ্য-কাঠামো। সেই সঙ্গে রয়েছে পোশাক-পরিচ্ছদ ও রূপসজ্জার নকশা বা এক কথায় বলতে গেলে সবকিছুই। *শতরঞ্জ কে খিলাড়ি*র জন্য ব্যবহৃত লাল খাতাটিতে ভারতীয় ব্রিটিশ সৈন্যদের বিস্তারিত চিত্রাঙ্কন এবং লখনউয়ের

পোশাক-আশাকের নকশাও স্থান পেয়েছে। আর *গুপী গাইন বাঘা বাইন*-এর *খেরোর খাতায়* রয়েছে নানা ধরনের গতিবিধি বা চরিত্রের অঙ্গভঙ্গির স্কেচ এবং মানিকদার প্রস্তাবিত সব চলচ্চিত্রের পরিকল্পনা ও কোরিওগ্রাফ করা দৃশ্যের চিত্ররূপ। সবকিছুই ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও নিখুঁতভাবে সাজানো''। (প্রতিদিন রোববার.in August 30, 2025)।

এই প্রতিবেদককে অনেকটা একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন গুপী গাইনের নায়ক নবাগত তপেন চট্টোপাধ্যায়। সত্যজিৎ তাঁর সিনেমায় নির্বাচিত গল্পের কোনও বিশেষ চরিত্রকে নিজের কল্পনায় প্রথমে স্কেচ করতেন, এবং এই স্কেচ অনুযায়ী উনি বাস্তব চরিত্রের অনুসন্ধান করতেন। ঠিক সেই রকমই নিজের আঁকা গুপীর চরিত্রের সঙ্গে অসম্ভব মিল পেয়েছিলেন বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করা তপেন চট্টোপাধ্যায়ের মুখের। তপেনবাবু অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের পরে এবং মানিকদার আশ্বাসে অবশেষে রাজি হয়েছিলেন ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রটি রূপায়ণ করতে। বাকিটা তো বাংলা সিনেমার ইতিহাস। *শতরঞ্জ কে খিলাড়ি*র প্রযোজক সুরেশ জিন্দাল তাঁর আত্মকথা *My Adventures with Satyajit Ray*এ এই ধরনের একটা মজার কাহিনী শুনিয়েছিলেন। বিভিন্ন হাতে আঁকা ছবির নমুনা দেখে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহর মুখের আদলকে সনাক্ত করেছিলেন সত্যজিৎ। সেই স্কেচের সঙ্গে মিলিয়ে ওয়াজিদ আলির চরিত্রে হিন্দি ছবির কৌতুক অভিনেতা আসরানির কথা মাথায় রেখেছিলেন। সুরেশ জিন্দালের আবার পছন্দ আমজাদ খান। আমজাদ অবশ্য বছর দুয়েক আগে *শোলে*তে অভিনয় করে দেশ জুড়ে সর্দার গব্বর সিংহের image গড়ে তুলেছেন। সুরেশও নাছোড়বান্দা। অবশেষে সত্যজিৎ আমজাদের ছবির ওপর তাঁর সৃষ্টি ওয়াজিদ আলি শাহের পোশাক, কেশ বিন্যাস, অলংকার ইত্যাদি স্কেচ করে ট্রায়াল দেন। একবারেই পছন্দ হয়ে গেলো আমজাদের মুখমণ্ডলী। তৈরী হলো সত্যজিতের জীবনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি *শতরঞ্জ কে খিলাড়ি*।

নাগরিক দুর্নীতির কাছে মূল্যবোধের আত্মসমর্পণ নিয়ে সত্যজিৎ শংকরের উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৭৫ সালে *জন অরণ্য* নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে বিশুদার ভূমিকাটি ছিল নায়ক সোমনাথের উপদেষ্টার। *খেরোর খাতায়* সত্যজিৎ সহজ লাইনের পেন্সিল স্কেচের মাধ্যমে বিশুদার চরিত্রটিকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গল থেকে মেকআপ সহ profile study করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন প্রোফাইল স্কেচের রেখাবিন্যাস থেকেই বোঝা যায় সত্যজিৎ কত নিখুঁত ভাবে চরিত্রের মুখের অভিব্যক্তিগুলো লক্ষ করতেন।

ফিরে আসি *গুপী গাইন বাঘা বাইন*-এর কথায়। শুধু সত্যজিতের জীবনেই নয় অথবা বাংলা সিনেমাতেই নয়, এই ধরনের breakthrough সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই প্রথম। ছোটদের গল্প হলেও এটাই সত্যজিতের বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়া একটি জোরালো রাজনৈতিক বার্তা এবং সেটা উপস্থাপিত হয়েছে ছোটদের মজার সিনেমা হিসেবে। উপেন্দ্রকিশোরের গল্পের পাঠক সাধারণত ছোটরা, কিন্তু আমাদের দেশে ছোটদের মজার সিনেমা দেখার চল নেই। তাই সত্যজিৎ রায় মূলত কিশোরদের জন্য ছবিটি তৈরি করলেও বিষয়ের উপস্থাপনায় ছোট-বড় সকলের কাছেই সেটি সমান আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ খুঁজে পান। এই ধরনের সেট এবং পোশাক পরিকল্পনা ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে প্রথম। ছবির প্রস্তুতিপর্বে সত্যজিতের শিল্প উদ্ভাবনা, সেট ডিজাইন, পোশাক পরিকল্পনা, মেকাপ থেকে শুরু করে পরিকল্পিত ছবির দৃশ্যায়ন এবং camera angle এর আগাম ভাবনা এবং অনুশীলন সিনেমা শিল্পে এক অভিনব নিদর্শন এবং অবশ্যই এক নয়া মাইলফলক। এই ছবির পরিকল্পনা এবং চিত্রায়নের নকশায় সত্যজিতের লাল মলাটে মোড়া *খেরোর খাতা*খানা ফুলে ফেঁপে ভরে উঠেছে। ঠিক কী আছে সেই খাতায়? কী না নেই - পোশাক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে, গানের নোটেশন, দৃশ্য কল্পনা, সেট ডিজাইন এমনকি সম্ভাব্য চরিত্রদের স্কেচ পর্যন্ত।

খেরোর খাতায় সত্যজিৎ রেখে গেছেন *গুপী গাইন বাঘা বাইন* নিয়ে তাঁর যাবতীয় ভাবনা। ছবির প্রতিটা শট আঁকা রয়েছে frame by frameএ, সঙ্গে হরেক রকম নোটস। গুপী বাঘার জন্য নির্দিষ্ট খেরোর খাতায় প্রথম নোটস লেখা হয়েছে ১৯৬৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর এবং শেষ নোটস পড়েছে ১৯৬৬ সালের ১১ই আগস্ট মাসে। এই নোটসের পাতা উল্টোতে গিয়ে ক্রমশ বেরিয়ে আসে সত্যজিতের সৃজনশীল মস্তিষ্ক থেকে ধীরে ধীরে কিভাবে দানা বেঁধে গড়ে উঠেছে একটা গোটা ছবি। এমনকি দৃশ্যের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে স্বরলিপির প্রথম খসড়াও। নিঃসন্দেহে গুপী বাঘার খাতার মতো অনুপুঙ্খ, বিশদ, লেখা ও ছবিতে সমৃদ্ধ *খেরোর খাতা* খুব কমই আছে। এই কথা স্বীকার করেছেন স্বয়ং সন্দীপ রায়। যেমন, 'ভালো হাল্লা রাজা' ও খারাপ হাল্লা রাজা' - দুজনেরই মুখ এঁকেছেন একই পাতায় এবং নির্দিষ্ট করেছেন তাদের মুখের মেক আপও। ছবিতে খারাপ হাল্লা রাজার পাঁকানো গোঁফ দাঁড়ি নির্দিষ্ট করে দেয় এই হাল্লা রাজা দুষ্টু রাজা। ছবির টাইটেল কার্ডটাও দেখার মতো। গ্রাম্য-সরল এক বিশেষ ফন্ট স্টাইলে

লম্বা লম্বা মাত্রা টেনে লেখা। পাশাপাশি ছোট ছোট করে কার্টুন স্টাইলে আঁকা রয়েছে ছবির নির্বাচিত কিছু দৃশ্য। গ্রামের সাধারণ মানুষের পোশাক নীতির মধ্যে কেবল সারল্য ছাড়া আর কিছু নেই। শুন্ডি রাজা শান্তির দূত, তার পোশাক, ঘরের আসবাব এমনকি রাজামশাইয়ের পাগড়ির রং ধবধবে সাদা। শুন্ডি রাজার মুখাবয়বের সঙ্গে ১৯৪৬ সালে সৃষ্ট এয়ার ইন্ডিয়ার রাজার মুখাবয়বের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অপর প্রান্তে হাল্লা রাজা নিষ্ঠুর, খামখেয়ালি এবং যুদ্ধবাজ। তার মুকুটে শকুনের পালক গোঁজা, মুখে চাপ দাড়ি। রাজার পরনের পোশাক আঁটো শাটো গাঢ় রঙের। রাজার পোশাক পরিকল্পনায় যুদ্ধবাজ সেনাধ্যক্ষের মেজাজ স্পষ্ট। অপর দিকে শুন্ডি রাজার রাজপ্রসাদের নানা জায়গায় আঁকা রয়েছে প্রজাপতি, সাদা পায়রা এবং গজগামিনীর মতো শান্তি এবং মৈত্রীর প্রতীক, পাশাপাশি হাল্লা রাজার প্রতিমূর্তি হিংস্র শ্বাপদের মুখ। রাজার পোশাকে জড়িয়ে আছে চিতাবাঘের ছাল এবং বাঘের আস্ত হিংস্র মাথাটা ঝুলছে রাজার বুকের একপাশে। মন্ত্রীর সিংহাসনের পেছনে শোভা পাচ্ছে স্টাফ করা একটা মস্ত বড় ভাল্লুকের মাথা এবং বন্য মোষের প্রকাণ্ড সিং। শুন্ডি রাজার দরবার শ্বেতশুভ্র, খোলা মেলা। পাশাপাশি হাল্লা রাজার দরবার ভূগর্ভে অবস্থিত, ছোটছোট ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে অল্প আলোর প্রবেশ, অনেকটা গুহার অন্দরের পরিবেশ। শুন্ডি রাজার গানের দরবারে সমবেত হয়েছেন নানা দেশ থেকে আগত গুণী, গান বাজিয়ের দল। তাদের পোশাক দেখলে শনাক্ত করা যায় তারা বিভিন্ন দেশের বাসিন্দা এবং শিল্পী। ঠিক সেই রকমই হাল্লা রাজার দরবারে বিভিন্ন দেশের যোদ্ধাদের আগমন, তাদের পোশাক ও মেকআপ দেখলে চিহ্নিত করা যায় তারা কোন দেশের বাসিন্দা।

এই সিনেমায় সব থেকে আশ্চর্য চরিত্র-ভাবনা হচ্ছে ‘বরফি’। নির্বাক এই চরিত্রটি বাংলা সিনেমায় এক অবিস্মরণীয় সংযোজন। এই চরিত্রের পোশাক পরিকল্পনার detailing করতে গিয়ে *খেরোর খাতায়* পাঁচখানা স্কেচ করেছিলেন সত্যজিৎ। বরফির মাথায় প্রজাপতির শুঁড়ের মতো জোড়া অ্যান্টেনা-সমেত এক ছুঁচলো টুপি। নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পোশাক পরিকল্পনায় লম্বা জোব্বায় সাদা কালোয় বরফির নিদর্শন। এমনকি কালো চশমার কাঁচের আকৃতিতেও বরফির ডিজাইন। বরফি একজন কুচক্রী এবং কালো জাদু বিদ্যার জোরে ছোট-বড় নির্বিশেষে সবারই ওপর নিজের অশুভ জাদুর প্রয়োগ করাই তার স্বভাব। তাই পোশাক পরিকল্পনা বরফির চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখেই করেছেন সত্যজিৎ। *খেরোর খাতায়* বরফির গবেষণাগারের স্কেচটিও

অনবদ্য। বরফি দর্শকদের দিকে মুখ করে গবেষণায় ব্যস্ত আর একদম পেছনে দেখা যাচ্ছে ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকছে মন্ত্রী। *খেরোর খাতার* স্কেচটির ঠিক নিচে গবেষণাগারে কী কী থাকবে, তার একটা সম্ভাব্য তালিকা দেখা যাচ্ছে যেখানে পাঁচটা প্রাণীর নাম লেখা আছে - বাঁদর, পেঁচা, সাপ, মাকড়শা ও বেড়াল।

ছবির শেষে 'হাল্লা চলেছে যুদ্ধে' স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে বিশাল মরু সৈন্যবাহিনীর উদ্ভাবন করেছেন সত্যজিৎ তা এক কথায় অনবদ্য। উটের পিঠে চড়ে অসংখ্য সৈনিককে জড়ো করেছেন পরিচালক - প্রত্যেকের মাথায় পাগড়ি, হাতে বল্লম, বাহুতে মোটা বালা। অনেকের হাতে বাঘের মুখ আঁকা বিচিত্র পতাকা। একসঙ্গে শ'খানেক অতিরিক্ত অভিনেতার দলকে সেনা বাহিনীর কস্টিউম পরিয়ে উটে চড়িয়ে বহির্দৃশ্যে হাজির করেছেন সত্যজিৎ - বাংলা সিনেমায় এই রকম দৃশ্য কখনও দেখা যায় নি, ভবিষ্যতেও এরকম দৃশ্য দেখা যাবে কিনা সন্দেহ।

*গুপী গাইন বাঘা বাইন*এর পরে ক্রমানুক্রমে ন'টি ছবিতে সত্যজিৎ তাঁর পোশাক পরিকল্পনায় সেই simplicityর পথেই হেঁটেছেন। সেখানে কোনও অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বর নেই। এই ন'টি ছবির *খেরোর খাতায়* সঙ্গত কারণে স্কেচের আধিপত্য তুলনামূলক ভাবে কম। সত্যজিৎ পোশাকের ব্যবহার করেছেন অনেকটা তথ্যচিত্রের স্টাইলে, অর্থাৎ যে চরিত্র যেরকম, তার পোশাকও সেই রকম। একটি বাদে সব ছবিই শহর কেন্দ্রিক, শুধু *অশনি সংকেত* গ্রাম্য পরিবেশে তোলা, আর গ্রামের মানুষের পোশাক পরিকল্পনায় সত্যজিৎ ফিল্মি-ক্যারিয়ারের গোড়া থেকেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তেতাল্লিশের মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষের সময়, গ্রামের পুরোহিত গঙ্গাচরণ এবং তার পরিবারকে নিয়ে *অশনি সংকেত* ছবির গল্পের পটভূমি। *খেরোর খাতায়* সত্যজিৎ গঙ্গাচরণের বাড়ির বাইরের পরিবেশের যে স্কেচটা করে দিয়েছিলেন, সেটাকে অনুসরণ করেই সেট ফেলা হয়েছিল। সত্তরের *অরণ্যের দিন রাত্রি* ছবিতে সত্যজিৎ নিখুঁত ভাবে চার বন্ধুর পোশাকের সেট *খেরোর খাতায়* স্কেচ করে নিয়েছিলেন। পোশাকে কী ধরনের কাপড় ব্যবহার হবে, সেটাও আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন। চার বন্ধু প্রথম দিন গাড়িতে যাওয়ার সময় কী পোশাক পরবে, রেস্ট হাউসে পৌঁছনোর পরে এবং তারপর একটা দেশি মদের দোকানে যাওয়ার সময় কী পোশাক পরবে, তারও আলাদা আলাদা স্কেচ করে রেখেছিলেন *খেরোর খাতায়*। পোশাকগুলোর মধ্যে দিয়ে তাদের সামাজিক অবস্থান ছাড়াও প্রতিটি চরিত্রের মানসিকতা এবং আলাদা করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ফুটে

উঠেছে। যেমন হরি একজন খেলোয়াড়, তাই তার পরনে স্পোর্টস গেঞ্জি, সঞ্জয় একটু বাম ঘেঁষা তাই তার পরনে পাঞ্জাবি ও পায়জামা। বাকিদের শার্ট।

চুয়াত্তরের *সোনার কেল্লায়* খল চরিত্রের অভিনেতাদের ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ির পরিকল্পনাটি চরিত্রায়নে সাহায্য করেছে। সত্যজিৎ রায় ১৯৬৫ সালে প্রথম পাঠকদের ফেলুদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন *ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি* গল্পের মাধ্যমে। এরপর আরও চারটে গল্প লিখলেও সেখানে জটায়ুর কোনও উল্লেখ ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে *সোনার কেল্লা* গল্পে নিয়ে আসেন লালমোহনবাবুর চরিত্রটিকে। সত্যজিৎ রায় মোট পঁয়ত্রিশটি গল্প লিখেছিলেন ফেলুদাকে নিয়ে, তার মধ্যে সাতাশটি গল্পে জটায়ুকে আমরা পেয়েছি। লালমোহনবাবু অত্যন্ত সরল মনের ভালো মানুষ, দেখতে ছোটোখাটো, পরনে ধুতি, পাঞ্জাবি, মাঝে মাঝে পাঞ্জাবির ওপর জওহর কোট পরতে ভালোবাসেন আর শীতকালে মাফলার আর মাঙ্কি টুপি, মাথায় একটা বিশাল টাক, শুধু দুই পাশে আর পেছনের দিকে পরিপাটি করে আঁচড়ানো অল্প কয়েকগাছা চুল। সত্যজিতের ছবিতে তো বটেই, চুয়াত্তর সালে প্রথম পর্দায় লালমোহনবাবুর আবির্ভাব ঘটেছে *সোনার কেল্লা* ছবিতে। সত্যজিৎ-এর ফেলুদা সিরিজে লালমোহনবাবুর আবির্ভাব করিয়েছেন, সেই লালমোহনবাবুই কিন্তু iconic figureএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই ছবির টাইটেল কার্ড একটা বিরল শিল্প কর্ম। এখানে কাস্টিং করতে গিয়ে সত্যজিৎ তাঁর নিজস্ব আঁকা আঠাশটি ছবি ব্যবহার করেছেন। একজন বালক শিল্পীর নরম হাতে আঁকার মতো করে ছবিগুলো ড্রয়িং পেপারে ক্রেয়নে এঁকেছেন সত্যজিৎ - যেন মুকুলের নিজের আঁকা। অবশ্য এই ধরনের সাদা কালো স্কেচ আমরা দেখেছি *গুপী গাইন বাঘা বাইন* ছবির টাইটেল কার্ডে। তবে *সোনার কেল্লার* রঙিন ছবিগুলো এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত।

তবে সত্যজিতের চরিত্র পরিকল্পনায় অবিস্মরণীয় কীর্তি প্রেমচাঁদের ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি *শতরঞ্জ কে খিলাড়ি*। নবাবি লখনউই পটভূমিকায় নির্মিত ছবিটি সম্পূর্ণরূপে একটি period film এবং নিঃসন্দেহে সত্যজিতের চলচ্চিত্র জীবনের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। ছবির শুরুর দৃশ্যেই দাবা খেলোয়াড়দের রেশমি কারুকাজ খচিত কামিজের হাতা এবং অলঙ্কৃত আংটির একটি দৃশ্যের মাধ্যমে সত্যজিৎ অত্যন্ত নিপুণভাবে ছবির একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছেন।

দুই শতরঞ্জ খেলোয়াড় - নবাব মীর রোশন আলি এবং মির্জা সাজ্জাদ আলির প্রথম পরিচয়ে যা দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে, তা হলো তাদের রাজকীয় আড়ম্বর। ছবিতে

আছে প্রায় ৩০টি চরিত্র এবং যখন এক এক করে সেই চরিত্রদের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় করিয়ে দেন সত্যজিৎ তখন পর্দায় সেই পোশাক-পরিচ্ছদের জৌলুস যেন আরও বেশি ঠিকরে ওঠে। ভিড়ের দৃশ্য তো বটেই, এছাড়া অভিজাতবর্গ হোক, নর্তকী, অনুচর কিংবা দর্শনার্থীই হোক, প্রতিটি চরিত্রই তাদের স্বতন্ত্র পোশাকের মাধ্যমেই নিজেদের সংজ্ঞায়িত করেছেন। *শতরঞ্জ কে খিলাড়ি*র পোশাক পরিকল্পনার নির্মাণের পেছনে বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম গবেষণার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন পরিচালক। সত্যজিৎ রায়ের ভাষ্যমতে এই ছবিটির নির্মাণের আগে তিনি প্রচুর পরিমাণে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা করেছিলেন। উর্দু ভাষার একটি বিখ্যাত বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ - *Lucknow, the last phase of an Eastern Culture*-এর বিশেষ সহায়তা পেয়েছিলেন। বইটি ওয়াজিদ আলি শাহের জীবন ও সময়কালের এক পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকোষ বলা চলে।

পোশাক পরিকল্পনা নিয়ে সত্যজিৎ সাহায্য নিয়েছেন বিভিন্ন মিউজিয়ামের, আর্ট গ্যালারির, খোদাইয়ের এবং পুরনো আলোকচিত্রের। সুরেশ জিন্দাল তার বইতে উল্লেখ করেছেন সালার জং মিউজিয়াম, হায়দ্রাবাদের নিজামদের ফালাকনামা প্রাসাদ এবং জয়পুরের সিটি প্যালেস জাদুঘর ছিল এই চলচ্চিত্রের গবেষণার প্রধান উৎস। কলকাতা তৎকালীন 'বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড' আলোকচিত্র স্টুডিওতে সংরক্ষিত আর্কাইভাল বা নথিবদ্ধ ছবিগুলোও গবেষণার ক্ষেত্রে খুব বড় সম্পদ হিসেবে কাজে দিয়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে ওয়াজিদ আলি শাহের একটি তৈলচিত্র পাওয়া গিয়েছিল যা নবাবের শারীরিক অবয়ব ফুটিয়ে তোলার প্রধান সহায়িকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। লন্ডনের 'ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি' এবং 'ইম্পেরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম' এই গবেষণায় আরও কিছু অপরিহার্য তথ্য সংযোজন করেছে। শতরঞ্জ কে খিলাড়ি ছবির গবেষণার উপাদান সংগ্রহে রাখতে শুধু একটা নয়, দু দুটো *খেরোর খাতা* ভরিয়ে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। ইংরেজ সৈন্য লখনউ দখল করতে ঢুকেছে, এমন একটা দৃশ্যের জন্য সত্যজিৎ প্রতিটি details সহ সৈন্যদের একটা মিছিল এঁকেছিলেন তাঁর *খেরোর খাতায়*। সেনাবাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন ডিভিশন বিশ্লেষণ করেছিলেন স্কেচ করে। এই ধরনের কুচকাওয়াজে যতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, সব detailingই তাঁর গবেষণার পাতায় জায়গা পেয়েছে। বাজনদাররা কোথায় থাকবে, তারপর বড় কামান, ছোট বন্দুক, পতাকা, উট, ঘোড়া, হাতি, গরুর গাড়ি, হাঁসমুরগি, কুকুর, পালকিবাহকের সারি - এ'সব কিছুই জায়গা পেয়েছে *খেরোর খাতার* পাতায় পাতায়। একটা দৃশ্যের পিছনে কী বিশাল পরিমাণে

গবেষণা আর ভাবনাচিন্তা রয়েছে, সেটা *খেরোর খাতার* পাতা না উল্টালে বোঝা যায় না।

পোশাক তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল নানা ধরনের মখমল, ব্রোকেড, রেশম এবং এমনকি পশমও কারণ ছবির প্রেক্ষাপট ছিল শীতকাল। এই উপকরণগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল হায়দ্রাবাদ, লখনউ এবং কলকাতার বিভিন্ন সংগ্রহশালা এবং সংগ্রাহকদের থেকে। পোশাকের রঙের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল বা স্নিগ্ধ আভা বেছে নেওয়ার বিষয়টি ছিল একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। ব্যবহার করা হয়েছে সোনালি, তামাটে, ব্রোঞ্জ এবং সবুজ, নীল ও পীচ রঙের হালকা 'প্যাস্টেল' শেডগুলো। সত্যজিৎ রায়ের নিজের দেওয়া তথ্য অনুসারে কথক নৃত্যের দৃশ্যটি সেই সময়ের একটি খোদাইচিত্র থেকে নেওয়া। ওয়াজিদ আলি শাহের প্রপৌত্র এবং কলকাতার বাসিন্দা কওকাব কুদের মীরজা অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী এই চলচ্চিত্রের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র আউট্রাম সাহেবের ঘরের নকশা করতে *খেরোর খাতায়* যে স্কেচটা করেছিলেন সত্যজিৎ, তাতে আটাশটি detailing আছে, যার তালিকা পাতার ডান দিকে পর পর লিপিবদ্ধ করা আছে।

লন্ডনের 'ন্যাশনাল ওয়ার মিউজিয়াম'-এর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর, বিখ্যাত ব্রিটিশ সামরিক পোশাক বিশেষজ্ঞ অ্যান্ড্রু মোলোর (Andrew Mollor) সাহায্য নেওয়া হয়। সত্যজিতের *খেরোর খাতায়* হরেক রকমের ব্রিটিশ সামরিক পোশাকের নমুনার colour sketch পাওয়া যায়। এই পোশাকগুলো স্কাউট, অশ্বারোহী বাহিনী, অশ্বারোহী গোলন্দাজ বাহিনী, জেনারেল ও স্টাফ অফিসার, পদাতিক বাহিনী, ভারী গোলন্দাজ বাহিনী এবং রসদ বহনকারী দলের ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছিল। বেঙ্গল ক্যাভালরি বা অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য লাল ও সোনালি, নীল ও রূপালি, লাল ও হলুদ এবং সাদা রঙের পোশাক তৈরি করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে, ছবির অন্যতম সহায়ক এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কস্টিউম ডিজাইনার শামা জাইদি বলেছেন, 'যেহেতু এটি সিপাহী বিদ্রোহ-পূর্ববর্তী সময়ের একটি দৃশ্যপট, তাই বিদ্রোহের আগে সেনাবাহিনীর পোশাকগুলো কোনও নির্দিষ্ট 'স্ট্যান্ডার্ড' মেনে তৈরি হতো না।' শামা জাইদি সত্যজিৎকে এই ছবির উর্দু সংলাপ লিখতেও সাহায্য করেছিলেন।

সত্যজিতের অন্যতম জীবনীকার মেরি সেটান তার গ্রন্থ Portrait of a Direc-

tor : Satyajit Rayএ লিখেছেন, ‘ঐতিহাসিক নির্ভুলতা বজায় রাখতে এডিসি (ADC) -দের পোশাকগুলো সত্যজিৎ লন্ডন থেকে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছিলেন। পোশাকগুলো এসে পৌঁছানোর পর দেখা গেল সেগুলো গ্রীষ্মকালীন পোশাক, অথচ অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়েছিল শীতকালীন পোশাকের! এমনকি হেলমেটগুলোও সঠিক ছিল না। অবশেষে শামা জাইদি অনেক ভেবেচিন্তে এমন একটি উপায় বের করলেন, যার ফলে পোশাকগুলো দেখতে অনেকটাই শীতকালীন পোশাকের মতো হয়েছিল।’ এই ছবির ব্যবহৃত অলংকারের নকশাগুলো তৈরি করেছেন বিখ্যাত কস্টিউম ডিজাইনার মঞ্জু রাজ সারাওগি। সত্যজিতের নকশা করা নবাব ওয়াজিদ আলি শাহর সেই বিখ্যাত সিংহাসনটি আজও নবাবের সমাধিস্থল মেটিয়াবুর্জে শোভা পাচ্ছে।

*শতরঞ্জ কে খিলাড়ি*র পর সত্যজিৎ সর্বমোট যে ন’টি ছবি করেছিলেন তার মধ্যে দুটি ছবি ছিল স্বল্প দৈর্ঘ্যের। এই ন’টি ছবির জন্য সত্যজিৎকে অবশ্য তাঁর প্রিয় *খেরোর খাতা*র পাতা খুব একটা যে ভরাতে হয়েছে, তা অবশ্য নয় এখানে দুটি চলচ্চিত্রে কিন্তু পোশাক পরিকল্পনার মধ্যে বেশ মুন্সিয়ানা আছে। ছবি দুটি হচ্ছে *হীরক রাজার দেশে* এবং *সদগতি*। তাছাড়া *জয় বাবা ফেলুনাথ* তো আছেই। সবার প্রিয় ফেলুদার প্যান্টের ওপরে ফুল-হাতা পাঞ্জাবি তরুণ বাঙালি সমাজে iconic dressএ পরিণত হয়েছিল। এছাড়া ছবির শেষ দৃশ্যে গল্পের নায়ক ফেলুদা যেভাবে মছলি বাবার অঙ্গ শয্যা এবং মেকআপ নিয়ে সবাইকে বোকা বানিয়েছে, তাতে কিন্তু শিল্প পরিকল্পনা থেকেও অনেক বেশি dramatization আছে। এই দৃশ্যে বাস্তবতাকে অনেক বেশি করে ছাড়িয়ে গেছে চূড়ান্ত ক্লাইমেক্স। তবে মছলি বাবার মেকআপে সৌমিত্রকে কিন্তু মানিয়েছিল বেশ।

১৯৮০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত *হীরক রাজার দেশে* বছর দশেক আগে মুক্তিপ্রাপ্ত *গুপী গাইন বাঘা বাইন*এর পরবর্তী সংস্করণ, তবে এবার কিন্তু ছবির বুনন সম্পূর্ণ রঙিন, অর্থাৎ হীরের ঝলকানি যত্রতত্র। রঙের বৈচিত্রকে ঢেলে ব্যবহার করেছেন ঝলমলে ছবিতে। তবুও কোথাও যেন *গুপী গাইন বাঘা বাইন*-এর vastnessএর অভাব বোধ হয়েছে। বহির্দৃশ্য নিয়ে সত্যজিৎকে অতটা মাথা ঘামাতে হয়নি, গবেষণা করতে হয়নি অসংখ্য সৈন্যকে কী ভাবে একটা নির্দিষ্ট পোশাকি ছন্দে আনা যায়। ছবিটি অনেক বেশি সংলাপ ভিত্তিক। তবে হীরক রাজার দরবারের নকশা অথবা যন্তর মন্তর ঘরের পরিকল্পনা দর্শকদের চোখ টানে। ছবিটা করতে গিয়ে সত্যজিৎ আরও একবার তার *খেরোর খাতা*র শরণাপন্ন

হয়েছেন, তবে এবারের স্কেচ রঙিন পেন্সিল এবং রং-তুলিতে করা। এবারও দু দু'খানা খাতা ভরিয়েছেন শিল্পী। শুধু স্কেচগুলোই এক অভিনব চিত্রকলা সিরিজের অংশ হতে পারে। হীরকের রাজার পোশাক পরিকল্পনা থেকে মন্ত্রীদের পোশাকের নকশার অসাধারণ সব স্কেচ রয়েছে *খেরোর খাতার* পাতায় পাতায়। যন্তরমন্তর ঘরের নকশা করেছেন সাদা কালো পেন্সিল স্কেচে তবে পোশাক পরিকল্পনাগুলো সমস্ত রঙিন। *খেরোর খাতায়* গোটা পনেরো স্টাডি রয়েছে পোশাকের ব্যবহার নিয়ে - আলাদা আলাদা করে করেছেন রাজার পাগড়ির নকশা, প্রধান মন্ত্রীর পোশাক, অতিথি রাজাদের পোশাক, রাজ পুরোহিতের পোশাক, খনি শ্রমিকের পোশাক, চৌকিদারের নীল রংয়ের পোশাক, পেয়াদার পোশাক, মোসায়েবের পোশাক, গুপীবাঘার বহুরূপী সাজের পোশাক, গবেষকের পোশাক, পাখাওয়ালার পোশাক, রাজার মন্ত্রীদের পাঁচ খানা পোশাক, ঘরের মধ্যে আরাম করা গুপী বাঘার পোশাক - একেকটা স্টাডি যেন একেকটা গভীর শিল্প সম্পদ। ছবিটা রঙিন, তাই গুপীবাঘার মতো সাদা-কালো না করে নানা রকম রঙের ব্যবহার করেছেন সত্যজিৎ তার গবেষণা পত্রে।

পরিশেষে এই প্রসঙ্গে *সদগতি*র কথা না আনলেই নয়। গ্রাম্য পরিবেশ নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের কাজের সাফল্যের শেষ নেই। পুরোদমে শহুরে মানুষ হয়েও গ্রামীণ সংস্কৃতি নিয়ে সত্যজিতের জ্ঞানের ভান্ডার ছিল পরিপূর্ণ। গ্রাম্য পরিবেশের খুঁটিনাটি detailing সত্যাজিৎ সঞ্চয় করেছেন শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবাসে থাকাকালীন। *পথের পাঁচালী, অপরাজিত, পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি* থেকে শুরু করে *অশনি সংকেত*-- কোনও ছবিতেই detailingএ কোনও বৈসাদৃশ্য নেই। *সদগতি* গ্রাম্য পরিবেশের গল্প হলেও এখানে স্থান আর পাত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই নিবন্ধের প্রথমে আলোচিত 3Pর প্রথম দুটো Pই কিন্তু এই ছবিতে সত্যজিতের অভিজ্ঞতার বাইরে। ৮১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত টেলিফিল্ম *সদগতি* এক দলিত গ্রামবাসীর শোষণের কাহিনী। এর চিত্রগ্রহণ হয়েছিল ছত্তিশগড়ের রায়পুরের অদূরে অবস্থিত একটি গ্রামে, যা বর্তমানে মহাসমুন্দ জেলার অন্তর্ভুক্ত। সম্পূর্ণ দেহাতি গ্রাম্য সংস্কৃতি এবং তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সত্যজিতের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। সেখানে এই ধরনের পরিবেশকে কেন্দ্র করে ছবি করা নিঃসন্দেহে এক সাহসী পদক্ষেপ। এবারও ছবির পরিকল্পনায় এবং কস্টিউম ডিজাইনে সত্যজিৎ রায় শতকরা একশো ভাগই উৎরে গেছেন, সেই simplicityকেই নির্ভর করে।

সঙ্গ ও অনুষঙ্গ ঃ বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর

কেতকী চৌধুরী

বাঁ থেকে ডাইনে : সুখময় মিত্র, সোমনাথ হোড়, রামকিঙ্কর বেইজ, এ. রামচন্দ্রন, কে.জি. সুব্রমণ্যন, দিনকর কৌশিক এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনের কলাভবনের গোড়াপত্তন হয় ১৯১৯ সালে। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অসিতকুমার হালদার। ১৯২০ সালে নন্দলাল বসু স্থায়ীভাবে কলাভবনের কাজে যোগদান করেন ও ১৯২২ সালে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। কলাভবন গড়ে তোলার সময় নন্দলালের শিক্ষাদানের পদ্ধতি বড় বড় শহরের আর্ট স্কুলগুলির থেকে ভিন্নতর ছিল। তিনি চেয়েছিলেন গুরু-শিষ্যের মিলিত সাধনায় ছাত্ররা যথার্থ শিল্পী হয়ে উঠুক। একটি শিল্পী গোষ্ঠী তৈরি হোক যাদের পরস্পরের মধ্যে থাকবে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বন্ধন। রবীন্দ্রসংস্পর্শ তাঁর জীবনে পরম আশীর্বাদ বলে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। কোনও আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে বলতে শোনা যায় গুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে চিত্রবিদ্যা

আত্মপ্রতিকৃতি - বিনোদবিহারী

শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন উন্মেষ করে দিয়েছিলেন।

নন্দলাল, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর হলেন গুরু ও তাঁর দুই প্রধান শিষ্য। একই সময়কালে তিনটি স্বতন্ত্র ধারা ভারতের আধুনিক শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের শিল্প ভাবনা, শিল্পচর্চা এবং তাঁদের দৈনন্দিন জীবনধারা আপন মহিমায় ভাস্বর। কলাভবনের আদিপর্ব অর্থাৎ তিরিশের দশক থেকে বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্করকে তাঁদের সতীর্থরা দেখেছেন বিদ্যালয়ের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং গুরুর সর্বক্ষণের সঙ্গী ও সহকারী। বিনোদবিহারী কলাভবনে যোগদান করেছিলেন রামকিঙ্করের কিছু আগে। এই দুই শিল্পীর ছাত্রাবস্থায় গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব অটুট ছিল সারাজীবন। বিশ্বভারতীর সূচনাপর্বেই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের প্রধান অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠুক সংগীত ও চিত্রকলা। দ্বারিক বাড়ির দুই তলায় এই দুই শাখা অনেকদিন পর্যন্ত একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে। কলাভবনের প্রসঙ্গে অসিতকুমার হালদার, সুরেন কর, নন্দলাল বসুর নাম প্রথমেই আসে। এদের শিষ্যদের মধ্যে বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর তাঁদের চিত্র ও ভাস্কর্যের সম্ভারে গোটা বিশ্বে পরিচিত। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরঞ্জন খাস্তগীর, প্রশান্ত রায় এরাও সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য নাম-- যাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। সকলকে ছাপিয়ে বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর - আধুনিক ভারতীয় শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ।

১৯১৭য় বিনোদবিহারী এলেন শান্তিনিকেতনে। শৈশব থেকেই একটি চোখ দৃষ্টিহীন আর একটি চোখের নজর অত্যন্ত ক্ষীণ-- তাই তাঁর শৈশব ও বাল্যজীবন আর পাঁচজনের মতো ছিল না। তাঁর জবানীতেই শুনি... ''দেখি সকলেই স্কুলে যায়, কেবল আমিই যাই না... শৈশব ও বালক বয়সের অনেকগুলো দিন আমার কেটেছিল সঙ্গীহীন-- না ছিল সঙ্গী, না ছিল খেলা''। নি:সঙ্গ শৈশব পেরিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে প্রথম সমবয়সীদের সঙ্গ পেয়েছিলেন। প্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলে... ''রবীন্দ্রনাথ স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর চোখ নাবিয়ে পা পর্যন্ত একবার দেখলেন, আবার আমার মুখের দিকে তাকালেন।''

বাংলা, ইংরাজীতে কি কি বই পড়েছেন জানতে চেয়েছিলেন তখনই। 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়েছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। কবির অনুমতি পেয়ে সেদিন থেকেই তাঁর পথচলা শুরু হল শান্তিনিকেতনের মাটিতে। প্রথমে শিক্ষক জগদানন্দ রায়ের লেখা 'পোকামাকড়' বইটিতে ইলাস্ট্রেশনের কাজ পেলেন। বইটি প্রকাশিত হলে বইটির ভূমিকাতে বিনোদবিহারীর নাম উল্লেখ করেছিলেন জগদানন্দবাবু। এই ঘটনাতে আশ্রমে বিনোদবিহারীর আর্টিস্ট হিসাবে পরিচিতি ঘটে। শুধু তাই নয়, গুরুদেবের কাছে ''আমার কৃতিত্বের কথা জগদানন্দবাবু পৌঁছে দিয়েছিলেন।'' (চিত্রকর) আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকে এই ক্ষীণদৃষ্টির ছাত্রটির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয় থেকে সদ্য গড়ে ওঠা কলাভবনে তাঁর যোগদানকে নন্দলাল খুশি মনে গ্রহণ করতেপারেন নি । ''দ্বারিকের দোতলায় তখন কলাভবন, নীচে সংগীতভবন। একখানা মাদুর, সামনে নড়বড়ে জলচৌকি এবং ডানপাশে জলের গামলা। এরই মধ্যে অন্যের মতন আমিও স্থান পেলাম। বেশ কিছুদিন নন্দলাল আমাকে সুনজরে দেখেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, গুরুদেব জোড় করে একজনকে তাঁর ঘাড়ে চাপালেন যে শিল্পজগতে প্রবেশের অনধিকারী। যার চোখ নেই, সে ছবি আঁকবে কী করে?'' রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ''যদি ও নিয়মিত আসনে বসে এবং মনোযোগ দিয়ে কাজ করে তবে ওকে স্থানচ্যুত কোরো না। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা কোরো না। সকলকে নিজের পথ খুঁজে নিতে দাও''।

বীরভূমের ঊষর প্রান্তর, গাছপালা, তাল, খেজুরের সারি, শিমুল শিরীষের দোলা, কাশের বন সর্বোপরি খোয়াই তার মনকে ছেয়ে রইল। প্রকৃতির সঙ্গে সাঁওতাল জীবন, সুরুলের শালবন, গোয়ালপাড়া তাঁর চিত্রভাবনার রসদ হয়ে উঠল। ''খোয়াই, সুরুলের শালবন, কোপাইয়ের ধার এইসব স্থান তখন আমার প্রায় নিত্য সঙ্গী। ছবিও আঁকি এইসব বিষয় অবলম্বনে।'' ছবিতে রঙের অতিশয্য কম, তবু তুলি যেন প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলে। ''গ্রীষ্মের দুপুরে খালি পায়ে, খালি মাথায় যখন ঘুরে বেড়িয়েছি গ্রামের পথে, খোয়াই-এর ধারে, তারও অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে দুর্লভ হয়ে উঠেছে এবং অন্যের কাছে এইসব কাহিনী গল্পের মতো মনে হয়েছে। গ্রীষ্মের ছুটি পড়লে আজও সেই দুপুর ও অন্ধকার রাত্রির কথা মনে পড়ে। এই নির্জনতাই বোধ হয় আমার দৃশ্যচিত্রের প্রধান বিষয়''। দ্বারিক গৃহ থেকে কলাভবন লাইব্রেরি ঘরের দোতলায় স্থানান্তরিত হলে তার চিত্রিসত্তা নতুন পথে বাঁক নিল। এর মধ্যে স্টেলা ক্রামরিশ 'আপ টু ডাডাইজম' লেকচার দিয়েছেন। তাতে কিউবিজম, সুররিয়ালিজম ছিল, ছিল না শুধু অ্যাবস্ট্রাক্ট। ধীরে ধীরে ভাবনাচিন্তাতেও বদল এল। নতুন উৎসাহে লাইব্রেরীর বই পড়তে শুরু করলেন-

- এই বইপড়ার নেশা ছিল আমৃত্যু। প্রকৃতির রসে মুগ্ধ হয়ে তিনি যখন তার রস নিংড়ে নিচ্ছেন তখনই বলেছেন 'চিত্রকর' গ্রন্থে-- ''তাই ভাবি, আমি শিখলাম কার কাছ থেকে? নন্দলালের কাছ থেকে, না লাইব্রেরি থেকে, অথবা শান্তিনিকেতনের রুক্ষ প্রকৃতি থেকে? নন্দলাল না থাকলে আমার আঙ্গিকের শিক্ষা হত না, লাইব্রেরি ছাড়া আমার জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হত না, আর প্রকৃতির রুক্ষ মূর্তি উপলব্ধি না করলে আমার ছবি আঁকা হত না।'' প্রবল বর্ষা, উষর রুক্ষতা তাঁর সত্তাকে জাগিয়ে রাখে নিরন্তর। চিরস্থায়ী রূপ নেয় খোয়াই। সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্র 'দ্যা ইনার আই'তে বিনোদবিহারীর প্রশ্ন ছিল - ''তোমার ফিল্মে খোয়াই দেখাবে তো? খোয়াই বাদ দিও না। খোয়াই, আর তাতে একটি সলিটারি তালগাছ, ব্যাস। আমার স্পিরিট, আমার জীবনের মূল ব্যাপারটা যদি কোথাও পেতে হয়, ওতেই পাবে। বলতে পার - ওটাই আমি।'' শিল্পী জীবনের নির্জন একাকিত্বের চরম প্রকাশ - রুক্ষ রাঙামাটির নিঃসঙ্গ গাছটির সঙ্গেই তাঁর আত্মীয়তার বাঁধন।

কলাভবনে যারা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন - ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, হীরাচাঁদ দুগার, অর্ধেন্দু প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিঙ্কর, বিনায়ক মাসোজী - এদের থেকে বিনোদবিহারীর ছবির বিষয় ও রঙের প্রয়োগ ভিন্ন ছিল। খুব উজ্জ্বল রঙের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কম ছিল। তিনি মূলত রেখার শিল্পী, আকারের শিল্পী। সাদাকালোয় কাঠখোদাই বা এচিং-এ তিনি অনন্য। চীনা, জাপানি পদ্ধতির ক্যালিগ্রাফির টানে তাঁর সৃষ্টি অন্যমাত্রায় পৌঁছেছিল। সমসাময়িক শিল্পীদের মতো পুরাণের কাহিনীর দেবদেবীর ছবি তিনি আঁকেননি। তাঁর ছবির জগৎ বীরভূমের নিসর্গকে কেন্দ্র করে। এই প্রকৃতির সঙ্গে, খোয়াইর সঙ্গে নিজস্ব উপলব্ধিতে, অনুভবের গভীরতায় তৈরি হয়েছিল তাঁর নিজস্ব ভুবন। চোখের খুব কাছে ধরে রাখা কাগজের উপর তুলি ও রঙের ব্যবহারে ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন এই শিল্পী নানাবিধ খুঁটিনাটি ফুটিয়ে তুলতেন। কোনও শিল্পী দৃশ্যমান জগতের হুবহু কপি করেন না। চোখ ও অন্তরের দেখায় বস্তুর শিল্পিত রূপটি ফুটে ওঠে। এই দ্বিতীয় দেখাটাই প্রধান। তাঁর ছবির আলোচনায় ম্যুরালগুলির কথা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কলাভবনের ছাত্রাবাসের সিলিঙের ম্যুরালটিতে ছান্দিক চেহারায় প্রকাশ পেয়েছে বীরভূমের নিসর্গ ও সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা। শিক্ষক নন্দলাল বসুর দুটি আলাদা দিক বিনোদবিহারীকে প্রভাবিত করেছিল। প্রথমটি হল অবনীন্দ্রনাথ - প্রভাবিত প্রাচ্য ধারার শিল্পভাবনা। দ্বিতীয়টি নন্দলাল তাঁর কাজকে প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবনের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন-- এই দুই ধারারই প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে এখন এই ম্যুরালটির অবস্থা খুবই খারাপ। ছবির মাঝখানে বিন্যস্ত একটি জলাশয়কে ঘিরে বীরভূমের গাছগাছালি, মানুষজন, পশু

পাখি নিয়ে এক বিরাট পরিধি। শান্তিনিকেতন বাড়ির দেওয়ালে সূর্যমুখী ফুলের ছবি, পলাশ, শিমুল, সেতু, অজস্র কাঠখোদাই স্মরণযোগ্য। চীনা ভবনের ফ্রেস্কো, হিন্দী ভবনের উল্লেখযোগ্য কাজ 'মধ্যযুগের সন্ন্যাসী'। দৃষ্টিহীনতার পরের পর্যায়ে ফিরে এলেন অন্য আঙ্গিকে। পেপার কাটের সিরিজ - যাকে কোলাজ বলা যেতে পারে। শেষের দিকে বিসওয়াক্স' হাতের উষ্ণতায় যা নরম হয়ে যেত বলে স্পর্শের সূত্রে তাই দিয়ে তাঁর কাজ করতে সুবিধা হত।

১৯৫৭ সালে চোখে অস্ত্রপ্রচারের ফলে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিহীন শিল্পী তাঁর আত্মকথনে বলেছেন - ''আজ আমি আলোর জগতে অন্ধকারের প্রতিনিধি।'' একজন সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রবণ চিত্রশিল্পীর দৃশ্যময় জগৎ যখন ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যায় তখন আমাদের যেন মনে করিয়ে দেয় 'ফাল্গুনী'র অন্ধ বাউলের কথা - যে চোখ নয় তার সমস্ত শরীর দিয়ে দেখে আর গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে। ...

রামকিঙ্করকে 'সাধকশিল্পী' হিসাবে অভিহিত করেছিলেন প্রবাদ প্রতিম বিনোদবিহারী। গুরু নন্দলালকে বলতে শোনা যায়, ''অনেক জন্মের সাধনা নিয়ে জন্মেছে কিঙ্কর''। আমাদের শিল্পকলার ইতিহাসে এক বিরলতম ব্যক্তিত্ব রামকিঙ্কর। কল্পনা, প্রতিভা, মেধা, মনন, অনমনীয় বলিষ্ঠতা - বিশেষত: 'অন্তলীন চেতনাপ্রবাহ' তাঁর শিল্পকর্মকে স্বকীয়তা দান করেছে। ''সামাজিক চাহিদা আমার মাথাব্যথা নয়। আমার মধ্যে এক অদম্য দাবি তৈরি হয়, সে দাবিই আমাকে কাজ করতে হুকুম করে। আমার ভেতরের এই উদ্দীপনা আর দাবিতেই আমি আঁকি কিংবা গড়ি। শৌখিন সমাজ আমার কাজের কোনও প্রয়োজন বোধ করল বা করল না তাতে আমার কি আসে যায়? যে সমস্ত জরুরী কর্ম বা আকৃতি বাইরে আসার জন্য আমার মধ্যে জন্ম নেয় এবং আমাকে আলোড়িত করে তাদের রূপদান করে আমি অবশ্যই আমার ভিতরে একটা স্বস্তি এবং প্রশান্তি লাভ করি। তা কি বোঝ না তুমি?'' দিনকর কৌশিকের সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেন ছাত্রদের প্রিয় কিঙ্করদা। এখানেই জীবনানন্দ, রামকিঙ্কর, ভ্যানগখ সব এক হয়ে যান। চুপ করে আমাদের ভাবায়। স্বভাবতই এমন একজন শিল্পীর কথা জানতে ইচ্ছা করে। বুঝতে ইচ্ছা করে কীভাবে তাঁর মানসিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, কী সেই আশ্চর্য অনুসন্ধিৎসা যা তাঁকে এমন পরিণত আর আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে। ছোটবেলার দিকে তাকালে দেখি বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম হলেও জীবন কেটেছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে। যশস্বী সম্পাদক-সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে একটি টিনের তোরঙ্গে কিছু জামাকাপড়, পেনসিল স্কেচ, ওয়াটার কালার নিয়ে চলে এসেছিলেন

শান্তিনিকেতনে। নন্দলাল বসু তাঁর আঁকা ছবি দেখে প্রথমে বললেন- ''সব তো শিখেই এসেছ''। তারপর একটু ভেবে ''ঠিক আছে, দু-তিন বছর থেকে যাও।'' কার মূর্তি গড়ছেন জানতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রামকিঙ্কর বলেছিলেন, ''আমি ওটাকে জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারি নে। স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে এই মূর্তি আমার কাছে এসেছিল।'' শিক্ষক নন্দলাল বসু বলেছিলেন, ''স্বপ্ন আঁকতে। রাতের স্বপ্নগুলো না ভুলতে। স্বপ্নের মাঝে ঘুম ভেঙে গেলে উঠে তা লিখে রাখতে। স্বপ্নেই ছবি আসে, প্রতিমা আসে।'' শিল্পী রামকিঙ্করকে বুঝতে অবধারিতভাবে চোখ রাখতে হয় এই স্মৃতিকথার দিকে।

সতীর্থ বিনোদবিহারীর প্রতি রামকিঙ্করের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। বিনোদবিহারী তাঁর অধীত জ্ঞান, মেধা দিয়ে কাজ বুঝতেন অথবা নাকচ করে দিতেন। তিনি লিখেছেন-- ''রামকিঙ্করবাবু যখন এখানে এসেছেন, তখনই তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ, তাঁর শুধু যা বদলেছে তা হচ্ছে যাকে বলে গিয়ে রুচি। ...রামকিঙ্করবাবু কলাভবনে কিছুদিন কাজ করার পর যখন (১৯৩০) এখানেই মডেলিং শেখাতে লাগলেন তখন আমিও এখানে কাজ শুরু করেছি। সেই সময় ছুটিটুটিতে আমরা এখানেই থাকতাম, উনিও থাকতেন, কাজেই দেখাসাক্ষাৎ প্রায়ই হত। ...কাজের অ্যাসোসিয়েশনটা আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। ...এখানে স্কাল্পচার উনিই প্রথম করেন। প্রথম শিক্ষকও উনি। ...অয়েল পেন্টিংও এখানে প্রথম করেন রামকিঙ্করবাবু।'' রামকিঙ্করের কাজের বৈচিত্র দেখে সংযত বিনোদবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন: ''একটা লোকের ইলাসটিসিটি না থাকলে এতো বড় হয় না। তাঁর যেটা গ্রেটনেস সেটা বলি-- পাশাপাশি দেখুন, গেস্ট হাউসের সামনে আছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাস্কর্য, তারপরে সাঁওতাল মেয়ে দৌড়চ্ছে - গ্রেকো রোমান রিয়েলিটির দারুণ কাজ। এছাড়াও ছোট ছোট কাজ আছে কলাভবনের গায়ে, দিল্লীতে বড়ো কাজ করেছেন 'যক্ষ-যক্ষী' -- একটা লোকের খুব একটা ফ্রী ইয়ে না থাকলে, চিন্তাভাবনায় ফ্রী ও ফ্রেশনেস না থাকলে সে এটা করতে পারে না।''

১৯২৮এ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন লিজা ফন পট যিনি ছাত্রদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে মাটির মূর্তি গড়া শেখাবেন। তবে তার আগে ১৯২৬এ রামকিঙ্কর, প্রভাতমোহন, সত্যেন বিশী, সুধীর খাস্তগীর কাদামাটি দিয়ে মূর্তি গড়ার কাজ শুরু করেন। এরপর আসেন রঁদ্যার বেলজিয়ান শিষ্য বুর্দেল-এর ছাত্রী মার্গারেট মিলওয়ার্ড। রামকিঙ্কর তাঁর কাছে ভাস্কর্যের ক্লাস শুরু করেন। রামকিঙ্কর সকাল থেকে মডেলিং করে, দুপুরে লাইব্রেরীতে রাফেল, এল গ্রেকো, ভ্যানগখ, মাতিসের বই দেখেন। কখনও চেয়ে নিয়ে আসতেন ভিঞ্চির বই 'ম্যানোসক্রিপ'। তারপর ঝোলা নিয়ে স্কেচ করতে বেরোতেন। অধিকাংশ দিনই সঙ্গী হতেন প্রভাতমোহন, বিনোদবিহারী, পরে সুধীর খাস্তগীরও।

প্রভাতমোহন লিখছেন-- মিলওয়ার্ডের কাছে... ''এই প্রতিকৃতি গঠনের মধ্যে মধ্যে নানা মূর্তি গঠনেও সবাই হাত দিলুম আমরা।... এই মূতি গঠনের সময়েই রামকিঙ্কর সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। শরীর সংস্থান বিদ্যায় তাঁর ধারে কাছে কেউ রইল না।''

১৯৩০এ পার্শ্ব শিক্ষক হিসাবে কাজ পেলেন রামকিঙ্কর ও বিনোদবিহারী। প্রাণের আনন্দে তাঁরা কাজ করেছেন। শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবেননি। রামকিঙ্করের হাত ধরে ভারতীয় আধুনিক ভাস্কর্যের সূচনা হলেও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ ছিল। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন আশ্রমের আচার্য- যিনি রামকিঙ্করকে গোটা আশ্রম ভাস্কর্যে ভরে দিতে বলেছিলেন। গুরু নন্দলালের ছিল কিঙ্করের জন্য স্নেহ, গর্ব, শাসনের ইচ্ছা। কিঙ্করের ছিল মাস্টারমশাই-এর জন্য শ্রদ্ধা, নির্ভরতা এবং কিছুটা অবাধ্যতা। দুই শিল্পীর শিল্পচেতনায় মতপার্থক্য ছিল। রামকিঙ্করের কথায়... ''আমার কাজে কিউবিজম-এর প্রভাব এসেছিল, আচার্য দেব প্রথমে বিরূপ হয়েছিলেন। কিন্তু তর্ক বিতর্কের পর তিনি আর বাধার সৃষ্টি করেননি। ...আমার অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজ বা অয়েল পেন্টিং নন্দবাবুর পছন্দ না হলেও বাধা দেননি বিন্দুমাত্র।'' দুজনেই দুজনকে বুঝতেন। যখন কালো বাড়ির দেওয়ালে রামকিঙ্কর মাটি দিয়ে মূর্তি গড়েছেন ১৯৩৬ সালে নন্দলাল বিনোদবিহারীকে স্টুডিওতে এসে বলেছেন-- 'বিনোদ, গিয়ে দেখ রামকিঙ্কর মাটির কাজ করছে, তার হাতের ডেক্সটারিটি দেখে বুক কেঁপে যায়। এ কী আর এক জন্মের সাধানায় হয়েছে। অনেক জন্মের সাধনা নিয়ে কিঙ্কর জন্মেছে।'' তার আগে ১৯৩৫-এ শ্যামলী বাড়ির দেয়ালে ভাস্কর্যের কাজের পর প্রবেশ দুয়ারের দুপাশে সাঁওতাল মাঝি মেঝেনের হাই রিলিফ, পেছনে ও পূবের দেওয়ালে 'সাঁওতাল যুগল' ও 'কৃষ্ণ গোপিনী'র রিলিফ করলেন কিঙ্কর-- বাঁকুড়ার মন্দিরের পোড়ামাটির অনুকরণে। এই বছরই কলাভবনের ছাত্রী জয়া আপ্পাস্বামীর তন্বী, কিশোরী দেহটির তেলরঙের ছবির পর ১৯ ইঞ্চি মাটির মূর্তি গড়লেন। তারপর খোলা আকাশের নীচে দুই-মানুষ লম্বা সিমেন্ট কাঁকরের মূর্তি গড়েছিলেন। এই কাজে পারিপার্শ্বিক যতই বিরোধিতা আসুক না কেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে গোটা আশ্রম তাঁর কাজে ভরিয়ে দিতে বলেছিলেন। ১৯৩৮-র শেষ দিকে বিখ্যাত ভাস্কর্য 'সাঁওতাল পরিবার'। দরিদ্র সাঁওতাল স্বামীস্ত্রী, নিঃসম্বল তারা। পুরুষটি তার বাঁকের একটিতে বইছে বাচ্চাকে, অন্যটিতে তাদের সামান্য সম্বল। মেয়েটির কাঁখে কোলের শিশু। মাথার ঝুড়িতে শোবার তালাই। তাঁদের বাঁচার লড়াইতে দেশান্তরে তাদের সঙ্গে চলেছে অনুগত কুকুরটি। আধুনিক ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য। ১৯৪০এ শান্তিনিকেতন বাড়ির সামনে করেন 'ল্যাম্পস্ট্যাণ্ড বা বাতিদান'।

প্রথম বিমূর্ত ভারতীয় ভাস্কর্য। প্রখর গ্রীষ্মে যখন কেউ বাইরে যায় না, পাখিরাও পাতার আড়ালে বসে ঝিমায় তখন তৈরি করলেন 'কলের বাঁশি', 'ধান ঝাড়াই'। বিয়াল্লিশের আন্দোলন ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের যে ছবি আঁকলেন তাতে ছাত্রজীবনের অ্যানাটমির জ্ঞান, কঙ্কাল স্টাডি কাজে লাগালেন। দিনের পর দিন না খেয়ে থাকা মানব-মানবী, শিশুদের দেহ কোন অবস্থায় পৌঁছায় তার ভয়ঙ্কর নমুনা। বাস্তব পেরিয়ে অতি বাস্তবের সীমানায়। দুর্ভিক্ষের ছবি নন্দলালও এঁসেছিলেন যে ছবির ভাব আলাদা।

মূলধারা নন্দলালকে কেন্দ্র করে বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর - এই দুই ধারা বেরিয়ে এসেছিল। ছাত্র প্রভাত সেনের কথায় -- ''যতদূর মনে পড়ে তাঁর কাজ সম্বন্ধে একমাত্র সহকর্মী বিনোদদার মতামত সম্বন্ধে তাঁর কিছু আগ্রহ ছিল। দুজনেই দুজনকে কাজ দেখিয়ে আলোচনা করতেন। মাষ্টারমশাইকে কাজ দেখাতেন ছাত্রের মতো।'' ''তখন আশ্রমের কাজকর্ম শুরু হত ভোরবেলা থেকে। পাঁচটা নাগাদ বৈতালিক হতো গৌরপ্রাঙ্গণে, পুরান লাইব্রেরী বাড়ির সামনে। বৈতালিকের পর কলাভবন হয়ে মাষ্টারমশাই আর বিনোদবিহারী কলাভবন হোস্টেলের পাশেই রামকিঙ্করের বাড়ির বারান্দায় গিয়ে বসতেন। সেখানে এক কাপ চা পান করে তিনজনে কলাভবনে যার যার কাজের ঘরে চলে যেতেন। বিকেলে কাজের শেষে আবার তিনজন সেখানে জমা হতেন, চা খেতেন, নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। কখনও বা তিনজনে চুপ করে বসে পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করতেন।'' যখন কিঙ্করের মতো শিল্পী নিজেকে অনুভূতির মধ্য দিয়ে রোমন্থন করে সর্বসাধারণের কাছে নিজেকে উজার করে ব্যক্ত করেন .. ''দেখ ভাই, আমি বিনোদবাবুর মতো পড়ুয়া লোক নই, অত লেখাপড়াও করিনি। বিনোদবাবু বিদেশি শিল্পতত্ত্বের বই পড়ে তাদের ভাবনা-চিন্তা, তারা কী করতে চাইছেন তার সারমর্ম আমাকে বোঝাত, পড়ে শোনাত, আবার মাষ্টারমশাই, বিনোদবাবু এবং আমার মধ্যে তর্কাতর্কিও হতো। এইসব রীতি ও আঙ্গিকের কথা শোনা ও মন দিয়ে তাদের কাজের ছবি দেখার পর নিজেকেই প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম মনে করে ছবি এঁকেছি''... কী অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল দুই শিষ্যের মধ্যে।

কলাভবনের প্রাক্তন গবেষক ও বিশিষ্ট শিল্পবিদ সুশোভন অধিকারীর মতে, ''বিশ্বশিল্পের আধুনিক প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে যে দু'জন বিশেষ শিল্পীর নাম মুহূর্তে মনে আসে সে দুটি নামের একটি মাতিস এবং অন্যটি পিকাসো... একাধিক সূত্রে মাতিসের সঙ্গে বিনোদবিহারীর এবং রামকিঙ্করের সঙ্গে পিকাসোর মিল চোখে পড়বে।'' মাতিস তাঁর শিল্পী জীবনে কখনও কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে ছবি আঁকেন নি। ব্যালান্স, পিওরিটি

এবং সেরেনিটি দিয়ে জীবনের যা সত্য যা সুন্দর তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর ক্যানভাসে। চিত্রভাবনার এই প্রকাশ লক্ষ করা যায় বিনোদবিহারীর কথাতে-- ''অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমার এক বন্ধু আমায় বলেছিলেন যে, দেশের এই দুর্দিনে আপনার লজ্জা করে না বসে বসে কাগজে রঙ লেপতে? ...দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ঘটেছে-- এর সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমার ছিল না। এ বিষয়ে কোন ছবিও আমি করিনি। শিল্পী জীবনের পরাকাষ্ঠাই আমার চিরদিনের লক্ষ্য। আমি নিজেকে জানতে চেয়েছি এবং সেই জানার জন্যই অন্যকে জানতে চেষ্টা করেছি।'' মাতিসের ছবির রঙের উজ্জ্বলতা বিনোদবিহারীর ছবিতে নেই। তবে কাগজ কেটে বিনোদবিহারীর করা কোলাজের সঙ্গে মাতিসের খুবই মিল পাওয়া যায়। রামকিঙ্করের নিজের কথায়-- ''পিকাসো তো আমাদের সমসাময়িক। সেজান বোধহয় একটু আগে। ভান গখ, গগ্যা, গোইয়া, রেমব্রান্ট আমার ভাল লাগে। এঁরা অনেকেই নমস্য। ...বলা যেতে পারে পিকাসো আমার ফেভারিট।'' রঁদ্যার মতো তিনিও কোনও স্থির মডেল নিয়ে কাজ করেননি। গতিময়তা তাঁদের শিল্পবিন্যাসের অমোঘ হাতিয়ার।

বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্করের শিল্পভাবনা, শিল্প জিজ্ঞাসা, তাদের সৃষ্টি শিল্পের জগতকে শুধু উদ্ভাসিত করেনি, গুরুর কাছে যে আদর্শে তাঁরা দীক্ষিত হয়েছিলেন-- সেই আলোয় প্রজন্মকে এগিয়ে দিয়েছিলেন অনেক দূর। জৌলুস বর্জিত ধুলোমাটিতে দাঁড়িয়ে নিরন্তর ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত বিকাশের পর্বে যেভাবে নিজস্ব শৈল্পিক ভুবন গড়ে তুলেছিলেন এবং মিলিত হয়েছিলেন - নিজের কোলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এমন বোঝাপড়া - এক সাধনা। সেই সাধনেই তাঁরা হয়ে উঠেছেন আধুনিকতার প্রতিভূ।

তথ্যঋণঃ

১. চিত্রকথা - বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
২. চিত্রকর - বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
৩. পুরশ্রী
৪. অন্তরে বাহিরে রামকিঙ্কর - প্রকাশ দাস
৫. বাহা - শান্তিনিকেতনের আদি পর্ব
৬. রঙ কাঁকর রামকিঙ্কর - মনীন্দ্র গুপ্ত
৭. বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্কর - সুশোভন অধিকারী

পাগলা দাশু, অপু, শঙ্কু, জটায়ু, ফেলুদা... এবং সত্যজিৎ

মহাশ্বেতা মণ্ডল

'তিনি যে চিত্রকর তা আজও সাধারণ্যে যথেষ্ট অজ্ঞাত। অথচ চিত্রকর সত্যজিৎকে না জেনে শুধু চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎকে জানা সম্পূর্ণ জানা নয়'...।

পূর্ণেন্দু পত্রীর এরকম ভাবনার পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল অবশ্য সত্যজিৎ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন একজন পেশাদার শিল্পী হিসেবে। গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে বিজ্ঞাপনের নকশা থেকে শুরু করে বই বা পত্রপত্রিকার প্রচ্ছদ, ইলাস্ট্রেশন, ক্যালিগ্রাফি ছাড়াও নিজের সিনেমার পোস্টার, টাইটেল কার্ড, লোগো এবং আরও অসংখ্য কাজের মাধ্যমে শিল্পী সত্যজিতের আত্মপ্রকাশ। তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না, শুধুমাত্র শিল্পী সত্যজিৎকে নিয়ে ভাবনার পেছনে যথেষ্ট উদাসীনতা চোখে পড়ে, যদিও সত্যজিৎ রায়ের শিল্পসৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে, তাঁর কিছু কাজ বেছে নিয়ে দু একটা অ্যালবামও প্রকাশ করা হয়েছে, এমনকি দু'একটা প্রদর্শনীও হয়েছে। কিন্তু তা এতটাই সামান্য যে শিল্পী সত্যজিতের প্রতিভার সম্যক পরিচয় পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয় না। অথচ তিনি সারা জীবনে যা যা শিল্প-সৃষ্টি করে গেছেন তার প্রত্যেকটাই একেকটা মাস্টারপিস। আশ্চর্য এই যে সত্যজিতের শিল্প-সৃষ্টি নিয়ে তবুও সর্বতোভাবে কোনও পর্যালোচনা, নিরীক্ষা বা গবেষণা হত না। তাঁর বেশ কিছু শিল্প আজ ইতিহাসের গর্ভে বিলীন অথবা অবহেলায় বিনষ্ট, লুপ্ত। তাঁর এই শিল্পী সত্তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ভাবনাচিন্তা হলেও তার রাস্তা কিন্তু বন্ধ।

'যে জিনিসটা ছেলেবয়স থেকে বেশ ভালোই পারতাম সেটা হলো ছবি আঁকা' - ১৯৮১ সালের *সন্দেশ*এর মে মাসের সংখ্যায় সত্যজিৎ রায় তাঁর আত্মস্মৃতি যখন *ছোট ছিলাম*এ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই কথাটি জানিয়েছিলেন। সত্যজিতের বংশ পরিচয় জানা থাকলে ছেলেবেলা থেকে ছবি আঁকতে তাঁর সহজাত প্রতিভা দেখে আশ্চর্য হতে হয় না। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও পিতৃদেব সুকুমার রায় দুজনেই ইলাস্ট্রেটর এবং চিত্রকর হিসেবে চূড়ান্ত পারদর্শী। জন্মগত দক্ষতা থাকলেও ছবি আঁকাতে

রীতিমতো প্রথাগত তালিম নিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। সালটা ১৯৪০, গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর শান্তিনিকেতন এর কলাভবনে ফাইন আর্টস নিয়ে ভর্তি হলেন সত্যজিৎ, কিছুটা তাঁর মা-এর জোরাজুরিতেই। ইচ্ছে ছিল কমার্শিয়াল আর্ট নিয়ে পড়াশোনা করার। কলাভবনে তখন কমার্শিয়াল আর্ট নিয়ে পড়াশোনা হতো না। বরং শান্তিনিকেতনের শিল্পবান্ধব পরিবেশ প্রতিভাবান যুবকটিকে দু হাত বাড়িয়ে সাদরে গ্রহণ করেছিল। হতাশ হন নি সত্যজিৎ, পেয়েছিলেন নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রথিতযশা শিল্পীর সান্নিধ্য। তাঁর সহজাত প্রতিভার হীরকখন্ডটি সঠিক হাতের স্পর্শে আরও ক্ষুরধার, আরও ভাস্বরতর হয়ে উঠেছিল। বলা যায় সত্যজিতের শিল্পসত্তার সূত্রপাত হয়েছিল শান্তিনিকেতনেই।

চার বছরের কোর্স শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করেন নি সত্যজিৎ। আড়াই বছরের মাথায় ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনের শৈল্পিক নির্যাসকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে আস্বাদন করে কলকাতায় ফিরে এলেন সত্যজিৎ। আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকলেও সত্যজিতের এ ব্যাপারে আগেই শেখা হয়ে গিয়েছিল। নিজের পছন্দমতো এবং রুচিসঙ্গত চাকরি খুঁজে পেতে বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল সত্যজিৎকে। পরিশেষে বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি. জে. কিমার এ জুনিয়র আর্টিস্ট হিসেবে পথ চলা শুরু। বলা ভালো, এক ইতিহাস সৃষ্টির প্রারম্ভ মুহূর্তের একমাত্র সাক্ষী হয়ে রইল ডি. জে. কিমার। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিবিধ পণ্যসামগ্রীর প্রচারার্থে যে ছবি বা ডিজাইনের প্রয়োজন মূলত সেই কাজেরই আশায় ডি. জে. কিমার এ যোগ দিয়েছিলেন সত্যজিৎ। ভাবনার মোড় ঘুরলো যখন প্রস্তাব এলো সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের প্রচ্ছদ আর ইলাস্ট্রেশনএর দায়িত্ব নিয়ে নিজের নিখাদ প্রতিভাকে সর্বসমক্ষে নিয়ে ১৯৪৩ সালের জুন মাসেই কিমার এর ম্যানেজার দিলীপ কুমার গুপ্তের প্রকাশনা সংস্থা সিগনেট এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শুরু করেছিলেন এক নতুন অধ্যায়। কলাভবনের যাবতীয় শিক্ষা, অভিজ্ঞতা তাঁকে গ্রন্থসজ্জা বা বইয়ের ছবির জগতে এক স্বতন্ত্র জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। বাংলা বইয়ের গ্রন্থসজ্জা, অঙ্গসৌষ্ঠব বা ছাপার ক্ষেত্রে নতুন রীতির প্রবর্তন সব ক্ষেত্রেই দিলীপ কুমার গুপ্ত ওরফে ডি. কের সাহায্যে বাংলার শিল্পজগতে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন সত্যজিৎ। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে গ্রাফিক ডিজাইন-এর যে অগুনতি কাজ সত্যজিৎ করেছিলেন সেগুলোকে এক জায়গায় এনে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা এবং তার মূল্যায়ন করা যদিও অসম্ভব, তবুও শিল্পী সত্যজিতের সিন্ধুসম

প্রতিভার বিন্দুমাত্র আভাস তাঁর অনুরাগী পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতেই এই প্রচেষ্টা।

সালটা ১৯৪০, সত্যজিৎ সদ্য পা রেখেছেন শান্তিনিকেতনে, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স কোম্পানির কাছ থেকে দায়িত্ব পেলেন *পাগলা দাশু*র প্রচ্ছদ করার জন্য। গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে যথেষ্ট অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সত্যজিৎকে এই কাজের জন্য ভাবা হয়েছিল তার কারণ একটাই - তিনি সুকুমার রায়ের ছেলে। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর এটা ছিল তাঁর প্রকাশিত তৃতীয় বই। বিশেষ সচেতন ছিলেন সত্যজিৎ কারণ সেটা ছিল তাঁর প্রথম প্রচ্ছদ অঙ্কন তাও আবার সুকুমার রায়ের লেখা *পাগলা দাশু*র মতো বইয়ের প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদটি ছিল একটি সাদা বর্ডার এর মাঝখানে নীল রঙের একটি চৌকো ক্ষেত্রের মধ্যে লাল রঙে বইয়ের নাম লেখা। সামনে বড়ো করে দাশুর মুখ আর দূরে দাশুর বন্ধুরা একটা ফাঁকা বাক্স খুলে বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে। আর দাশু পাঠকের দিকে চোখ মটকে 'কেমন দিলাম' গোছের একটা মুখভঙ্গি করছে। দাশুও যেন তার দুষ্টুমি পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছে। এই প্রচ্ছদের এক কোণায় সত্যজিতের একটা ছোট্ট সই রয়েছে, তাও আবার ইংরেজিতে। তখনকার সময়ে এটাই রেওয়াজ হলেও, পরের দিকে অবশ্য প্রফেসর শঙ্কুর কান্ডকারখানাতে বাংলায় সই করা ছাড়া আর কোনও বইয়ের প্রচ্ছদে সত্যজিৎকে নিজের নাম ব্যবহার করতে দেখা যায় নি। প্রশ্ন ওঠে তাহলে হঠাৎ *পাগলা দাশু*তে নিজের নামের আদ্যক্ষর ইংরেজিতে সই করার পেছনে ভাবনাটা কি ছিল? সইটাতে নিজের নামের আদ্যক্ষর যেভাবে পদবীর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ, তাতে সুকুমার রায়ের সাক্ষরের সঙ্গে অদ্ভুত এক সাদৃশ্য চোখে পড়ে। জীবনের শুরুতে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার মুহূর্তে বাবার বইয়ে কাজ করার সময় সুকুমার রায়ের ভাবমূর্তি সম্বন্ধে কতটা সতর্ক ছিলেন, কতটা যত্নবান ছিলেন সত্যজিৎ তা চোখে পড়ে। পরের প্রচ্ছদটি সত্যজিৎ করেছিলেন প্রখ্যাত ডাচ গ্রাফিক আর্টিস্ট এম. সি. এশার-এর 'সিমেট্রি' সিরিজ এর ছবিগুলোর ভাবনা মাথায় রেখে। ১৯৪৩ সালে ডি. জে. কিমার কোম্পানিতে যোগদানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সত্যজিতের হাতে আসে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ছোটদের গল্পসংকলন *ছাতুবাবুর ছাতার* প্রচ্ছদ অঙ্কন এর দায়িত্ব। জীবনের দ্বিতীয় প্রচ্ছদটিও বেশ চিত্তাকর্ষক করেই এঁকেছিলেন সত্যজিৎ। ব্যবহার করেছিলেন রং তুলি। প্রচ্ছদে প্রথমেই চোখে পড়বে বিশালাকৃতি এক ছাতা, ছাতার তলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছাতুবাবুর কোট আর গোবদা জুতো। প্রচ্ছদে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ার ব্যাপারটা অদ্ভুতভাবে সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। ছাতুবাবুর কালো কোটের গায়ে সাদা রং দিয়ে

বৃষ্টির ফোঁটা এঁকেছিলেন আর গোটা ব্যাকগ্রাউন্ডটাই সাজিয়েছিলেন সাদা আর হলুদ রঙের ছাতা দিয়ে। যেগুলো একদিকে positive আর অন্য দিকে negative রেকারিং motif এর মতো এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যেন ঝমঝমে বৃষ্টির ছবিটা তুলে ধরা যায় পাঠকের সামনে।

বিজ্ঞাপন অফিসে চাকরি করার সময় সেখানকার আর্ট ডিরেক্টর শিল্পী অন্নদা মুন্সির কাছে সত্যজিৎ নতুনভাবে শেখেন লে আউট, ইলাস্ট্রেশন, টাইপোগ্রাফি এবং লোগো ডিজাইনের কাজ। কাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতিও হচ্ছিল সমানতালে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের কাজে একঘেয়েমি আসতে বাধ্য। ক্লায়েন্টদের খুশি করতে গিয়ে সত্যজিৎ বাধ্য হচ্ছিলেন নিজের সৃষ্টির ভাবনার অভিনবত্বকে একরকম পাশে সরিয়ে রাখতে। ঠিক এই সময়ে ডি. কে. তাঁর সামনে খুলে দিলেন বই প্রকাশনার জগতের এক নতুন দিগন্ত। প্রচ্ছদ রূপকার হিসেবে সবার চেয়ে অন্যরকম ছিলেন সত্যজিৎ। ভিস্যুয়াল কমিউনিকেশন এর নিজস্ব এক ঘরানা ছিল তাঁর। মূলত সিগনেটের হয়ে কাজ করলেও বেশ কিছু সাহিত্যিক পত্রিকারও প্রচ্ছদ চিত্রণের দায়িত্ব ছিল সত্যজিতের ওপর। কিন্তু প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে সত্যজিতের যে অভিনব শিল্পবিকাশ, তার জন্য সিগনেটের অবদান কম ছিল না। বরং বলা ভালো সিগনেটের পরিবেশ, ডি. কে. এর সান্নিধ্য, বন্ধুত্ব এবং তাঁর নিজস্ব পারফেকশনিজম সত্যজিৎকে প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। সিগনেটের হয়ে আশি থেকে নব্বইটি প্রচ্ছদ করেছিলেন সত্যজিৎ এবং প্রতিটি প্রচ্ছদই একে অপরকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তার অভিনবত্বে এবং শিল্প ভাবনায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ক্ষীরের পুতুল* এর প্রচ্ছদ ছিল সিগনেটের হয়ে সত্যজিতের করা প্রথম প্রচ্ছদ। রং তুলির ছন্দে ছবির মধ্যে বঙ্গীয় থিমের মূলভাবটি অনায়াসে পাঠকের কাছে ধরা পড়ছিল। কালো রঙের ড্রয়িং আর ব্যাকগ্রাউন্ডটা লাল আর হলুদ রং এমন ভাবে ভাগ করেছিলেন সত্যজিৎ যে প্রচ্ছন্ন এক মাঙ্গলিক দৃশ্য ফুটে উঠছিলো। প্রচ্ছদের ঠিক মাঝখানে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসা ধুতি টোপর পরা পুতুল বর আর তলায় বই আর লেখকের নামটা অনেকটা আলপনার মতো করে লেখা এক অন্য মাত্রা যোগ করেছিল। এর কয়েক বছর বাদে সিগনেট থেকে *ক্ষীরের পুতুল*-এর একটি পেপারব্যাক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আড়াআড়ি লম্বাটে এই বইয়ের মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সত্যজিৎ তৈরী করলেন নতুন থিম। এই প্রচ্ছদ এমন ভাবে সাজালেন সত্যজিৎ যাতে লোকশিল্পের আমেজটা বজায় থাকে। প্রচ্ছদ চিত্রণে সত্যজিৎ সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা স্টাইল অনুসরণ

করতেন। সত্যজিৎ অনেক সময় শুধু ফ্ল্যাট রঙে ড্রয়িং করতেন এবং তাতে প্রচ্ছদ গঠন বা বিন্যাসের মধ্যে রঙের একটা প্রতিসাম্য বজায় রাখতেন। আর কাগজের সাদা অংশটিকে সুন্দর কৌশল করে ছেড়ে রেখে আউটলাইনের চেহারা দিতেন। এই নতুন ধরনের কৌশলটি সত্যজিতের প্রচ্ছদেই প্রথম দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায় উপেন্দ্রকিশোরের *ছোট্ট রামায়ণ* (১৯৫৬) বা অবনীন্দ্রনাথের *বুড়ো আংলা* (১৯৫৩) প্রচ্ছদ দুটি। কোনও জায়গায় কোনও আউটলাইন নেই, অথচ প্রতিটা মুভমেন্ট বা অদ্ভুত শুঁড় তোলা নকশার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা মানুষের ফিগার সবকিছুই সত্যজিৎ পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ওই সাদা অংশটিকে কৌশলে ছেড়ে ব্যবহার করে।

প্রচ্ছদ নকশায় যতগুলো রংই ব্যবহার করুন না কেন, প্রত্যেকটা রংই সমানভাবে জোরালো করে তুলে এক অদ্ভুত ঝলমলে প্রচ্ছদ সৃষ্টি করার অসামান্য ক্ষমতা ছিল সত্যজিতের। *প্রেতসিদ্ধের কাহিনী* বা তাঁর আঁকা *ছোট্ট ছোট্ট গল্প* এরকম অনেক ছোটদের বইয়ের প্রচ্ছদ প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা যায়। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৬-র মধ্যে সিগনেট থেকে প্রকাশিত হয় সুকুমার রায়ের যাবতীয় প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত রচনা সমূহ। বলাবাহুল্য প্রচ্ছদ সৃষ্টির দায়ভার পড়েছিল সত্যজিতের ওপর। *হযবরল, আবোলতাবোল* থেকে শুরু করে *পাগলা দাশুর* নতুন সংস্করণ এই সবকটি বইয়ের প্রচ্ছদ ছিল অভিনব। বিশেষভাবে বলতে হয় *ঝালাপালার* এবং *খাই খাই* এর প্রচ্ছদের কথা। সুকুমারের নাটকের সংকলন *ঝালাপালার* প্রচ্ছদে মূল ড্রয়িং এর সঙ্গে রংকে মিশিয়ে দিয়েছেন সত্যজিৎ। Reverse ড্রয়িং, স্টেজের ড্রপসিনের মতো ব্যাকগ্রাউন্ডে দুটো জোরালো রং পাশাপাশি ভার্টিকাল ভাবে ফেলা। অপরদিকে *খাই খাই* এর প্রচ্ছদে দেখা যাচ্ছে একটা নেমতন্ন বাড়িতে পাত পেতে বসে খাওয়াদাওয়া চলছে। ভোজবাড়ির খাওয়াদাওয়ার বিশৃঙ্খলা বোঝাতে প্রত্যেকটি মানুষের আলাদা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শুরু করে সবার মধ্যে একটা পল্লীজাত, অমার্জিত হ্যাংলাপনা বা খাই খাই ভাব আশ্চর্য ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ, তাও তিনটে মাত্র ফ্ল্যাট রঙ ব্যবহার করে। সিগনেট এবং সত্যজিৎ রায়ের এই যুগলবন্দী যেন একটা নতুন ইতিহাসের সূচনা। ১৯৪৮ সালে দীপঙ্কর ভবন থেকে প্রকাশিত হয় বিমলচন্দ্র ঘোষের লেখা *হাতে খড়ি* বইটি। ছড়ার মাধ্যমে অ-আ-ক-খ শেখানোর ছোটদের এই বইটিতে সত্যজিতের প্রচ্ছদ ভাবনা একদমই অন্যরকম। বাচ্চাদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য বইটিকে একটা স্লেটের আকারে করে তার চারপাশে কাঠের ফ্রেম দিয়ে এক অসাধারণ পদ্ধতিতে বইটি সাজিয়েছিলেন।

ক্যালিগ্রাফির নিয়ম মেনে প্রচ্ছদের ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলা অক্ষর, সাদা খড়ির দাগের মতো করে বইয়ের নাম লেখা। সব মিলিয়ে প্রচ্ছদটি একটা স্লেট বলে ভুল হবে। গ্রাফিক ডিজাইনকে কোন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ এই বইটি তার প্রমাণ।

আবার সিগনেটেই ফিরে আসা যাক। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় জিম করবেটের লেখা *ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন* এর বাংলা অনুবাদ *কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ*। সামনের এবং পেছনের প্রচ্ছদ জুড়ে আছে বাঘের গায়ে গুলি লাগার দাগ। সামনের প্রচ্ছদগুলির দাগটা সত্যজিৎ একটু বড়ো করে এঁকেছিলেন। শিল্পী দেবাশীষ দেবের ভাষায় বলা যায়, 'কোনও রং বা ড্রয়িং এর আতিশয্য নয়, শুধু চিন্তাশক্তির অভিনবত্বকে কাজে লাগিয়ে সত্যজিৎ এর নিখুঁত লক্ষ্যভেদ'।

১৯৫০ দশকটি সত্যজিতের প্রচ্ছদ সৃষ্টির দিক দিয়ে বিচার করলে সবচেয়ে স্মরণীয় দশক। এই বছরেই সত্যজিৎ উপহার দিয়েছিলেন এমন কিছু কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ যাতে তিনি পদ্যসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর স্বকীয় ধারণা বা ব্যক্তিগত ভাবনা ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর নিজস্ব স্টাইলে। গতে বাঁধা ভিসুয়ালের ধারা বা ধারণা দুটোকেই সচেতনভাবে পাল্টে দিয়েছিলেন তাঁর অনন্য ভঙ্গিতে। ১৯৫২-এ জীবনানন্দ দাশের কবিতা সংগ্রহ *বনলতা সেন* এর প্রচ্ছদে সত্যজিৎ আঁকলেন গহন নিবিড় লতা পাতার মাঝে বেরিয়ে থাকা কোমল এক নারীর অবগুণ্ঠিত মুখ। সরু সরু অজস্র লাইনের নানারকম প্যাটার্ন দিয়ে সত্যজিৎ সৃষ্টি করলেন এই বইয়ের প্রচ্ছদ। এর পরই বলতে হয় 'দুরন্ত দুপুর'প্রচ্ছদটির কথা। কাঁচাহলুদ রংয়ের প্রচ্ছদে দুপুরের রোদের আভাস, তারই মাঝে এলোচুলে শুয়ে রয়েছে এক শিথিলবসনা নারী, যেমন কাব্যিক তেমনিই sensual। আঁরি মাতিস এর ড্রয়িং এর সাবলীলতার সাথে এই প্রচ্ছদের অসম্ভব সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ১৯৫৩তে সত্যজিৎ আঁকলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *অমাবস্যার* প্রচ্ছদ। কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা প্যাস্টেলে আঁকা একটু আবছা রহস্য মাখানো নারীর মুখ। মুখের আদলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আঁকা নারীর আদলের সাদৃশ্য আছে। ১৯৫৪য় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর *নবনীতা* বইটিতে সত্যজিৎ ব্যবহার করলেন পেপার কাটিং পদ্ধতি বা ১৯৫৫য় লীলা মজুমদারের *জোনাকি*তে তুলির শক্ত বাঁট এর পেছন দিক রঙে ডুবিয়ে সৃষ্টি করলেন এক অদ্ভুত সুন্দর প্রচ্ছদ। এ'ছাড়া তুলি দিয়ে করা সত্যজিৎ এর ক্যালিগ্রাফির উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আম

আঁটির ভেঁপু' বই এর প্রচ্ছদ।

১৯৬০এর দশকের শুরুর দিক থেকেই অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন সত্যজিৎ। মূলত সিনেমার কাজের ক্রমবর্ধমান চাপের জন্য সময় দিতে পারছিলেন না। এই ছবিটাই আবার পাল্টে গেল ১৯৬১ সালে। এই বছর সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় *সন্দেশ* পত্রিকাটি নতুনভাবে আবার বের করতে শুরু করলেন। এক সময় উপেন্দ্রকিশোরের প্রকাশিত এই পত্রিকাটির সঙ্গে রায় পরিবারের হৃদয়াবেগ, কৃষ্টি, ঐতিহ্য সবকিছু জড়িয়ে ছিল। সন্দেশ-এর জন্য প্রকাশনা জগৎটাকে গভীরে গিয়ে বুঝতে শুরু করলেন সত্যজিৎ এবং শুরু হলো তাঁর নিয়মিত সাহিত্যচর্চা। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই আসে *এক্ষণ* পত্রিকার কথাও। কারণ এই পত্রিকাটির জন্মলগ্ন নতুন *সন্দেশ*এর প্রায় সমসাময়িক। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং নির্মাল্য আচার্যর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত *এক্ষণ* এবং *সন্দেশ*-এর প্রচ্ছদ অলঙ্করণ আমৃত্যু করে গেছেন সত্যজিৎ।

সত্যজিতের প্রচ্ছদ অঙ্কনের উত্তরপর্বে, অর্থাৎ তাঁর জীবনের শেষ পঁচিশ বছরে যতগুলো বইয়ের প্রচ্ছদ চিত্রণ করেছিলেন তার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি তাঁর নিজেরই লেখা। বাকি বইগুলোর অধিকাংশই ছিল সৌজন্যমূলক। তাই কিছু শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে এইসব বইয়ের প্রচ্ছদে বৈচিত্রের অভাব লক্ষ করা যায়। সত্যজিতের এই সমালোচনা অস্বীকার করার খুব একটা জায়গা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে তাঁর নিজের বইয়ের প্রচ্ছদগুলোর প্রতি শিল্পরসিকদের আকর্ষণ এবং কৌতূহল সবই ছিল মাত্রাতিরিক্ত। সিনেমা সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলো ছাড়া সত্যজিতের লেখার ঝুলিতে সব লেখাই ছিল শিশু আর কিশোরদের জন্য। সেই সময়ের শিল্পীরা বাংলা সাহিত্যে ছোটদের বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকতে গিয়ে বেশি করে রং ব্যবহার করে প্রচ্ছদটা চকচকে, ঝলমলে করার চেষ্টা করতেন। ছবিতে রঙিন হাফটোনের আধিক্য ছিল বেশি। সত্যজিৎ সচেতনভাবেই এই পথ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছোটদের বইয়ের জন্য বেছে নিয়েছিলেন আউটলাইন ড্রইংয়ের সঙ্গে ফ্ল্যাট রঙ। এই স্টাইলেই তিনি *প্রোফেসর শঙ্কু*র প্রচ্ছদ সৃষ্টি করেছিলেন। সত্যজিতের প্রথম বই *প্রোফেসর শঙ্কু* ১৯৬৫ সালে নিউ স্ক্রিপ্ট থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে শঙ্কুকে সত্যজিৎ যেভাবে এঁকেছিলেন তার সাথে টিনটিন কমিকস এর *প্রোফেসর ক্যালকুলাস*এর সাদৃশ্য পাওয়া যায় - অর্থাৎ টাক মাথা সাদা গোঁফ দাড়িওয়ালা, চশমা পড়া একটি মজাদার চেহারার বিজ্ঞানী। পরের দিকের গল্পগুলোর প্রচ্ছদে শঙ্কুর চেহারায় একটু রাশভারী ছাপ এসেছে। ১৯৭০ থেকে ১৯৮৩ এই তেরো বছরে প্রোফেসর

শঙ্কুর আরও পাঁচটি বই প্রকাশিত হয় এবং এই সবকটি বইয়ের প্রচ্ছদই সত্যজিতের নিজের হাতে আঁকা। প্রত্যেক প্রচ্ছদে সত্যজিৎ অনায়াসে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন গল্পের আভাস এবং মেজাজ। বিশেষভাবে বলতে হয় ১৯৮০ তে প্রকাশিত স্বয়ং *প্রোফেসর শঙ্কুর* প্রচ্ছদ এর কথা। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল এর পাতা কেটে তৈরী করেছিলেন শঙ্কুর মুখের প্রোফাইল, তার দাড়ি গোঁফ আর চশমা।

প্রোফেসর শঙ্কুর পরেই তাঁর সৃষ্ট অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র ছিল ফেলুদা। ফেলুদা সিরিজের মোট ১৮টি প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সত্যজিৎ যার মধ্যে *সোনার কেল্লা* সিনেমার স্টিল দিয়ে করা প্রচ্ছদটিও রয়েছে। ফেলুদার গল্পের অধিকাংশ প্রচ্ছদ আঁকতে গিয়ে সত্যজিৎ সচেতনভাবে ফেলুদাকে তার সাঙ্গপাঙ্গ সমেত মিশিয়ে দিয়েছেন গল্পের লোকেশনের সঙ্গে। ফেলুদার প্রথম বই *বাদশাহী আংটির* প্রচ্ছদ জুড়ে সাদাকালো ড্রয়িং করেছিলেন সত্যজিৎ, আর এর ঠিক মধ্যিখানে রংগুলো জড়ো করে হীরের উজ্জ্বলতাকে যেন আরও তীব্র ভাবে ফুটিয়েছেন। প্রচ্ছদের ডিটেইলিং ছিল চোখে পড়ার মতো। ফেলুদা সিরিজের প্রতিটি প্রচ্ছদেই সাসপেন্স বজায় রেখেছেন সত্যজিৎ। প্রতিটি প্রচ্ছদে প্রথমেই চোখে পড়ে আউটলাইন নির্ভর বাস্তবধর্মী কম্পোজিশন! সত্যজিৎ ফেলুদা, তোপসে আর জটায়ুর ফিগারগুলো সবসময় আঁকতেন সাদাকালোয় অথচ ব্যাকগ্রাউন্ডের বিষয়বস্তুর মধ্যে ফ্ল্যাট রং ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন। *রয়েল বেঙ্গল রহস্যতে* ঘন অন্ধকার ছায়াময় জঙ্গলে সাদা কাট-আউটে সব ফিগারগুলো এঁকেছেন, ব্যাকগ্রাউন্ডএ নীল রেখায় বাঘের পাশবিক হিংস্র মুখ - এক অদ্ভুত গা ছমছমে ভাব। আবার *জয় বাবা ফেলুনাথ*এ দেখা যায় ফেলুদা, তোপসে আর জটায়ুর পেছনে বেনারসের গলি, দু'পাশে প্রকান্ড বাড়ি আর দুটো বাড়ির মধ্যে বাঁশ লাগিয়ে বহু উঁচুতে ঝুলে থাকা একটি ছেলে। গল্প পড়ে দেখার আগেই, শুধুমাত্র প্রচ্ছদের মাধ্যমে পাঠকের মনে সাসপেন্স সৃষ্টি করার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল সত্যজিতের।

ফেলুদা সিরিজের প্রতিটা প্রচ্ছদেই প্রথম থেকে তোপসেকে রেখেছিলেন সত্যজিৎ। জটায়ুকে নিয়ে এসেছিলেন ফেলুদার চতুর্থ বই *বাক্স রহস্য* থেকে - ১৯৭৩ সালে। কিন্তু প্রতিটি প্রচ্ছদে এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এখানে ফেলুদাই প্রধান। ফেলুদার প্রচ্ছদগুলো পর পর সাজালেই দেখা যাবে কিভাবে ধীরে ধীরে তোপসে আর জটায়ু সেখানে অপ্রধান হয়ে উঠেছেন। ফেলুদা সিরিজের শেষ দুটো বই *ডবল ফেলুদা* আর *নয়নরহস্যর* প্রচ্ছদে তোপসে আর জটায়ুকে আর দেখাই যায় না। ফেলুদার চরিত্রের সঙ্গে সত্যজিৎ নিজেকে অনেকটাই মিশিয়ে দিয়েছিলেন। পঁচিশ বছর ধরে ফেলুদাকে

নিয়ে টানা কাজ করেছেন সত্যজিৎ। ফেলুদাকে নিয়ে এতো গল্প উপন্যাস লিখতে লিখতে তাঁর যে আত্ম-প্রক্ষেপণ নানা ভাবে কাজ করেছে, পাঠকদের কাছে সেটা সহজেই বোধগম্য। চারিত্রিক সাদৃশ্য ছাড়াও সত্যজিৎ তাঁর চরিত্রের সঙ্গে নিজের মিলটা সচেতনভাবেই তুলে ধরেন পাঠকের সামনে *রয়েল বেঙ্গল রহস্য* গল্পে। সেখানে তোপসে জানায়, মাত্র ন'বছর বয়সে ফেলুদার বাবার মৃত্যু এবং তারপর থেকে ফেলুদার তার মামার বাড়িতে মানুষ হওয়ার কথা। এখানে সত্যজিৎ প্রকারান্তরে তাঁর জীবন কাহিনী পৌঁছে দিয়েছেন পাঠকের কাছে। তবে কী প্রচ্ছদে ধীরে ধীরে ফেলুদার একাই একশো হয়ে ওঠা এবং তার বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সত্যজিৎ নিজের নিঃসঙ্গতা বোঝাতে চেয়েছিলেন? ফেলুদাকে সত্যজিতের অল্ট ার ইগো হিসেবেই দেখা হয় তখন কি এটাই মেনে নিতে হবে যে সত্যজিতের ব্যক্তিগত জীবনেও কিছু ইগোর সমস্যা দেখা দিয়েছিলো? নিজের আঁকা প্রচ্ছদে নিজের জীবনের রূপরেখার ধূসর ছবি রঙের আড়ালে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন হয়তো সচেতনভাবেই।

১৯৮৬ সালে প্রকাশ পাওয়া *তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম* বা ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত *তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ* এর প্রচ্ছদ দুটি পাঠকদের খানিকটা হতাশ করেছিল। সত্যজিতের সেই জাদু কোথাও চোখে পড়ছিলো না। ১৯৭০ থেকে ১৯৮১র মধ্যেই প্রকাশিত তাঁর তিনটে জনপ্রিয় গল্প সংকলন *আরো এক ডজন, আরো বারো*, বা *এক ডজন গপ্পোর* প্রচ্ছদ ও আলাদাভাবে চোখে পড়ে না। এতে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ক্যালিগ্রাফির টান এবং নৈপুণ্যের অভাব ছিল না ঠিকই, কিন্তু সেই আকর্ষণীয় ভিসুয়াল কোথাও চোখে পড়ে নি, যা ছিল সত্যজিতের প্রচ্ছদ ডিজাইনের বৈশিষ্ট।

অথচ পত্রিকার প্রচ্ছদে সত্যজিৎ কিন্তু তখনও বেশ সৃজনশীল। *সন্দেশ* এবং *এক্ষণ* এই দুটি পত্রিকাতেই সত্যজিৎ সৃষ্টি করেছিলেন শিল্পকর্মের দুটি ধারা, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব। সত্যজিতের জীবদ্দশায় *সন্দেশ*এর প্রচ্ছদে অন্য কোনও শিল্পীর আঁকা চোখে পড়ে নি। আজও *সন্দেশ* পত্রিকা প্রকাশিত হয় - অনিয়মিত হলেও সত্যজিতের সৃষ্ট প্রচ্ছদের ডিজাইনগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সত্যজিৎ গোড়া থেকেই সচেতন ছিলেন এই পত্রিকার প্রচ্ছদ নিয়ে। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল *সন্দেশ*এর মাধ্যমে এক ফ্যান্টাসির জগৎ ছোটদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সন্দেশ বলতে এখানে দুটো জিনিস বোঝানো হতো - ছোটদের পত্রিকা আর মিষ্টি। সত্যজিৎ *সন্দেশ*এর অনেক প্রচ্ছদেই এই দুটোই ব্যবহার করেছেন সমানভাবে। প্রতি মে মাসে তিনরঙা একটি প্রচ্ছদ এঁকে দিতেন সত্যজিৎ, সারাবছর এই প্রচ্ছদই ব্যবহার হতো রঙের কম্বিনেশন পাল্টে।

মাত্র তিনটে ফ্ল্যাট রংকে কি অসাধারণভাবে ব্যবহার করে সত্যজিৎ সৃষ্টি করতেন জমকালো একটা ভিসুয়াল। ১৯৮১ সালে 'সন্দেশ'এর কুড়ি বছর উপলক্ষে সত্যজিৎ উপহার দিয়েছিলেন এক সুন্দর প্রচ্ছদ। পুকুরধারে বসে দুটি ছেলে মেয়ে মাছ ধরার জন্য ছিপ ফেলেছে আর টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে *সন্দেশ* পত্রিকাটি যার ওপর কুড়ি বছর লেখা। বিশাল আকৃতির এক কাতলা মাছকে দেখা যাচ্ছে। এই আনন্দের খবর পড়ে *সন্দেশ* পত্রিকাটি হাঁ করে গিলতে আসছে। এছাড়াও *সন্দেশ*এ সত্যজিৎ এঁকেছিলেন জীবনের প্রথম কমিকস, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন *ছবিতে গল্প*। ক্যালিগ্রাফিতে তাঁর দক্ষতা কোন উচ্চতায় পৌঁছেছে, তা বোঝা গেল যখন কাগজকে জলে ভিজিয়ে ড্যাম্প করে তুলির মোটা লাইনে 'দেশ ৮১' লেখা কথাটা লিখে সৃষ্টি করলেন *দেশ* পত্রিকার এক অনন্যসাধারণ প্রচ্ছদ।

একটা কথা স্বীকার করতেই হয় যে তাঁর 'সত্যজিৎ রায়' হয়ে ওঠার পেছনে শান্তিনিকেতনের অবদান কম ছিল না। বরং বলা ভালো শান্তিনিকেতনে কাটানো আড়াই বছরে তার ভিতটা মজবুত হয়ে উঠেছিল। অনেক গুণী মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন সত্যজিৎ। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাঁরাই সত্যজিৎকে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর লক্ষ্যে। ক্যালিগ্রাফিতে সত্যজিতের যে এই দক্ষতা তার পিছনে ছিলেন বিনোদবিহারী এবং সত্যজিৎ সে কথা বার বার স্বীকার করতেন। কোনও সন্দেহ নেই, শান্তিনিকেতনেই নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং রামকিঙ্কর সত্যজিতের মধ্যেই শিল্পসৃষ্টির সেই বীজটি বপন করে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যা মহীরুহ হয়ে বাংলা সাহিত্যকে, শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে এবং আজও করে চলেছে।

গ্রন্থঋণ ঃ *রং তুলির সত্যজিৎ* - দেবাশীষ দেব

সত্যজিতের প্রচ্ছদ কাহিনী

শান্তিনিকেতনে অতিথি শিল্পীদের আঁকা ছবি

কাম্পো আরাই আঁকা

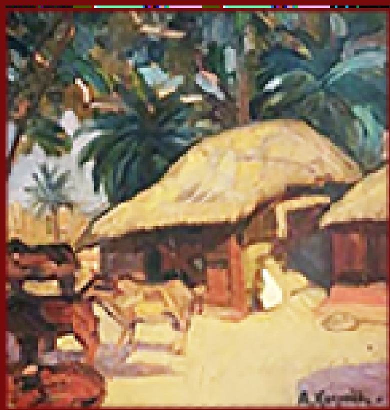

আঁদ্রে কারপেলের আঁকা ছবি

ওকোয়ামা টাইকানের আঁকা ছবি

।। বিশ্বযোগে বিশ্বভারতী ।।

শ্রীপর্ণা মিত্র

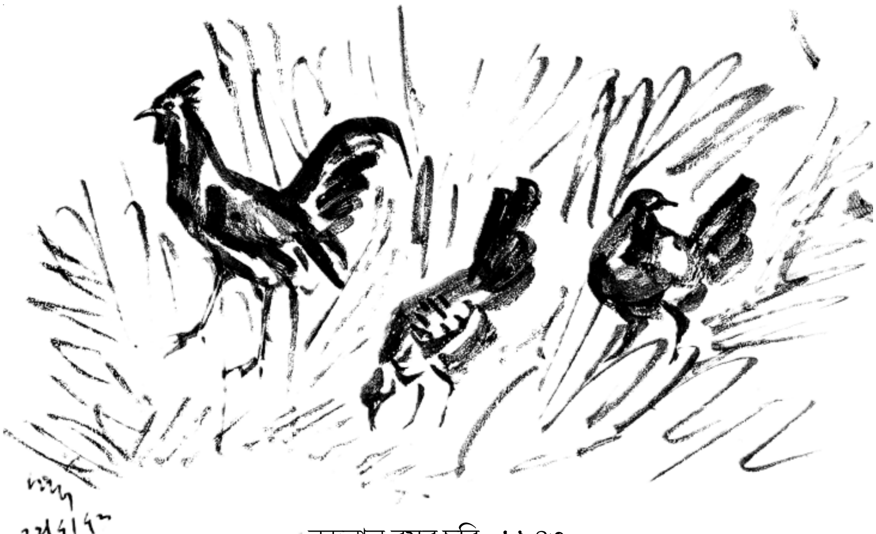

নন্দলাল বসুর ছবি - ১৯৪৩

বিশ্বভারতী - বিশ্ব বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। প্রথম থেকেই সংগীতচর্চা, ছবি আঁকা ও বিভিন্ন হস্তশিল্প শিক্ষার বিদ্যালয় 'শান্তিনিকেতন' নামের আশ্রমিক বিদ্যালয়ের পরিণত বা পরিবর্তিত রূপ হল বিশ্বভারতী। এই রাঙামাটিতে একে একে পা পড়ে বহু দেশি বিদেশি খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের।

কীভাবে হল এই যোগসূত্র? ওকাকুরা কাকুজো ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও ভারতের বৌদ্ধ তীর্থগুলো দেখবার জন্য ভারতে আসেন। এদেশে এসে ভগিনী নিবেদিতা, বাংলার শিক্ষিত সমাজ তথা বিপ্লবী তরুণদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। নিবেদিতাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দেন। ওকাকুরার সঙ্গে যোগাযোগের ফলে রবীন্দ্রনাথের জাপান ও পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে কৌতূহল জাগে। জাপানি চিত্রকরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ এই পরিবারই প্রথম পেয়েছিলেন।

Asia is one - এই ভাবধারার প্রবক্তা ওকাকুরা ছিলেন জাপানের নবজাগরণের অগ্রদূত ও এশিয়ার ঐক্যভাবনার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দেশে ফিরে গিয়ে জাপান থেকে একাধিক শিল্পী ও ছাত্রকে জোড়াসাঁকোতে পাঠিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শিল্পরসিক ওকাকুরার কাছে জাপানি শিল্পের তাৎপর্য আয়ত্ত করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি এই জাপানি শিল্পীর কাছে পাঠ নিয়েছিলেন। হ্যাভেলের আদর্শে অনুপ্রাণিত, বিলিতি কায়দায় শিক্ষিত অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পের নতুন পথের অন্বেষক। ছাত্রদের তিনি নিজের শক্তি অনুযায়ী শিল্পচর্চায় উৎসাহিত করতেন। আর্ট স্কুলে যোগ দেবার আগে তিনি পামারের কাছে তেল রঙ ও গিলাডির কাছে প্যাস্টেল ও জলরঙ শেখেন। তবে তিনি বিলেতি মতে ছবি আঁকা শিখলেও বিলেতি ধরনের ছবি তার আঁকা হয়নি। দেশি ও বিলেতি অংকন কৌশলের মিশ্রণে তাঁর ছবি প্রাণবন্ত হয়েছে। তিনি ছাত্রদের শিল্প শিক্ষায় যান্ত্রিকতার বিরোধী ছিলেন। তাদের মানসিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পুরাণ ও ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন Art School Artist তৈরি করতে পারেনা।

কামপো আরাই-এর আঁকা ছবি

নন্দলাল বসুর ছবি - ১৯৪১

আবার ওকাকুরার উদ্যোগে অবনীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে আসেন খাটসূতা, হিসেডা এবং টাইকান। এই তরুণ চিত্রকরদের মাধ্যমে আমাদের আধুনিক চিত্রে জাপানি প্রভাব প্রথম দেখা যায়। এর প্রভাব প্রথমে অবন ঠাকুরের মধ্যে এসেছিল। লোকের একটা ধারণা আছে যে অবনীন্দ্রনাথের ছবি জাপানি প্রভাবিত। ইংরেজ সমালোচকেরা তো অবন ঠাকুরের ছবিকে 'Indo Japanese style' নামও দিয়েছিলেন। কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় অবনীন্দ্রনাথ জাপানি চিত্রের করণকৌশলের একটা দিক গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জাপানি চিত্রের মোলায়েম রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং জাপানি তুলি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ছবি 'ভারতমাতা' এবং ঋতুসংহারের চিত্রাবলীতে এই ছাপ দেখা যায়। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে Indian Society of Oriental Art এর উদ্যোগে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এতে জাপানি শিল্পীদের যাতায়াত বাড়ে। ওকাকুরা যখন ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন তখন অবনীন্দ্র পরম্পরায় তৈরি নন্দলাল, অসিতকুমার প্রভৃতি শিল্পীদের সঙ্গে শিল্পরচনার বিষয়ে আলোচনা করেন। ওকাকুরা বলেন ছবির পূর্ণাঙ্গ আবেদন দূর থেকে দেখতে হয়। আর ছবির কাছে গিয়ে আঙ্গিকের দক্ষতা বুঝতে হয়। শিল্পী জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন tradition, nature ও originalityর সমন্বয়। ওকাকুরা সেই সময়ের শিল্পীদের ভারতীয় মূর্তিকলার

কামপো আরাই-এর আঁকা ছবি

চর্চা করতে উপদেশ দেন। 'ষড়ঙ্গ' বইটি অবনীন্দ্র ওকাকুরার শিল্পচিন্তার সংযোগের স্মারক। উভয়ের মাঝখানে পাওয়া গেল জাপানি চিত্রকরদের প্রভাব ও তরুণ শিল্পীদের প্রতি ওকাকুরার উপদেশ। চীনে অক্ষর খোদাই করা যে সীল অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে দেখা যায় সেটি ওকাকুরা তাঁদের উপহার দিয়েছিলেন। শুধু চিত্রশিল্পী নন, অন্য কারুশিল্পীরাও ভারতে আসতে থাকেন। জাপান থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন দারুশিল্পী কুসুমতো সান। তিনি ছিলেন কাঠের কাজের কারিগর। এসেছিলেন প্রখ্যাত জাপানি দারুশিল্পী কিম্‌তারো কাসাহারা। শ্রীনিকেতন গড়ে তোলার সময় রবীন্দ্রনাথ কাসাহারাকে শ্রীনিকেতনের দারুশিল্প বিভাগের প্রধান করেন। এল্‌ম্‌হার্স্টের সাহায্যকারী ছিলেন তিনি। অবশ্য ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বসম্মান অর্জনের পর এই যাওয়া আসা আরও বেড়ে যায়।

আবার রবীন্দ্রনাথের জাপান ভ্রমণের সময় (১৯১৬) কাম্পো আরাই এর সঙ্গে পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথ এদেশের চিত্রশিল্পীদের জাপানি পদ্ধতির চিত্রাঙ্কন বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত করাতে চেয়েছিলেন, খুলে দিতে চেয়েছিলেন তাদের চোখ, দূর করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রক্ষণশীল মনোভাব। তাই তাঁকে কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে আসতে অনুরোধ করেন। কাম্পো আরাই কলকাতায় বসেই নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার,

সুরেন্দ্রনাথ কর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - এদের জাপানি চিত্রবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত করান। আবার অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে তিনি ভারতশিল্পের চর্চা করেন। কাম্পো আরাই এর কাছে নন্দলাল হাতে কলমে কালি-তুলির কাজ অভ্যাস করেন। গগনেন্দ্রনাথও কালি-তুলির কাজ শুরু করেন কাম্পো আরাই এর প্রভাবে। জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টিকে নতুন পথে চালিত করেছিল। এর পরোক্ষ প্রভাবে অবনীন্দ্র গোষ্ঠীর শিল্পীরা জাপানি শিল্পকে গ্রহণ করার সমর্থন পেলেন। এইভাবে জাপানের শিল্পরীতি ভারতীয় শিল্পচর্চা ও চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির সঙ্গে মিশ্রিত হবার যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন থেকে স্টেলা ক্রামরিশকে কলাভবনের শিল্প সমালোচক হিসেবে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে স্থির হয় ক্রামরিশের ক্লাসে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই উপস্থিত থাকবেন। ইমপ্রেশনিজম থেকে কিউবিজম - ছিল ক্রামরিশের আলোচনার বিষয়। তিনি বিশ্লেষণমূলক শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিল্পের বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার সন্ধান দিয়ে কলাভবনের শিল্পীদের আধুনিকতার সন্ধান দিয়েছিলেন। ক্রামরিশ ও গগনেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় ১৯২২-২৩ সালে ক্যান্‌ডিনেস্কি প্রমুখ জার্মান শিল্পীদের ড্রইং এর প্রদর্শনী হয় Oriental Art Societyতে। এই প্রদর্শনীতেই প্রথম কলকাতা শহরবাসীর আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে। আবার এইসময় ফরাসী মহিলা শিল্পী আঁদ্রে কারপেলের কাছে ছাত্রদের পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিত্রবিদ্যা শেখার সুযোগ ঘটে। পোস্ট ইমপ্রেশনিজম যুগের শিল্পীরা ছিলেন তাঁর আদর্শ। কারপেলে কাঠখোদাই ও এনগ্রেভিং এর কাজে দক্ষ ছিলেন। উড্‌কাট ও অয়েল পেন্টিং শেখান কারপেলে। এই সময় কারপেলে ও প্রতিমা দেবীর সহযোগিতায় 'বিচিত্রা' নামে হাতের কাজের শিক্ষার নতুন বিভাগ খোলা হয়। সমসাময়িককালে ফ্রাইম্যান নামে মেক্সিকোবাসী এক শিল্পরসিক কলাভবনে আসেন। তিনি মেক্সিকোর আদিবাসীদের দেওয়াল চিত্র অংকনের ধারায় প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই রঙের সঙ্গে মনসা গাছের আঠা মিশিয়ে দেওয়াল চিত্র করার স্পৃহা নন্দলালের মনে জাগে।

আবার ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পর গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের প্রভাবে ধারণা করা যায়-- যে আধুনিক শিল্পকলার পরীক্ষা নিরীক্ষার খবর তিনি রাখতেন। গগনেন্দ্রনাথের কাজের সঙ্গে জার্মান শিল্পীদের two dimensional প্যাটার্নের মিল পাওয়া যায়। ইউরোপের বিমূর্ত শিল্পরীতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। অবনীন্দ্র

পরম্পরার ধারক-বাহক তিনি ছিলেন না।

চিত্রকলার মতো কলাভবনে মূর্তিকলার অনুশীলনও শুরু হয়েছিল। লিসা এলিজাবেথ ভন পট নামে এক অস্ট্রিয় ভাস্কর শান্তিনিকেতনে আর্মেচার তৈরি ও ছাঁচ নেওয়া সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা দেন। মিস পট ১৯২০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সচিব ছিলেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলাভবনের ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান প্রশিক্ষক হন। সেখানে তিনি রামকিঙ্কর ও সুধীর খাস্তগীরকে শিক্ষা দেন। এরা নন্দলাল বসুর মতই বেঙ্গল স্কুল অফ আর্টের সদস্য ছিলেন। তবে এই লিসা ভন পট ছিলেন গুপ্তচর। তিনি ভিয়েনায় ভন পট গ্রুপ নামে একটা নাৎসি গুপ্তচর দলের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত, বুদ্ধিমতী, অভিজাত মহলে সুপরিচিত। শোনা যায় সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন মিসেস মিলওয়ার্ড আসেন। এই দুই শিল্পীর কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে মডেলিংএর কাজ শুরু হয়। নন্দলাল এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক চীনা চিত্রকলার জনক শু বেইহং ভারতে আসেন এবং পরের বছর বিশ্বভারতী ও কলকাতায় প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। কলাভবনের অধ্যাপক হিসেবে চীনা কালি তুলির চিত্রকলা ও ক্যালিগ্রাফি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। শান্তিনিকেতনের আনন্দঘন পরিবেশে তিনি আপ্লুত হয়ে বলেছিলেন যে এই পরিবেশ অনুভব করার জন্য সবার আসা উচিত। তিনি এও বলেছিলেন যে তিনি দিতে আসেন নি, গ্রহণ করতে এসেছেন। এই পরিবেশে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল চীনা কালি তুলির রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীরও প্রতিকৃতি তৈরি করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের এই একই প্রতিকৃতি বেইজিং এর শু বেইহং স্মৃতি জাদুঘরে আছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বের স্মারকরূপে ও শিক্ষার্থীদের শেখার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিটি তিনি বিশ্বভারতীকে দিয়েছিলেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন অসুস্থ, সেই সময় আঁকা 'ঘোড়া' ছবিটি কবির আরোগ্যলাভের জন্য অভিনন্দন জানাতে এঁকেছিলেন। এই 'ঘোড়া'র ছবিটি যেন শক্তির প্রতীক। তিনি পশ্চিমা ড্রয়িং ও তৈলচিত্রের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী চীনের ink and wash পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের উর্বর মৃত্তিকায়, এই শিল্পের জোয়ারে, দেশি বিদেশি শিল্পের সংমিশ্রণের পটভূমিকায় একটা কথা বলে রাখা ভালো যে সব শিল্পীরাই এখানে শেখাতে আসেন নি। অনেকে শিখতেও এসেছিলেন। এমনই এক জাপানি দারুশিল্পী হলেন হাসে গাওয়া

দেনজিরো। তিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কাঠের আসবাবের নকশা ও কারুকার্য শেখার জন্য কলাভবনে আসেন। ওকাকুরার ভাবশিষ্য জাপানি চিত্রশিল্পী কোসেৎসু নোসু ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বৌদ্ধ শিল্পশৈলী পর্যবেক্ষণ করার জন্য আসেন। তখন কাম্পো আরাই অজন্তার গুহাচিত্র নিয়ে কাজ করেছিলেন। আবার ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন জাপান সরকারের তরফে কাজের ভার নিয়ে। ফ্রেসকো আঁকার পদ্ধতি তার জানা ছিল না বলে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শান্তিনিকেতনের কলাভবন থেকে তিনি ফ্রেসকো অংকন পদ্ধতি শিক্ষা করেন। এই ভাবেই আদান প্রদান চলেছিল শান্তিনিকেতনের ও বিশেষত জাপানি ও চীনা চিত্রকলার। শান্তিনিকেতনের শিল্পকলা চর্চায় উন্মোচিত হয়েছিল এক নতুন দিগন্ত।

লাল মাটিতে পশ্চিমি হাওয়া এসে সেখানকার ভাবনার পরিবর্তন না করলেও নতুন নতুন ভাবধারা তৈরি করেছিল। অবন ঠাকুরের মতো পাশ্চাত্য প্রভাবিত প্রথিতযশা শিল্পী ভাবিত হয়েছিলেন, রক্ষণশীলতায় আঘাত লেগেছিল নন্দলালের, প্রভাবিত হয়েছিলেন বিনোদবিহারী-রামকিঙ্করের মতো শিল্পীরা। শিল্প আন্দোলনের নতুন ধারা আবিস্কৃত হয়েছিল। কিন্তু কোথাও যেন তাঁরাও আলোড়িত হয়ে নতুন নতুন শিল্পভাবনাকে মনে মনে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সর্বোপরি এই সবের পিছনে ছিল দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথের অলক্ষ্য হাত।

বিনোদবিহারীর ছবি

চিত্রকরের সাহিত্যে নতুন রস-সৌন্দর্য

রমা বসু

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় নৃত্য-গীতি, নাটক ও নাট্যাভিনয় শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীতে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনাবিল আনন্দের সঙ্গে সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথে জীবন গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল। তেমনই এই বাংলায় তথা সমগ্র ভারতবর্ষে শিল্পচর্চার নতুন যুগ এসেছিলো তাঁরই উৎসাহ ও আগ্রহে। তিনি শিল্পী ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে শিল্প শিক্ষক রূপে আহ্বান জানান। কালোত্তীর্ণ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ বিংশ শতকের শুরুতে ভারত শিল্পের পুনর্জাগরণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নন্দলাল, সুরেন গাঙ্গুলি, অসিত হালদারদের মতো প্রতিভাবান ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে। এই সময়ে ইতালির ই.বি. হ্যাভেল ও জাপানী শিল্পী ওকাকুরা ও অন্যান্য অনেকে ভারতে আসেন। পাশ্চাত্য শিল্পের আঙ্গিক শিক্ষার সাথে সাথে ভারত-শিল্প সম্বন্ধেও তাঁরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র নন্দলাল এবং নন্দলালের ছাত্র বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর, অসিত হালদার ও আরও অনেকেই খ্যাতনামা শিল্পী রূপে সমগ্র ভারতে ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা দেশে খ্যাতি ও প্রশংসা লাভ করেন।

শিল্পী বিনোদবিহারী শান্তিনিকেতনে ছাত্ররূপে চিত্রাঙ্কন শিল্প শিক্ষা করেন। নন্দলাল বসুর ছাত্র হওয়ার সুযোগ পান। চিত্রশিল্প, ফ্রেস্কো, ম্যুরাল ইত্যাদি দেওয়াল চিত্র অঙ্কনে প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন ক্ষীণদৃষ্টি নিয়েও। ১৯৫৭ সালে দিল্লীতে এক মস্ত খ্যাতনামা চক্ষুচিকিৎসক তাঁর চোখে অস্ত্রপ্রচার করেন কিন্তু তা সফল হয়নি। তিনি নিজে লিখেছেন-- ''হাসপাতালে কয়েক দিন কাটিয়ে অপরাহ্নে কালো চশমা পরে লীলার হাত ধরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে রৌদ্রের উত্তাপ বুঝছি কিন্তু আলো দেখতে পাচ্ছিনা। তারপর আলো আর আমি দেখিনি। সাদা কাগজের ওপর রঙের ছোপছাপ দিয়ে আর আমি ছবিও করিনি। আজ আমি আলোর জগতে অন্ধকারের প্রতিনিধি।''

একজন শিল্পীর শুধু নয়, যে কোনও মানুষের জীবনেই পূর্ণ অন্ধত্ব মর্মান্তিক

বেদনাদায়ক। হার না মানা শিল্পী বিনোদবিহারী সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও স্কেচ ও রেখা দিয়ে বহু ছবি এঁকেছেন শুধু কালো কালি দিয়ে। অন্ধ বধির ও দৃষ্টিহীন সাহিত্যিক হেলেন কেলারের একটি উক্তি মনে পড়ে যায়। 'Door to happiness' পুস্তকে তিনি লিখেছেন-- ''When one door of happiness close to us many open.'' সৌভাগ্যের বিষয় বিনোদবিহারীর ক্ষেত্রে এই নতুন দরজাটি উন্মুক্ত হয়েছিল। তিনি তার সদ্ব্যবহারও করেছেন। সাহিত্যের শিল্প-প্রাঙ্গণে তিনি প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন বিবিধ শিল্প-সমালোচনামূলক প্রবন্ধে। প্রখ্যাত শিল্পীদের শিল্প ও শিল্প-শিক্ষক রূপে তাঁদের মূল্যায়ন করেছেন নিপুণভাবে। শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে প্রকাশিত 'চিত্রকর' গ্রন্থটি তাঁকে সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর আত্মজীবনী মূলক গল্প 'কত্তামশাই'-এর শেষাংশে তিনি লিখেছেন-- ড্রাগন কত্তামশাই-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর রূপ-রসের ভাণ্ডারের সকল সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে পথ নির্দেশ করেছে - ''ভিখারীর মত জীর্ণ বস্তু আঁকড়ে না রেখে নতুন রস নতুন সৌন্দর্য নতুন পাত্রের সন্ধান করতে।'' বলেছে-- ''রইল তোমার শব্দের ভাণ্ডার''। এই শব্দের ভাণ্ডার অবলম্বন করেই তিনি নানা প্রবন্ধ রচনা করেছেন শিল্পী ও শিল্প নিয়ে। 'এক্ষণ' ও অন্যান্য পত্রিকায় এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর স্বচ্ছ মানস দৃষ্টিতে শিল্পও শিল্পীদের এই সঠিক ও সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন গুণীজনদের সমাদর লাভ করে। তাঁর সহজ অথচ সমৃদ্ধ ভাষা সাধারণ সকল পাঠকেরও উপভোগ্য হয়। পরে প্রবন্ধগুলির সঙ্কলন 'চিত্রকথা' প্রকাশিত হয়।

তাঁর ভাষার গতিশীলতার পরিচয় নানা উক্তিতে - ''শিল্পীর কাজ মানুষ নিয়ে। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই - এই উক্তি শিল্পীর পক্ষে পরম সত্য। মানবীয় চেতনার পূর্ণ পরিচয় শিল্পে সাহিত্যে যা পাওয়া যায় তাকে মিথ্যা বলা চলে না, তা সত্যেরই আর এক পরিচয়''।

আরও বলেছেন-- ''যতক্ষণ মানুষের জীবনে আবেগ উদ্দীপনা থাকবে যতক্ষণ বিচারের সিদ্ধান্ত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পথ মুক্ত থাকবে ততক্ষণ সমাজ থেকে শিল্পী রস গ্রহণ করবে এবং ফলে সমাজ জীবনকে নতুন সত্যের দ্বারা বিস্তৃত করবে।''

যে কোনও শিল্প সৃষ্টির প্রধান সহায় বাস্তব অভিজ্ঞতা, বহু-পাঠলব্ধ জ্ঞান ও নিজস্ব কল্পনা শক্তি। বিনোদবিহারী ক্ষীণদৃষ্টি নিয়েও বহুদর্শী। কর্মসূত্রে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, নেপাল ও জাপানে তিনি বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছেন। সেই সব স্থানের শিল্প

দর্শন করেছেন অভিনিবেশ সহকারে যা তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পুষ্ট করেছে। বহু-বিস্তৃত পঠন-পাঠনের সুযোগ তিনি পাননি ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির প্রতিবন্ধকতায় কিন্তু তাঁর কল্পনা শক্তি তাঁর বিচার বোধ ও প্রকাশভঙ্গির সম্পদ হয়েছে। তিনি লিখেছেন-- ''ভারতীয় মতে নব-নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞারই অপর নাম প্রতিভা। প্রত্যেক সার্থক শিল্পরূপই নিজেকে অল্পবিস্তর কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ করে।'' ''রূপকথার রাজপুত্রের মতই শিল্পীর রসের অনুসন্ধানে যাত্রা। সে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত হ্লাদিনীর সন্ধান পায়। যে সৌন্দর্য মনের ভিতরে ছিল ঘুমন্ত তাকেই সুখ-দু:খের স্পর্শে জাগিয়ে তোলে শিল্পী।'' এই ধরনের উপমা তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলি 'চিত্রকর', 'কত্তামশাই', 'কীর্তিকর' ইত্যাদিকে সাহিত্য রস গুণ দিয়েছে।

'কত্তামশাই' একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প। অনেক বহুবন্দিত গল্প লেখকের গল্পের সমান মর্যাদা পাবার যোগ্য। কাহিনীর নায়ক রুদ্রনারায়ণ দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছেন। আলোর জগত থেকে তাঁর অন্ধকার জগতে পদার্পণ- লেখক আপন অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করে বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। রুদ্রনারায়ণ থেকে 'কত্তামশাই' - এই পরিবর্তনের অসহনীয় যন্ত্রণা, অসহায়তা, অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ-বিরক্তি, নিষ্ফল আক্রোশ ও অভিমান তিনি অতুলনীয় ভাষায়, শব্দে ও বাক্যে বিশ্বাসযোগ্য করেছেন। পাঠকও তাঁর সঙ্গে মর্মবেদনা ও সহানুভূতিতে আপ্লুত হয়।

''কত্তামশাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। এইবার তাঁর অভিযান নতুন জগতের মধ্যে। যে জগৎ কঠিন আঘাতে তাঁকে পীড়িত করেছে সেই জগতের সত্য পরিচয় নেবার জন্য তিনি আজ দৃঢ়সঙ্কল্প। প্রাণপণ শক্তিতে কত্তামশাই সামনের দিকে চলবার চেষ্টা করছেন।''-- এই প্রচেষ্টা ও শক্তিই অন্ধ বিনোদবিহারীকে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দিয়েছে।

তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি শ্যাম, কেষ্ট, চাটুজ্জে মশাই, বটুক, সাধুবাবা, হয়তো অভিজ্ঞতাজাত। কিন্তু নিয়তি, হ্লাদিনী, সরস্বতীর তোতা, ড্রাগন এ সব কাল্পনিক চরিত্র তাঁর আপন মনের অন্য সত্তা। তাঁর নিজস্ব ভাবনার বিষয়গুলি এরা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে নানা ছলে। তাই আয়নায় প্রতিফলিত নগ্ন নারীর প্রতিচ্ছবির প্রতি আকর্ষণ তাঁকে অপরাধ বোধে লজ্জিত করেছে। তাঁর আপন মনের অবদমিত কামনা বাসনা প্রকাশ করেছেন গল্পের ছলে। নিরাশা থেকে আশার জগতে উত্তরণ ঘটেছে। 'কত্তামশাই'-এর রঙের জগৎ বিলুপ্ত হলেও রেখার জগৎ, আকারের জগৎ দ্বার খুলে দিয়েছে। তাঁর দশ আঙুলের আশ্চর্য কৌশলে নিষ্প্রাণ মোমের তাল থেকে বেরিয়ে আসে মানুষ ও

জীবজন্তুর কত মূর্তি।

''আমরা অমর কীর্তি ও শাশ্বত সৃষ্টি দুজনে এসেছি - আমাদের কাছে বর প্রার্থনা কর। কি বর চাইব - ভাববার আগেই জিভ থেকে বেরিয়ে গেল - গেট আউট''।

লেখক বলেছেন- সারাজীবনের তপস্যা এইভাবে তিনি নষ্ট করলেন। কিন্তু শাশ্বত সৃষ্টি তাঁর ভাগ্য লিখন-- তিনি কি ব্যর্থ হতে পারেন। তাই মোমের মূর্তি গড়ে তিনি বিস্ময় ও অপ্রত্যাশিত আনন্দ পেয়েছেন। কত্তামশাই-এর সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও উপলব্ধি করে- শাশ্বত সৃষ্টির রহস্য-- কীর্তির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ও অপর দিকে সৃষ্টির অনির্বচনীয়তা। আলোর জগৎ, রঙের জগৎ বিলুপ্ত হলেও শব্দের জগৎ, ভাষার জগৎ, সাহিত্যের জগতে বিনোদবিহারীর নাম চিরউজ্জ্বল থাকবে।

একটি কাল্পনিক চিত্রনাট্য

তরুণ চক্রবর্তী

সত্যজিৎ রায় : দাদা, দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরও আপনাকে এমন অবিচলিতভাবে সৃষ্টির পথে চলতে দেখে আমি অভিভূত।

বিনোদবিহারী : মানিক, চোখ দিয়ে দেখা এক রকম, চোখ বন্ধ হলে দেখা অন্যরকম। চোখ বন্ধ হলে পৃথিবী হারিয়ে যায় না- শুধু তার বিন্যাস বদলায়। রং তখন স্মৃতির কোঠা থেকে ভেসে ওঠে, রেখা হয়ে ওঠে স্পর্শ, আকার ও ব্যাপ্তি হয়ে ওঠে অনুভব।

সত্যজিৎ রায় : ঠিক সেই কথাটাই তুলে ধরতে চেয়েছিলাম 'The Inner Eye' ছবিতে। আপনার সন্ধানী আঙুল, মোমের উপর ধীর স্পর্শ, কাগজ কেটে কেটে কোলাজ... মাথাটা একটু কাত করে যেন গড়নের শব্দ শুনছেন। সব কিছু মিলে মনে হচ্ছিল যেন নতুন এক ভাষা জন্ম নিচ্ছে।

বিনোদবিহারী : এক অপরাহ্নে কালো চশমা চোখে, লীলার হাত ধরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার পর আলো আর আমি দেখি নি। সাদা কাগজের উপর নানা রঙের ছোপ-ছাপ দিয়ে ছবিও আমি করি নি। কিন্তু খুলে গিয়েছিল সৃষ্টির জগতের বিকল্প দুয়ার, বিকল্প পথ। ওটা ছিল নতুন শৃঙ্খলা। নতুন অস্তিত্ব। নতুন দিশা।

সত্যজিৎ রায় : ঠিক তাই। অন্ধত্ব আপনার কাছে কোনও বিপর্যয় নয়, বরং নতুন মাধ্যম।

বিনোদবিহারী : তা হলে তুমি আমাকে বুঝেছ মানিক। একজন শিক্ষক হিসাবে এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কি হতে পারে?

সত্যজিৎ রায় : আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনার অন্ধত্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শিল্পকর্মের যতটুকু বুঝতে পেরেছি তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব আমার অধিকাংশ ছবিতেই স্পষ্ট। একজন ছাত্র হিসেবে এর চেয়ে বেশী

আনন্দের আর কী হতে পারে?

বিনোদবিহারী : সিনেমা তো সময়ের ছবি মানিক। তুমি আঁক আলো দিয়ে আর আমি স্মৃতি দিয়ে। দুজনই আসলে একই কাজ করি, শুধু ক্যানভাস আলাদা।

সত্যজিৎ রায় : (কৌতুকের সুরে) তা হলে আপনি বলছেন আমি আসলে আপনার ছাত্রই থাকলাম-- শুধু তুলির বদলে ক্যামেরা হতে নিয়েছি।

বিনোদবিহারী : মানিক, তুমি প্রমাণ করে দিয়েছ শিল্পের ভাষা বদলায়, কিন্তু তার আত্মা বদলায় না।

সত্যজিৎ রায় : তাইতো গুরুদেব বলতেন-- ''শান্তিনিকেতনে সবই একসূত্রে গাঁথা-- শিল্প, সংগীত, নিঃশ্বাস...''

বিনোদবিহারী : (কথা কেড়ে নিয়ে) ক্যামেরা দিয়ে তুমি সেই সুরটা ভালই ধরেছ মানিক।

সত্যজিৎ রায় : হ্যাঁ। আমার প্রথম ছবি - 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে শেষ ছবি 'আগন্তুক' পর্যন্ত সেই প্রয়াস চালিয়ে গেছি। ভাল-মন্দ দর্শকদের বিচার্য।

বিনোদবিহারী : যেমন?

সত্যজিৎ রায় : আপনার সমসাময়িক অনেক শিল্পীই যখন পৌরাণিক বা কাল্পনিক দেবতাদের ওপর বেশী মনোবিবেশ করছিলেন, তখন কিন্তু আপনার দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল চোখের সামনে থাকা বাস্তব জগতে উপর।

বিনোদবিহারী : (মৃদু হেসে) তোমরা তার গালভরা নাম রেখেছ Contextual Modernism অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক আধুনিকতাবাদ।

সত্যজিৎ রায় : ঠিক তাই। কাল্পনিক দেবতাদের পরিবর্তে আপনার ক্যানভাসে সরাসরি ফুটে উঠেছিল বীরভূমের প্রাকৃতিক Landscape - লালমাটি, ছড়ানো ছিটানো গাছপালা, কাশবন, তালগাছ...

বিনোদবিহারী : তোমার সিনেমাতে তার কিছু প্রভাবের কথা বল। আমি গর্বিত বোধ করব।

সত্যজিৎ রায় : 'পথের পাঁচালী' ছবির Storyboard-এ আপনার করা একটি ল্যাণ্ডস্কেপের চিত্রকে মাথায় রেখে কাশবন থেকে অপু দুর্গার ট্রেন দেখার দৃশ্যটার রেখা চিত্র এঁকেছিলাম। এর পর থেকে আমার বহু সিনেমায় আপনার আঁকা নানা চিত্রের প্রভাব পড়েছে।

বিনোদবিহারী : সেগুলোর কথা আমি শুনেছিলাম। দেখেছিলাম-- বলাটা সঠিক হবে না কারণ আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে একেবারে হারিয়ে যাওয়া আর তোমার প্রথম ছবির মুক্তি ঘটেছিল প্রায় একই সময়ে। এও এক অদ্ভুত সমাপতন। আমার অবর্তমানে করা তোমার কিছু কাজের কথা আমায় বল মানিক, যা আমি শুনেও যেতে পারিনি।

সত্যজিৎ রায় : (চোখ ছলছল): আপনার অবর্তমানে আমার শেষ চারটি ছবি-- 'ঘরে বাইরে', 'শাখা-প্রশাখা', 'গণশত্রু' ও 'আগন্তুক'...

বিনোদবিহারী : সেইগুলোতেও পড়েছে আমার প্রভাব?

সত্যজিৎ রায় : আপনি ছেয়ে আছেন আমার সকল কাজে। আমার শিল্পীজীবনে আপনার প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত। কলাভবনে আপনার গোড়ার দিনগুলোতে আপনার আঁকা- 'গাছের ওপর ডালে বসে সাঁওতাল ছেলে বাঁশী বাজাচ্ছে'এই ছবিটা জোড়াসাঁকোতে নিয়ে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথকে দেখানোর গল্পটা আমি আপনার কাছ থেকেই শুনেছিলেম। আমার শেষ ছবি-- 'আগন্তুক'-এর শেষ দৃশ্যে সেই ছবিটা মনের গহন থেকে বেরিয়ে চিত্রায়িত হয়ে রূপোলি পর্দায় ভেসে উঠেছিল।

বিনোদবিহারী : (হেসে) ভাগ্যিস সেই যাত্রায় গগন ঠাকুর আমাকে কোনও রকমভাবে পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন।

সত্যজিৎ রায় : (হেসে) এই যাত্রায় আপনিও আমায় পাশ করিয়ে দিন। আমার 'গণশত্রু' ছবির প্রায় শেষের দিকে, একজন সৎ ঋষিতুল্য চিকিৎসক নাটমন্দিরের ভেতরে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষকে যুক্তির আলোয় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে সমাগত করেছেন। এখন প্রশ্ন জাগতেই পারে, এত জায়গা থাকতে কেনইবা নাটমন্দির বেছে নিলাম। এখানে আপনার শ্রেষ্ঠ শিল্প কর্ম -- 'Life of Medieval Sants'- ম্যুরালের একটি বিশেষ দেয়ালচিত্র আমায় অনুপ্রাণিত করেছে।

বিনোদবিহারী : (উচ্ছ্বসিত হয়ে) অপূর্ব! একশতে একশ!

সত্যজিৎ রায় : এবার আসছি 'ঘরে বাইরে' সিনেমার প্রসঙ্গে। সেই ছবিতে বিংশ শতকের গোড়ার দিকের জমিদার বাড়ির অন্দর মহলের বাস্তব

চিত্রায়নের জন্য Ambient Lighting এবং Low-key Lighting-এর সঠিক অনুপাতে সংমিশ্রণ, পরিবেশ ও ভাব অনুসারে বিভিন্ন রঙকে সঠিক অনুপাতে মেশানোর প্রশিক্ষণের প্রভাব রয়েছে। ছবিতে আলোকসজ্জা বিমলার 'আলো আঁধারির প্রতীক সম' চরিত্রটিকে সামঞ্জস্য এনে দিয়েছে একই সাথে। শুধু 'ঘরেবাইরে' নয় এই শিক্ষার প্রভাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমার প্রায় সকল ছবিতেই।

বিনোদবিহারী : তুমি আঁক সেলুলয়েডে আর আমি আঁকি ক্যানভাসে। একই ভাব। এর চেয়ে বড় যুগলবন্দী আর কী হতে পারে!

সত্যজিৎ রায় : আরও আছে। 'শাখা প্রশাখা' ছবিতে রয়েছে তালগাছ, ঝোপঝাড় আর গাছপালার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় একটা চড়ুইভাতির দৃশ্য, যাতে পরিবারের সদস্যরা বসে Tounge Twister খেলা খেলছেন। ছবিটার দৃশ্যয়নে ঘটিয়েছি আপনার Landscape শৃঙ্খলার একটা চিত্রের সরাসরি প্রতিফলন। যেন একটা আরেকটার প্রতিচ্ছবি। সেই কারণেই আপনার আঁকা ছবিটির মূলভাব-- 'মানুষ ও প্রকৃতির একাত্মতা'- আমার তৈরি শটটারও মূলভাব হয়ে উঠেছে।

বিনোদবিহারী : (কৌতুকের সুরে) সেই Toung Twister গুলো একবার আমায় শোনাতে পারবে মানিক?

সত্যজিৎ রায় : (হেসে) অসম্ভব! তা করতে গেলে আমার জিভের হাড়গোড় ভেঙে যাবে। তার চেয়ে বরং আমার আরেকটি ছবি-- 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে ঠিক একই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশে চড়ুইভাতি করতে বসে সদস্যদের 'Memory Game' খেলাতে উঠে আসা বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামগুলো আমি গড় গড় করে সব বলে দিতে পারব। এই চড়ুইভাতির দৃশ্য থেকেও একটা still নিলে দেখা যায় সেটাও যেন আপনার আঁকা Landscape শৃঙ্খলার আরেকটা ছবির অনুরূপ।

বিনোদবিহারী : এই ছবিগুলোতে আমি মানুষ ও প্রকৃতির একাত্মতা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। প্রকৃতিকে আমি কোনও পটভূমি হিসেবে নয়, বরং একটা সার্বিক উপস্থিতি হিসেবে দেখিয়েছি, মানব মূর্তিগুলো হয়ে উঠেছে যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। একটাকে বাদ দিয়ে অপরটার কথা ভাবা যায়না।

আর, আমি এই ভাব ফুটিয়ে তুলেছি তুলির ন্যূনতম টানে।

সত্যজিৎ রায় : আপনার শৈলির এই minimalism বা ন্যূনতাবাদ আমায় শিখিয়েছে অল্পকথায়, স্বল্প সেলুলয়েডে, প্রয়োজনে প্রতীক বা সংকেত ব্যবহার করে মেদবিহীন অর্থপূর্ণ ছায়াছবি দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে, যা নতুন ধারা রূপে পরিচিত হয়েছে। জীবনে আপনার সান্নিধ্যলাভ না করলে এর কিছুই হত না।

বিনোদবিহারী : মানিক, সঠিক যুগলবন্দী যে কেবল সংগীতেই হয় এমন নয়-- দুটো ভিন্ন ধারার শিল্পও যখন একই সুরে বেজে ওঠে তখন সৃষ্টি হয় একটা যুগলবন্দীর জাদুকরী মুহূর্ত। আগামী প্রজন্মের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকুক সেই মুহূর্তগুলো।

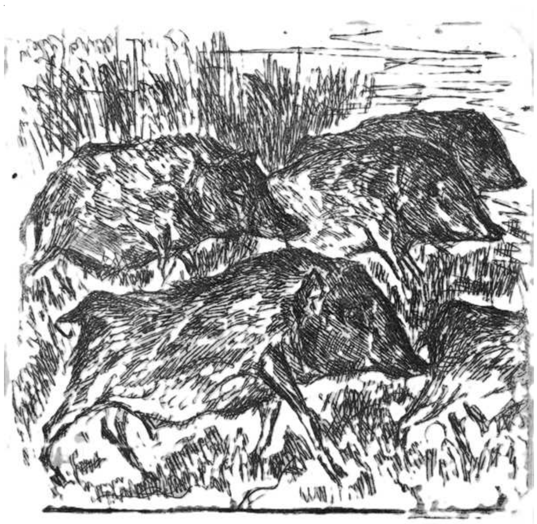

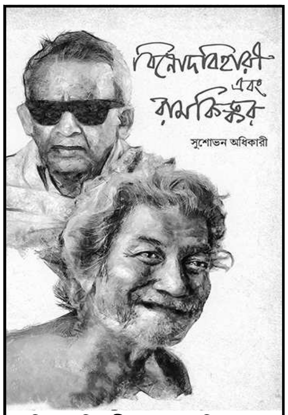

বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্কর - সুশোভন অধিকারী। বিচিত্রপত্র গ্রন্থনা বিভাগ। মূল্য - টা. ২৫০.০০

কলাভবনের দুই নক্ষত্র

গ্রন্থকীট

বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর কলাভবনে নন্দলাল বসুর দুই প্রাক্তন ছাত্র। ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে দুই স্বর্ণস্তম্ভ। লেখক বইটিকে দুভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে আছে ‘গুরুশিষ্য সংবাদ ঃ অবন ঠাকুর থেকে রামকিঙ্কর’। এই অংশে শিল্পকলার ক্ষেত্রে গুরু ও শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শিক্ষার সময় তাদের আদানপ্রদান, পাঠচর্চার মধ্য দিয়ে যে প্রবাহ বয়ে চলেছে তারই আলোচনা।

বিনোদবিহারীর মতো ব্যতিক্রমী শিল্পীর ভাবনা, তাঁর আনন্দ, তাঁর যন্ত্রণা যা তাঁর চিত্রপটে ফুটে উঠেছে- সেই নিয়ে ‘বীণা বাজাও হে মম অন্তরে’, ‘বিনোদবিহারী ও প্রিয়দর্শিনী’, ‘নির্জন একাকিত্বের ছবিকর বিনোদবিহারী’ এই তিন অধ্যায়ে বিধৃত। লেখক সুশোভন অধিকারী মনে করেন শিল্পীর দৃশ্যমান কাজের বিশ্লেষণে শিল্পীর মনের গহনেও ডুব দিতে হয়। শিল্পীর জীবনের উপাদান, তাঁর আত্মকথা, চিঠিপত্র, তাঁর নিকটজন মানুষের স্মৃতিচারণায় সৃষ্টিগুলি নতুন ভাবে আলোচিত হবার সম্ভাবনা রাখে। ‘‘ছবির রঙ-রেখা-আকারের বিন্যাস বা ভাস্কর্যের আকার আয়োজন - টেক্সচার ইত্যাদি দৃশ্যগত অবয়ব নিয়ে’’ আমরা বেশি আলোচনায় মেতে থাকি। শিল্পকে এই ভাবে দেখার বাইরে আরেকটা দেখা আছে ‘‘যা হল শিল্পীর জীবনক্রমের- সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। বিনোদবিহারী রবীন্দ্রনাথের প্রতি তন্বিষ্ট ছিলেন। তিনি ক্ষীণ-দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন এবং শেষ জীবনে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের ‘বীণা বাজাও হে মম অন্তরে’ তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র হয়ে উঠেছিল। যে শিল্পী ভিসুয়াল আর্টের জগতে দৃষ্টিশক্তিহীন একজন মানুষ তিনি কিভাবে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা শিল্পচর্চাকে অব্যাহত রেখেছিলেন তা আমাদের স্তম্ভিত করায়। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী রামকিঙ্কর-- কী ভাস্কর্য কী চিত্রকলা-- দুই ক্ষেত্রেই দুর্বার। আচার্য রবীন্দ্রনাথ

তাঁকে বলেছিলেন সারা আশ্রম ভাস্কর্য দিয়ে ভরিয়ে দিতে। উপকরণ ছিল অপ্রতুল, বাধাও ছিল অনেক তবু থেমে থাকেনি শিল্পীর কাজ। রামকিঙ্করের জীবনের শেষের দিকে এই আশ্চর্য শিল্পীকে একটু কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন লেখক। সেই অভিজ্ঞতা ও কিছু কিছু স্মৃতি ধরে রেখেছেন লেখক এই বইতে যা তার এক একান্ত অনুভব। সেই আশ্চর্য সান্নিধ্যের কিছু কথা রেখে দিয়েছেন তাঁর স্মরণ অঞ্জলিতে। এই দুই শিল্পীর কাজ স্বদেশ ও স্বকালের সীমা পেরিয়ে বিশ্ব শিল্পের অঙ্গনে পৌঁছিয়েছে। তাঁদের কাজে যেমন আছে স্বাদেশিকতার ছোঁয়া তেমনি তাঁরা 'অবগাহন করেছেন পাশ্চাত্য শিল্পধারার উত্তাল সমুদ্রে।' এজন্য আচার্য রবীন্দ্রনাথ এবং শিক্ষক ও শিল্পী নন্দলালের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিল্পের গভীর তত্ত্বকে সহজ করে বলার ক্ষমতা রাখেন সুশোভন অধিকারী। কলাভবনে তাঁর ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন অতিবাহিত হওয়ায় তাঁর লেখনী ও আলোচনা আজ চিত্ররসিকদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। এই প্রবাদপ্রতিম দুই শিল্পীর কাজ, তাঁদের জীবনযাপন ও শিল্পচিন্তার ভিতর সাঁকো বাঁধবার চেষ্টা করেছেন এই বইটিতে। 'বিচিত্রপত্র গ্রন্থন বিভাগ'কে এই মূল্যবান বইটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই। বইটির মূল্য ২৫০.০০ টাকা। বইটির প্রায় সব লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রভূত সংযোজন ও বিয়োজনের পর 'বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্কর' - এই নামে বইটি প্রকাশিত।

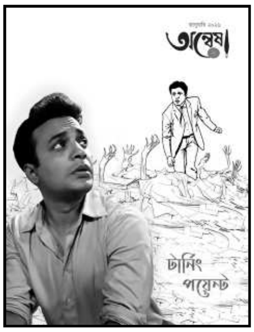

ভাবনার ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক

আমি 'অন্বেষা' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। এবারের সংখ্যাটির নামকরণ খুবই অর্থবহ। সকলেই বেশ ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে লিখে গেছেন। বহু বিশিষ্ট জনের লেখার সংগ্রহ এবার দেখলাম। চণ্ডী মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণাত্মক রচনা 'বাঙালি জীবনে উত্তম স্বপ্ন' নতুন দিশা খুলে দেয়। সায়নদেব চৌধুরীর লেখা অন্যমাত্রিক। গোপাল বিশ্বাসের প্রবন্ধ, সাধন বাগচীর অভিজ্ঞতাধর্মী লেখায় অনেক অজানা দিক উন্মোচিত হল। সম্পাদিকার কলম প্রতিবারের মতোই সাবলীল। 'অন্বেষা'র এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক।

ধন্যবাদান্তে
রুমেলা দাস, কলকাতা - ৭০০০৩৬

অজানার সন্ধানে

আমি 'অন্বেষা' পত্রিকার একনিষ্ঠ ভক্ত। সবসময় প্রত্যাশায় থাকি কবে পত্রিকা প্রকাশিত হবে আর হাতে পাব। পত্রিকার প্রচ্ছদ খুবই অর্থদ্যোতক ও আকর্ষণীয়। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারটি বেশ আকর্ষণীয়। কত নতুন কথা জেনে উত্তমবাবুকে অন্যভাবে ভাবতে পারলাম। শ্রীপর্ণা মিত্রের 'বাতিল চিত্রনাট্য' অন্য দিকের সন্ধান দিল। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখন শৈলী অতুলনীয়। শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের অভিজ্ঞতা আমাদের সমৃদ্ধ করল। প্রত্যেকের লেখাতেই বহু অজানা দিগন্ত খুলে গেল। সবচেয়ে ভালো লাগল প্রত্যেক লেখকই বেশ সাধারণের অজানা দিকের সন্ধান দিয়েছেন, তাই আমরা মহানায়কের সামগ্রিক রূপ জানতে পারলাম। 'অন্বেষা'র শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে এটাই প্রার্থনা যে 'অন্বেষা' আরো এগিয়ে চলুক।

ধন্যবাদান্তে
দীপরেখা রায়, কলকাতা ৭০০০২৭

আগামী সংখ্যার বিষয়

১৯৬৯এর অগাস্ট মাসে রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অন্দর মহলে যে বিভাজনের সূত্রপাত হয়েছিল, তার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দল থেকে বহিষ্কার। ভারতীয় ইতিহাসে বিপুল সমর্থনে দিল্লির মসনদে নিজের অবস্থানকে বজায় রাখতে পেরেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। '৭১ সালে ভারতের সেই যুগান্তকারী সংসদীয় নির্বাচনের শেষ দফা তখনও বাকি, ঠিক সেই সময় এক গোপন সূত্রে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বার্তা পাঠালেন পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিকামী মানুষ। তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতের সাহায্যপ্রার্থী। এই ঘটনার মাত্র ষোলোদিন পরে পাক সেনার হাতে বন্দি হলেন পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিসূর্য মুজিবুর রহমান। দেশে এবং বিদেশের বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধী রাজি হলেন স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের নাগরিকের পাশে দাঁড়াতে। সেই মুহূর্তে এপার বাংলাকে গ্রাস করেছে এক রাজনৈতিক নৈরাজ্য। বাংলায় তখন রাষ্ট্রপতি শাসন জারি এবং পাশাপাশি নকশাল আন্দোলনে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত। একদিকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী, অন্যদিকে সীমানার ওপারে গোলা বারুদের গন্ধ। ১৬ই ডিসেম্বর জয়ের পতাকা উড়িয়েছিল ভারত এবং জন্ম হলো বাংলাদেশ নামে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের। ইন্দিরার এই অভূতপূর্ব জয়ের নেপথ্যে কাজ করেছিল দুটি মস্তিষ্ক - একজন ভারতীয় সেনাপ্রধান স্যাম মানেকশ তো অন্যজন ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান রামেশ্বর নাথ কাও। একজনের দুর্জেয় সামরিক প্রজ্ঞা তো অন্যজনের প্রখর বুদ্ধিমত্তা। বারুদের গন্ধে এ যেন এক রোমান্টিক সংমিশ্রণ। একাত্তরের সেই ঐতিহাসিক জয়ের নেপথ্যের গল্প নিয়ে এবারের প্রতিবেদন--

ইন্দিরা '৭১

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ই জুন ২০২৬,
Email করুন -- sreeparna2@rediffmail.com আই.ডি-তে

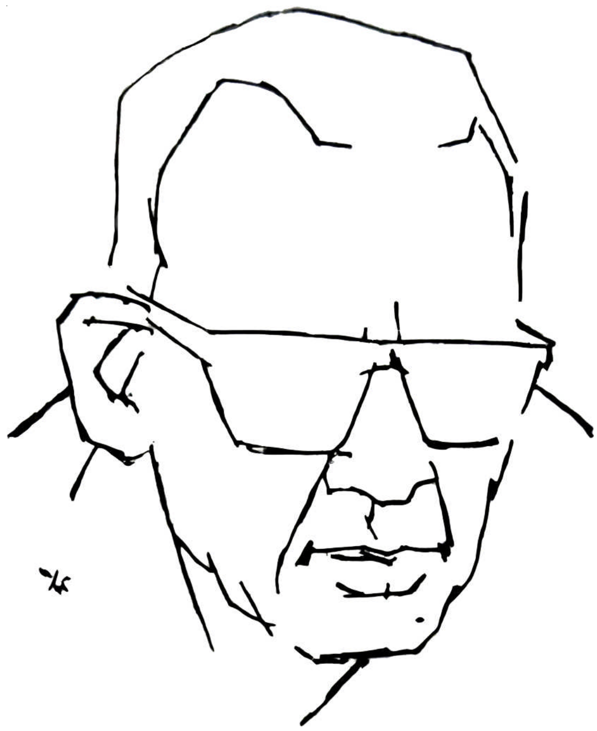

সত্যজিৎ রায়ের কলমে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি

অন্বেষাকে কেমন লাগলো ?

আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমাদের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

লিখে পাঠান
''চিঠিপত্রের আসর'' সম্পাদকের দপ্তর-
email : anweshapotrika@gmail.com

Volume-8, Issue-4

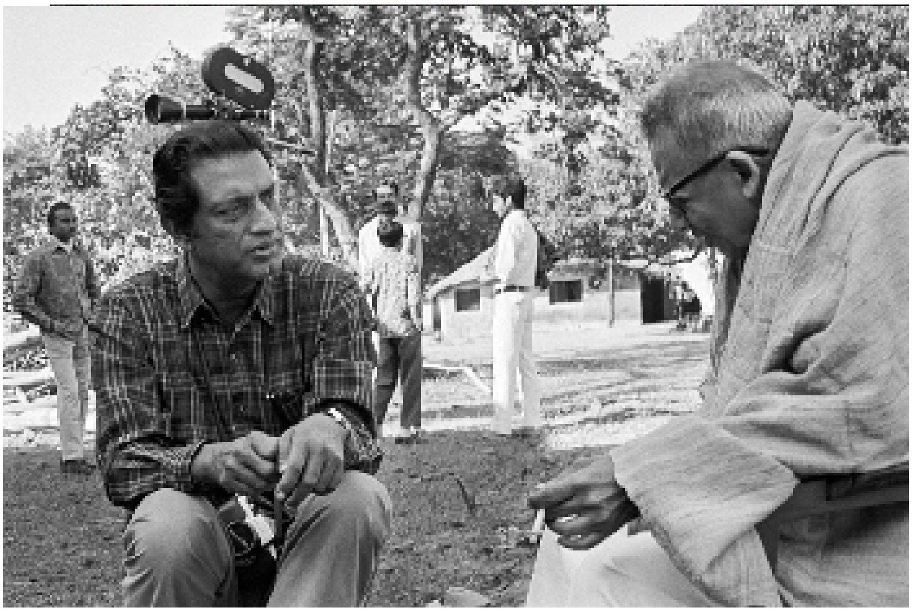

978-93-5445-084-8

শেরউড সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী – ‘এষণা’ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ‘ডেসিগ্রাফ’, কলকাতা দ্বারা মুদ্রিত